এক
মুঠো
আকাশ

এক মুঠো আকাশ

ধনঞ্জয় বৈরাগী

গ্রন্থম
২২।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

প্রথম সংস্করণ—স্বাধীনতা দিবস, ১৩৬৫

দ্বিতীয় সংস্করণ—নববর্ষারম্ভ ১৩৬৬

তৃতীয় সংস্করণ—রথযাত্রা, ১৩৬৬

চতুর্থ সংস্করণ—মহালয়া, ১৩৬৬

মূল্য ৫·০০ টাকা

একমাত্র পরিবেশক

পত্রিকা সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিঃ

১২।১, লিণ্ড্‌সে স্ট্রীট, কলিকাতা ১৬

শিল্পী

বিভূতি সেনগুপ্ত

প্রকাশক শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সাহা

গ্রন্থম্‌। ২২।১ কর্ন্‌ওয়ালিস স্ট্রীট। কলিকাতা ৬

মুদ্রক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ

বোধি প্রেস। ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন। কলিকাতা ৬

রচনাকাল

১৯৫৪ সালের ২৬শে জানুয়ারী থেকে ২০শে জুন

এই উপন্যাসের চরিত্র, ঘটনা প্রভৃতি সম্পূর্ণ কাল্পনিক।
কোথাও কোনো সাদৃশ্য নিতান্ত আকস্মিক এবং অনিচ্ছাকৃত।

শ্রীমতী পার্বতী সেন ও

শ্রীযুক্ত রণজিত সেন

—বন্ধুদম্পতির করকমলে

সিনেমায় তেমন ভিড় ছিল না। কাজের দিন, তিনটের সময় বেশি লোক আশা করা যায় না। তবু ট্রাম-রাস্তার ওপর আর বাজারের কাছে বলে সামনে দিয়ে লোক চলাচলের বিরাম নেই।

ছেলেটা ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ছবি দেখে, সিনেমা হলের বাইরে আঁকা লাস্যময়ী নায়িকা, তার বিচিত্র ভঙ্গিমা। সিগারেটে জোর টান দিয়ে অনভ্যস্ত হাতের চার আঙুলে ঢেকে রাখার চেষ্টা করে। একমুখ পান, বয়স বেশি নয়, ছাত্র হলে ম্যাট্রিক দিতে এখনও দেরি আছে।

না দেখে পেছু হাঁটতে গিয়ে কার সঙ্গে ধাক্কা লাগে। ভদ্রলোক তিড়বিড়িয়ে ওঠেন, ভারী ডেঁপো তো, বয়সের মান-সম্মান নেই, বাবা-কাকার গায়ে সিগারেটের ছ্যাঁকা দিচ্ছ?

ছেলেটা থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে যায়, আমি ইচ্ছে করে লাগাইনি—

—ছি, ছি, আবার এ নিয়ে কথা, গলা টিপলে দুধ বেরোয়। বাপ-মার পয়সা ধ্বংস করছ? দেখছেন মশাই, আজকালকার ছোঁড়াগুলোকে? গোল্লায় গেছে। লেখাপড়ার বালাই নেই, বিড়ি-সিগারেট, সিনেমা, শুধু এই হচ্ছে।

দেখতে দেখতে ছোটখাট ভিড় জমে যায়, সকলেই ভদ্রলোকের পক্ষে, আজকালকার ছেলেদের অর্বাচীনতা সম্বন্ধে মুখর হয়ে ওঠেন।

—আপনার বরাত ভালো যে মুখে ধোঁয়া ছেড়ে দেয়নি।

—জিজ্ঞেস করে দেখুন না, শুনবেন হয়তো বাড়িতে দুবেলা হাঁড়ি চড়ে না।

—কি খোকা, ইস্কুল-টিস্কুল নেই বুঝি? এখানে কি করা হচ্ছে?

ছেলেটা উত্তর খুঁজে পায় না, সিগারেটের ছ্যাঁকা লাগানোর

অনিচ্ছাকৃত অপরাধে যে এ ধরনের অসহায় অবস্থায় পড়তে হবে তা সে কল্পনাও করেনি।

—বেশ করছে সিগারেট খাচ্ছে, আপনাদের কি? একজন ছেলেটার কাছে এগিয়ে আসে।

—এইটুকু দুধের ছেলে—

—এত দরদ তো এক বাটি দুধ খাওয়ান না, সে মুরোদ নেই, শুধু ঝুড়ি ঝুড়ি বুকনি। সিগারেট খেয়ে তো আপনাদের পয়সা ওড়ায়নি। এস তো খোকা আমার সঙ্গে।

ছেলেটা যন্ত্রচালিতের মত এই অপরিচিতের সঙ্গে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আসে।

—সিনেমা দেখবে?

ছেলেটা অবাক হয়ে তাকায়, আমার কাছে পয়সা নেই—

—আমি দেখাব, চল—

সামনের দিকে দুটো সিটে পাশাপাশি বসে তারা ছবি দেখে। আধুনিক বাংলা ছবি, ছোটদের জন্য নয়।

—কি রকম লাগছে?

—ভাল, ছেলেটা আস্তে উত্তর দেয়।

ছবি শেষ হলে তারা বেরিয়ে আসে। গরমকাল, সন্ধ্যে তখনও নামেনি।

—খুব ভাল লাগল, ছবি দেখতে আমি ভীষণ ভালবাসি।

—এই সিনেমায় যে বই ইচ্ছে তুমি দেখতে পার, এখানে আমার পয়সা লাগে না।

ছেলেটার চোখ দুটো নেচে ওঠে, তাহলে খুব মজা হয়, আপনার সঙ্গে কোথায় দেখা হবে?

—এখানে, কিম্বা ওই গলির মধ্যে চায়ের দোকান আছে, অনন্ত-কেবিন, ওইখানে।

—আপনার নাম তো জানি না।

—কেষ্টদা।

দিন দুই পরের কথা। অনন্ত-কেবিনের এক কোণে বসে কেষ্ট চা খাচ্ছে, এ তার আজকের অভ্যেস নয়। চা খায়, কাজ করে, নিজের মনে ভাবে, কখনও গল্প করে। কেবিনের মালিক আশুদা সদাশিব মানুষ, পয়সা বাকী পড়লে কিছু বলেন না, একসময় চুকিয়ে দিলেই হ'ল। এ কেবিনে সব ধরনের লোক আসে, কলেজের ছাত্র, চাকুরে, বেকার, ব্যবসাদার থেকে শুরু করে জুয়াড়ী, এমন কি সিনেমা থিয়েটারের অভিনেতা পর্যন্ত। আসে না শুধু মেয়েরা, বোধ হয় আলাদা ব্যবস্থা নেই বলে।

কেষ্টর নিত্যসঙ্গী প্রভাত। সে সাহিত্যিক, কাগজ-কলম নিয়ে বসে খস-খস করে লিখে যায় ফরমাশ-মত গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস। কয়েক কাপ চা আর কয়েক প্যাকেট সিগরেট তার সাহিত্যের প্রেরণা যোগায়। আজও প্রভাত বসে লিখছিল।

কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, কি লিখছিস?

প্রভাত মুখ না তুলে উত্তর দেয়, একটা বড় গল্প, কড়া হয়েছে, তোকে পড়ে শোনাব।

—প্রেমের!

—দূর দূর, ও-সব প্যানপ্যানে জিনিস আজকাল চলে না। একখানা বিদেশী গল্পের বাংলা রূপ দিলাম, কোন শালাকে ধরতে হবে না যে চুরি করেছি।

প্রভাত বক বক করে একটু বেশি, শুনে শুনে কেষ্টর অভ্যেস হয়ে গেছে, অর্ধেক কথায় মন দেয় না।

কেবিনের বাইরে ভোট নিয়ে কারা ঝগড়া করছিল, দু' দলের মধ্যে

কচলা আর কি! কেষ্ট বসে তাই খানিকটা শোনে। আশুদা বিড় বিড় করেন, ছোঁড়াগুলো আর ঝগড়া করার জায়গা পেলে না, মরতে আমারই দোকানের সামনে এসে জুটল।

হয়তো আরো কিছু বলতেন, যদি না ছেলেটি তাঁর সামনে এসে দাঁড়াত।

—কি চাই?

—কেষ্টদা আছেন?

আশুদা, উত্তর দেবার আগেই কেষ্ট হাত নেড়ে ডাকে, এই যে, এদিকে। ছেলেটি কেষ্টর সহাস্য মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে, কাছে গিয়ে বসে পড়ে।

—আমি ভেবেছিলাম কাল তুমি আসবে।

—ইস্কুল ছিল যে।

—তুমি স্কুলে পড়?

—হ্যাঁ, বিদ্যাভবনে।

—বটে, কোন্ ক্লাসে?

—থার্ড ক্লাস।

—কি খাবে বল? চপ আনতে বলি?

ছেলেটির উত্তর দেবার আগেই কেষ্ট কেবিনের ছোঁড়া চাকরকে হাঁক দিয়ে বলে, ওরে নিতাই, দুটো চপ দিয়ে যা।

ছোট্ট রেকাবীতে চপ আসে, সঙ্গে খানিকটা কাঁচা পেঁয়াজ। ছেলেটি প্রাণ ভরে খায়, গল্প করে।

—মা নেই, মারা গেছে ছোটবেলায়।

—বাবা?

—বাবা আছেন, মফস্বলে কাজ করেন ওষুধ বিক্রির।

—কোলকাতায় কোথায় থাকো?

—মামার বাড়িতে।

—স্কুলে যেতে ভাল লাগে না?

—না, ইংরিজী, অঙ্ক মাথায় ঢোকে না যে।

প্রভাত কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে উঠে পড়ে, আমি চলি রে কেষ্ট, যেতে হবে।

কেষ্ট ছেলেটির কাছে সরে আসে, কি করতে ভাল লাগে?

একটু চুপ করে থেকে ছেলেটি হঠাৎ উত্তর দেয়, বেড়াতে। নিজের ইচ্ছেমত যেখানে খুশি।

—চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, এ-সব দেখেছো?

—দেখেছি ছোটবেলায়, খুব বেশি মনে নেই।

—কাল এই সময় এসো, তোমায় ঘুরিয়ে আনব।

—সত্যি, ছেলেটা উৎসাহিত হয়, খুব মজা হবে তাহলে—

কেষ্ট প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করে, নাও।

ছেলেটা চার দিক দেখে নেয়, আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে, খাবো?

—খাও, এখানে কেউ কিছু বলবে না।

ছেলেটা কেষ্টর সঙ্গে সিগারেট ধরায়।

—তোমার নাম কি?

—মা আমার নাম দিয়েছিলেন শ্যামল।

কেষ্ট শ্যামলকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় ঘুরে বেড়ায়। পাখীর খাঁচা, বাঁদরের ঘর, ওরাং ওটাং,—

—ঠিক মানুষের মত, না কেষ্টদা?

—আমরা তো ওই ছিলাম।

—দেখুন, কি রকম সিগারেট খাচ্ছে।

দর্শকদের মধ্যে থেকে কেউ জ্বলন্ত সিগারেট ছুঁড়ে দিয়েছিলো, ওরাং ওটাং দিব্যি মৌজ করে টানতে থাকে।

ওই দিকে তাকিয়ে থেকেই শ্যামল বলে, আপনার সিগারেটগুলো একটু অন্য রকম, না?

—বেশি কড়া।

—একটা খেলেই আরেকটা খেতে ইচ্ছে করে।

কেষ্ট হাসে, সিগারেট চাই তো পরিষ্কার করে বললেই পার।

দু'জনে সিগারেট ধরায়।

নতুন সিংহ এসেছে, হুঙ্কার ছেড়ে পায়চারী করছে, শ্যামল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

—একেই বলে পশুরাজ, কি সুন্দর চেহারা।

—চল, বেঞ্চটায় একটু বসি। শ্যামল কেষ্টর পাশে গিয়ে বসে।

—মাইনের খাতা আনতে বলেছিলাম, এনেছো?

—এই যে। শ্যামল খাতা এগিয়ে দেয়।

কেষ্ট চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে, তিন মাসের মাইনে দেওয়া হয়নি।

—না।

—কেন, বাড়িতে টাকা দেয়নি?

—দিয়েছিলো, খরচা হয়ে গেছে।

কেষ্ট একটু থেমে জিজ্ঞেস করে, ক্লাসে নাম ডাকে?

—না, কেটে দিয়েছে। শ্যামলের গলা ভারী হয়ে আসে, তাইতো স্কুলে যাই না।

কেষ্ট ডান হাতটা শ্যামলের কাঁধের ওপর রাখে, তাতে কি হয়েছে, আমি সব ঠিক করে দেবো। একটু থেমে জিজ্ঞেস করে, যা জিজ্ঞেস করব বলবে আমায়?

—কি?

—কত দিন সিগারেট খাচ্ছো ?

—এক বছর

—কে শেখালো ?

—ঝুনো নারকোল।

—সে আবার কে ?

—রামচন্দ্র, আমাদের ক্লাসের ছেলে, মাষ্টার মশাইরা ডাকেন ঝুনো নারকোল বলে, তিন বছর একই ক্লাসে আছে কি না।

কেষ্ট কথা চাপা দিয়ে বলে, চল, আজ ওঠা যাক।

গল্প করে হাঁটতে হাঁটতে কতখানি পথ চলে এসেছে, শ্যামলের খেয়াল ছিল না, কালীঘাটের কাছে এসে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, আরে, এ যে অনেক দূর এসে গেছি কেষ্টদা, ঐ তো কালীঘাটের মন্দির।

—আর হাঁটতে হবে না। এই বলে কেষ্ট পকেট থেকে চিরুণী বার করে শ্যামলের হাতে দেয়, চুলটা সামনের দিকে পেতি পেড়ে আঁচড়ে নাও, আমি এখুনি আসছি।

নীচু গলায় বলে, কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে, তুমি আমার ছোট ভাই।

শ্যামলকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে কেষ্ট মোড়ের তিনতলা সাদা বাড়ির ভিতর চলে যায়। প্রথমটা বুঝতে না পারলেও শ্যামল কেষ্টর কথামতই কাজ করে। বাড়ির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকায়, রাস্তায় কত রকম লোক, গ্যাসের আলোর নীচে আলুকাবলী-ওয়ালা, মোড়ের চায়ের দোকানে গলা-ভাঙ্গা রেডিওর গান। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিরক্তি ধরে যায়।

প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে সদর দরজা খুলে কেষ্ট ডাক দেয়, শ্যামল এদিকে আয়। শ্যামল এগিয়ে আসে, তাকে দেখিয়ে কেষ্ট বোঝাতে শুরু করে, এর কথাই এতক্ষণ বলছিলাম। আমার ছোট ভাই শ্যামল কি

কষ্টে যে লেখাপড়া করছে, বই কেনবার পয়সা জোটে না, তার উপরে দু' মাসের মাইনে বাকী, আমার অবস্থা আপনি তো জানেন-ই।

কর্তার হাতে শ্যামলের মাইনের খাতা। নেড়ে-চেড়ে দেখে বলেন, বুঝতেই তো পারছি কিন্তু কি করব বল, সকাল থেকে লোক আসছে, কত জনকে সাহায্য করব।

কেষ্ট ভেঙ্গে পড়ে বলে, নিতান্ত নিরুপায় হয়ে আপনার কাছে এসেছি।

—আমি এক মাসের মাইনে সাত টাকা দিয়ে দিচ্ছি।

—আর তিন টাকা, দুটো বই-এর দাম। আপনাকে আর জ্বালাতন করবো না।

—না না ঐ সাত টাকা। আর আসবে না, মনে রেখো।

কেষ্ট জিভ কেটে পায়ের ধুলো নেয়, আজ্ঞে না, আপনি গরীবের মা-বাপ, তাই খুব বিপদে পড়লে ছুটে আসি। সবাই তো দুঃখীর কথা বোঝে না।

টাকা নিয়ে তারা বেরিয়ে আসে। শ্যামল চলতে চলতে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি আবার আমায় স্কুলে পাঠাতে চান ?

উত্তর না পেয়ে বলে, আমি কিন্তু স্কুলে যাবো না।

—ইচ্ছে না করে যেও না।

পানওয়ালার দোকানে দাঁড়িয়ে নোট ভাঙ্গিয়ে কেষ্ট সাড়ে তিন টাকা শ্যামলের হাতে দিয়ে বলে, এটা তোমার।

—টাকা নিয়ে আমি কি করব ?

—যা ইচ্ছে তাই করবে, এর জন্যে কাউকে হিসেব দিতে হবে না।

বাড়ির কাছে এসে শ্যামল কেষ্টর কাছ থেকে বিদায় নেয়। ক্লান্ত-স্বরে বলে, কাল আসব।

• • •

দরজা খোলা ছিল। কেষ্ট ভেতরে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে নিজের ঘরে উঠে

যায়। নীচে কারা এসেছে, আলাপ করার প্রবৃত্তি হয় না। ঘরে ঢুকে জামা খুলে পেরেকে টাঙিয়ে রাখে। পা না ধুয়েই বিছানায় বসে পড়ে।

একটু পরে ভাইঝি শ্যামা ওপরে আসে।

—কাকু, তোমার খাবার নিয়ে আসি ?

—নিয়ে আয়।

—তুমি নীচে আসবে না ?

—নীচে কেন ?

—অনেকে এসেছে মামার বাড়ি থেকে।

—না, আমি যাবো না। পারিস তো খাবার নিয়ে আয়।

শ্যামার বয়স দশ কি বারো হবে, চুলের মত কালো রঙ, ভীষণ কোঁকড়া চুল, এতটুকু শ্রী নেই চেহারায়।

কেষ্টর কথামত সে খাবার ওপরে নিয়ে আসে, আজ পদের বাহুল্য ছিল। কেষ্ট খেতে বসে যায়—নে, তুইও খা।

—আমি খেয়েছি।

—তা কি হয়েছে, নে মাছটা খেয়ে ফেল।

কেষ্ট হঠাৎ বলে, তুই নীচে যা, আমি এঁটো বাসন সব গুছিয়ে রাখব। শ্যামা কথা বলে না, চুপ করে বসে থাকে।

—বসে রইলি যে, যা।

—নীচে আমার ভাল লাগে না।

কেষ্ট ভাল করে শ্যামার মুখটা দেখে নিয়ে বলে, কেন কি হয়েছে রে ?

শ্যামার চোখে জল ভরে আসে। কেষ্ট খাওয়া ফেলে তাকে কাছে টেনে নেয়, বোকা মেয়ে কাঁদতে আছে কখনও !

শ্যামা ফুঁপিয়ে ওঠে, মামার বাড়ির ছেলে-মেয়েরা আমায় কি রকম ঠাট্টা করে, বলে তোর নাম শ্যামা নয়, কালী। জিভ বার করে দাঁড় করিয়ে দিলেই সাক্ষাৎ মা-কালী।

কান্নায় তার কথা আটকে যায়।

বড়দের কাউকে বলে দিসনি কেন ?

—বাবাকে বলেছিলাম।

—কি বললে ?

—বললে, ঠিকই তো বলেছে, এতে রাগের কি আছে, কাক বলেনি এই ঢের।

কথা বলতে বলতে শ্যামা হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলে, তাই শুনে ওরা কি রকম হাসছিলো।

কেষ্ট শ্যামার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, অনেকক্ষণ কেঁদে শ্যামা শান্ত হয়।

কতক্ষণ এভাবে কেটেছে খেয়াল ছিল না। নীচে থেকে ছোটদের দলের গলা শোনা যায়, মা কালী গেল কোথায়, মা কালী ?

সিঁড়ি দিয়ে সবাই উপরে উঠে আসে, শ্যামা কেষ্টকে জড়িয়ে ধরে।

ছেলের দল কেষ্টকে দেখে থমকে দাঁড়ায়, দরজার বাইরে থেকে শান্ত গলায় ডাকে, শ্যামা, খেলবি আয়।

কেষ্টর কণ্ঠসংলগ্ন শ্যামা মাথা নেড়ে জানায় সে যাবে না।

—আয় না, আয় না, বলে এগিয়ে এসে তাদের মধ্যে একজন শ্যামার হাত ধরে টানে। রাগে কেষ্টর ঠোঁট কাঁপছিল, সজোরে চড় মারে ছেলেটার গালে। জানোয়ার, বেরোও এখান থেকে।

মার খেয়ে ছেলেটা মাটিতে পড়ে যায়, গালে হাত রেখে ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়ায়। ততক্ষণে অন্যরা কলরব করতে করতে নীচে নেমে গেছে, ও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

শ্যামা হতভম্ব হয়ে যায়, কেষ্টকে এতখানি রাগতে সে আগে দেখেনি। বিছানার কোণে গিয়ে বসে। কেষ্ট বাঁ হাত দিয়ে চোখ দুটো চেপে ধরে।

নীচে ছেলেটার কান্না শোনা যাচ্ছে, অন্যদের নালিশ, দাদার গর্জন।

একটু বাদে উঠোন থেকে দাদার চিৎকার শোনা যায়, কোথায় গেল মুখপুড়ী, শ্যামা, শ্যামা—

ঘরের ভেতর থেকে চেঁচিয়ে কেষ্ট উত্তর দেয়, ও এখন যাবে না।

—আসবে না মানে? আমি ডাকছি আসবে না? আলবাৎ আসবে।

—যাবে না।

—এত বড় আস্পর্ধা, আমার কথা অমান্য করা, এই সব শিখছে তোমার কাছে। কেষ্ট আরও গলা চড়িয়ে বলে, বেশ করেছে।

—আমার শ্বশুর বাড়ির লোকের গায়ে তুমি হাত দিয়েছ কোন্ সাহসে?

—একশো বার দেব, ছোটলোকমি করলে।

—দাদার আর ধৈর্য থাকে না। সিঁড়ির উপর কয়েক ধাপ উঠে পড়েন, ছোট লোক? তুমি নিজে ছোট লোক, ক' অক্ষর গোমাংস, ভ্যাগাবণ্ড, লোফার।

—শাট্আপ, কেষ্ট ধমকে ওঠে, বাজে বকো না।

—বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে।

—তোমার বাড়ি, নিজের পয়সায় করেছো, কেরানী আবার বাড়ি করবেন। পৈত্রিক বাড়িতে তোমার যত ভাগ আছে আমারও তত ভাগ।

—আচ্ছা, দেখা যাবে। শ্যামা চলে আয়।

—ও এখন যাবে না।

—ও নিজের মুখে বলুক।

—আমি বলছি ও যাবে না।

—আচ্ছা দেখছি, পুলিস ডেকে নামিয়ে আনবো। তোমার ওস্তাদি বার করছি। কেষ্ট আর কথা বলে না, দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ে। শ্যামা কাঁদছিল, এতক্ষণে কেষ্টর খেয়াল হয়, কাঁদলে গলা টিপে দেব, শুয়ে পড় এখানে।

ভোর রাত্রে বৌদি এসে দরজা ঠেলে, ঠাকুরপো ?

কেষ্ট দরজা খুলে দেয়, বৌদি ভয়ে ভয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অনুমতি চায়, শ্যামাকে নিয়ে যাই ?

—যাও। কেষ্ট শুকনো গলায় উত্তর দেয়।

একটু থেমে বৌদি কৈফিয়তের সুরে বলে, তোমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে যা মেজাজ, আমি তো ভয়ে মরি। বিশেষ করে তোমার দাদা, মাথার যদি এতটুকু ঠিক থাকে। মায়ের পেটের ভাই, তাকে বলছে কি না—

কেষ্ট বাধা দেয়, আমার এখনও ঘুম কাটেনি বৌদি। তুমি মেয়েটাকে নিয়ে যাও, দেখো, আবার মারধোর কোর না।

কথা শুনে বৌদি তো অবাক, কি যে বল, নিজের মেয়ে—

—থাক্ থাক্, ঢের বক্তৃতা শুনেছি। এখন নীচে যাও।

শ্যামা বিছানা থেকে উঠে চোখ রগড়াচ্ছিল, বৌদি আর কথা না বলে তার হাত ধরে নেমে যায়। কেষ্ট আবার দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ে, কিন্তু আর ঘুম আসে না।

পরদিন সকালে কেষ্ট চা খেতে এলো অনন্ত-কেবিনে অন্য দিনের চেয়েও দেরিতে। আশুদা জিজ্ঞেস করলেন—আজ এত দেরিতে যে ?

—আর বলবেন না, কাল আবার ঝগড়া—

—কি, দাদার সঙ্গে ?

কেষ্ট ব্যাজার মুখে উত্তর দেয়—আর কার সঙ্গে—

আশুদা হাসেন—এ আর নতুন কি, রোজই তো লেগে আছে।

—আর ভাল লাগে না। ভাবছি এবার আলাদা হয়ে যাব।

—সে তো তিন বছর থেকে ভাবছো।

—আমার আর কি। ওরাই মরবে। একতলা তো আমি ব্যবহারই করি না। উপরের একখানা ঘরে পড়ে থাকি। বাড়ি ভাগ হ'লে

নীচের একখানা ঘর আমায় দিতে হবে। তখন কি করে থাকবে শুনি রাবণের গুষ্টি নিয়ে ?

আশুদা মাথা নাড়েন, এতই যদি তোমার সুবিধে একটা উকিল আর একটা রাজমিস্ত্রী ডেকে—

কেষ্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে—হয় না আশুদা, এত সহজে কিছু হয় না। ওই যে শ্যামা—দাদার কালো মেয়েটা—ওকে বাড়িতে কেউ দু'চোখে দেখতে পারে না, বাড়ি ভাগ করলে আমার কাছে যেতে দেবে না। কেঁদে কেঁদেই মরে যাবে।

আশুদা চুপ করে যান, চেঁচিয়ে বলেন, ওরে কেষ্টবাবুকে চা রুটি দিয়ে যা।

কেষ্ট খবরের কাগজ নিয়ে ওপর ওপর চোখ বোলায়। বিশেষ কোন খবর নেই, মামুলী কথা।

আশুদা বললেন, বাই-ইলেকসনের তোড়জোর চলছে যে।

—দেখছি তো! একটু থেমে কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, কারা দাঁড়িয়েছে ?

—চার জন। তিন জন তিন পার্টির থেকে আর একজন ইনডিপেণ্ডেন্ট।

—তিনি ?

—রাঘব বোয়াল!

—শুনছিলাম বটে রাঘব বোয়াল দাঁড়িয়েছে।

আশুদা চিবিয়ে বলেন, ওর চর'রা এসেছিল। পাড়ার ছেলেদের চায়, ওর হয়ে খাটবার জন্যে।

—কি রকম দেবে থোবে ?

—পয়সা আছে সাধ্যমত কোরবে নিশ্চয়। আমি তোমার নাম দিয়ে দিয়েছি।

কেষ্ট আড়মোড়া ভাঙ্গে,—যাবো একবার বিকেলের দিকে, দেখি, আমার সঙ্গে পটে কি না।

রঘু বাঁড়ুজ্জের বাড়ি পাড়াতেই। মোড়ের মাথায় তিনতলা বিরাট বাড়ি, ছ'খানা গাড়ী, তকমা-আঁটা দ্বারবান। গেটের ছ'পাল্লায় ইংরাজী বড় হরফে লেখা আছে, আর. বি। তাই পাড়ার লোকে নাম দিয়েছে, রাঘব বোয়াল।

আজ আর কেষ্টকে দ্বারবানের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হল না। সেলাম ঠুকতে ঠুকতে নিয়ে গেল বৈঠকখানায়। সেখানেও আপ্যায়নের ক্রটি নেই। রাঘব বোয়ালের তিন জন ছেলে চা সিগারেট যুগিয়ে যাচ্ছে, আসর জুড়ে বসে আছে পাড়ার মার্কামারা ছেলেরা—সুধীর, বীরেন, ভোঁদা আর তাদের সাঙ্গোপাঙ্গ। এই ঘরে তারা জড়ো হয়েছিল দাঙ্গার সময়—৪৬ সালে। তার পর এই আবার তাদের ডাক পড়েছে।

সিঙ্গাড়া-মিষ্টি-চা পরিবেশনের পর রাঘব বোয়াল তাঁর বক্তব্য জানালেন—আপনারা সকলেই জানেন, আমি নিজের ইচ্ছেয় এই উপনির্বাচনে দাঁড়াইনি। পাড়ার সকলের বিশেষ অনুরোধে নিজের কর্তব্য পালনের জন্য দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু আমার তো কোন বল নেই। বল আপনারা, আপনারা যদি ভরসা দেন তবেই নির্ভয়ে এ কাজে এগুতে পারি।

আধঘণ্টা ধরে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন রাঘব বোয়াল। পরের জন্য কতকখানি আত্মত্যাগ করেছেন তারই মহিমা প্রচার। অনেকে বাহবা দিল, অনেকে টুকরো মতামত প্রকাশ করলো, কিন্তু সকলেই একবাক্যে সায় দিল, তাঁকে সাহায্য করবে বলে।

জয়ধ্বনি করে সবাই চলে গেলেও কেষ্ট দাঁড়িয়ে ছিল রাঘব বোয়ালের সঙ্গে একান্তে পরামর্শ করার জন্যে।

—কেষ্ট, তোমার ওপরই আমার সবচেয়ে ভরসা। দাঙ্গার সময়

এপাড়া তো তুমিই বাঁচিয়েছিলে, কেষ্টকে আপ্যায়িত করেন রাঘব বোয়াল।

—এত যে লোক জুটিয়েছেন, কাজের বেলা দেখবেন সব চু-চু।

—তা আর জানিনে, কিন্তু কি করব। এসব ব্যাপারে সকলকেই খুশি রাখতে হয়। মেয়ের বিয়ে দেওয়া এর চেয়ে সোজা।

কেষ্ট মুখে খানিকটা ডালমুট ফেলে বলে, একটা জীপ দরকার হবে।

—তা তো হবেই, আমার কারখানা থেকে আনিয়ে দেবো।

—ড্রাইভার দরকার নেই, আমিই চালাব, শুধু পেট্রোলের একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।

—ওই মোড়ের পেট্রোল পাম্পে আমার অ্যাকাউণ্ট আছে, কুপন দিলেই ওরা পেট্রোল দেবে।

—কি ভাবে আমি কাজ করতে চাই ক'দিনের মধ্যেই আপনাকে জানিয়ে দেবো। আপনি আমাদের পাড়া থেকে দাঁড়িয়েছেন, আপনাকে জেতাতে না পারলে আমাদেরই লজ্জা, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন, আজ থেকে সব ভার আমরা নিলাম।

রাঘব বোয়াল বিনয়ে ভেঙ্গে পড়েন, আমি তো আগেই বলেছি ভাই, তোমাদের বলই আমার বল। আমাকে ভালবাসো বলেই তোমরা এসেছ।

—যে ক'জন কাজের লোক এপাড়ায় আছে, সকলেই আমার হাতের মুঠোর মধ্যে। আজ থেকেই কাজে লাগিয়ে দিচ্ছি। তবে সাবধান, অনেকে ধাপ্পা দিয়ে টাকা খসাবার চেষ্টা করবে। তাদের কথায় কান দেবেন না।

পরদিন অনন্ত-কেবিনে এসে কেষ্ট দেখে, শ্যামল বসে আছে।

—কি রে, এ ক'দিন আসিসনি কেন?

শ্যামলের চোখে-মুখে কেমন যেন লজ্জার ভাব, বলে, এমনি—

কেষ্ট বসে পড়ে কাগজপত্র বার করতে করতে হাঁক দেয়, ওরে দু'কাপ চা আর মামলেট দিয়ে যা।

খাবার আসতে দেরি হয়। কেষ্ট একমনে কি যেন লেখে। শ্যামল চুপ করে বসে থাকে, দেখে, অন্যদিকে দু'-একজন ভদ্রলোক রাজনীতি নিয়ে তর্ক করছেন। দোরগোড়ায় আশুদা ক্যাশবাক্সের কাছে বসে ঢোলেন। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে একটা ভিখারী মেয়ে পয়সা চাইছে।

কেষ্ট হঠাৎ মুখ তুলে বলে, জানি তুই এতদিন আসিসনি কেন, ভাবছিলি সেদিন টাকাটা নেওয়া উচিত হয়েছে কি না, তাই না?

ধরা পড়ে গিয়ে শ্যামলের মুখ শুকিয়ে যায়।

—টাকা কি করলি?

শ্যামল সসঙ্কোচে বলে, পকেটে আছে।

—দূর গাধা, তুই কোন কর্মের নোস্।

এর মধ্যে খাবার দিয়ে গিয়েছিল, শ্যামল কথার কোন উত্তর না দিয়ে খেতে শুরু করে।

আর কোন কথা হয় না। প্রায় আধ ঘণ্টা বসে থাকার পর কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, মাইনের খাতা এনেছিস্?

শ্যামল মাথা নেড়ে সায় দেয়।

—যাবি?

শ্যামল ভয়ে ভয়ে মুখ তুলে তাকায়।

—হাঁ করে কি দেখছিস্, যাবি?

— চলুন।

শ্যামবাজারে যে বাড়িতে কেষ্ট শ্যামলকে নিয়ে এল, তারা বনেদি জমিদার। আগের মত বোলবলা না থাকলেও অবস্থা বেশ ভালই। কিন্তু সরকার মশাই-এর সঙ্গে কিছুতেই কেষ্ট কথায় পেরে ওঠে না।

—বলছি তো, আমি একটা পয়সাও দেব না।

কেষ্ট করুণ মুখে বলে, সে আপনার যা ইচ্ছে। তবে আমরা গরীব মানুষ, ভাইটা ম্যাট্রিক পাস করলেও কোথাও একটা কাজে ঢুকিয়ে দিতে পারি, দেখুন মাইনের খাতা, ক্লাসের রিপোর্ট, দু'মাসের মাইনে দিতে পারিনি।

—মিথ্যে চেষ্টা করছ বাপু, এক দিন ছিল যখন এ বাড়িতে হাজার হাজার কাঙালী বিদায় করা হয়েছে, আজ সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই।

—বড় অভাবে পড়ে ছুটে এসেছি, কিছু না হোক এক মাসের মাইনে সাত টাকা—

—সাতটা পয়সা দেবারও ক্ষমতা নেই।

রাস্তায় বেরিয়ে চলতে চলতে শ্যামল হঠাৎ বলে, আমার কি রকম লজ্জা করে।

—কিসের ?

—এ ভাবে পয়সা চাইতে।

—কি এমন মানী লোক যে লজ্জায় মাথা কাটা গেল ?

শ্যামল উত্তর দেয় না, গ্যাসের আলোর নীচে দাঁড়িয়ে কেষ্ট পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে। ইংরাজী টাইপ করা, নীচে কয়েকজনের সই রয়েছে, শ্যামলের হাতে কাগজটা দিয়ে বলে, ঐ কোণের লাল বাড়িটায় যা, মাইনের খাতা, এই কাগজ, সব কিছু দেখাবি। ভাখ, কিছু দেয় কি না।

শ্যামল আপত্তি করতে পারে না, ভয়ে ভয়ে লাল বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কেষ্টর দেওয়া চিঠিটা পড়ে। সব শব্দের মানে না জানলেও ভাবার্থ বুঝতে অসুবিধে হয় না। তাতে লেখা আছে, এ ছেলেটি আমাদের পরিচিত, অনাথ কিন্তু মেধাবী। আপনারা

একে সাহায্য করলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। নীচে কয়েক জনের নাম সই করা।

বাবু বাড়ি ছিলেন না, গিন্নী-মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসেন—কি চাই খোকা?

কথা বলতে গিয়ে শ্যামলের গলা আঁটকে যায়, কিছু বলতে পারে না। হাতের কাগজগুলো বাড়িয়ে দেয়।

—আহা কি দরকার, মুখেই বল না।

—ইস্কুলে দু'মাসের মাইনে দেওয়া হয়নি। শ্যামল থেমে যায়, হঠাৎ বলে ফেলে, আমরা বড় গরীব। এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে তার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে, কিছুতেই থামাতে পারে না।

গিন্নী-মা চোখের জল দেখে বিচলিত হয়ে পড়েন, আহা কাঁদছ কেন? লেখা-পড়া শিখে নিজেই একদিন রোজগার করবে, মাস কাবারের সময় হাতে বেশি টাকা নেই, এখন দু'টাকা দিচ্ছি নিয়ে যাও।

আঁচল থেকে টাকা খুলে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করেন, কোন্ ক্লাসে পড়?

—থার্ড ক্লাস।

—পুরোন বই-এর দরকার থাকলে বলো। আমার ছেলেরা সব কলেজে পড়ে, ইস্কুলের বই অনেক আছে। একদিন সকালের দিকে এসে ওদের সঙ্গে আলাপ করে নিয়ে যেও।

শ্যামল তাঁকে প্রণাম করে বেরিয়ে আসে। দূরে কেষ্ট দাঁড়িয়ে ছিল, শ্যামলের কাছে এগিয়ে আসে, কি হল?

শ্যামল দুটো এক টাকার নোট কেষ্টর দিকে এগিয়ে দেয়। কেষ্ট হাসে, শ্যামলের পিঠ চাপড়ে বলে, বাঃ, এই তো শিখে গেছিস, তোর এক টাকা আমার এক টাকা।

শ্যামল ম্লান হাসে, হাতের নোটের দিকে তাকায়, এই তার প্রথম রোজগার।

শ্যামলের বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হ'ল। কেষ্টর কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে সে সোজা বাড়িতে ঢোকেনি, পথে পথে অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়িয়েছে পকেট থেকে টাকা বা'র করে বার বার দেখেছে।

বৈঠকখানায় তক্তাপোষের ওপর শশধরবাবু চোখ বুজে শুয়ে ছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কি রে, ফিরতে এত রাত হ'ল?

শ্যামল চমকে ওঠে, বাবাকে এমন দিনে সে আশা করেনি। মাসের শেষের দিকে কলকাতায় বড একটা উনি আসেন না। তাই আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে, তুমি কখন এলে?

—বিকেলের গাড়ীতে, শরীরটা ভাল নেই। তোর ফিরতে এত রাত হয় কেন?

শ্যামল একটু ভেবে নিয়ে উত্তর দেয়, কোচিং ক্লাসে গিয়েছিলাম। শশধরবাবু উঠে বসেন, ইস্কুলের পর যেতে হয় বুঝি?

—হ্যাঁ, উঁচু ক্লাসে একটু বেশি পড়তে হয়।

—কোচিং ক্লাসে আবার ফী লাগবে তো?

শ্যামল থতমত খেয়ে বলে, না পয়সা লাগবে না, কেষ্টদা আমাদের এমনি পড়ান।

কথা শেষ হয় না, শ্যামলের মামা জগৎবাবু ঘরে ঢুকলেন।

—এই তো শ্যামল এসে গেছে, তুমি মিছামিছি এতক্ষণ ভাবছিলে। জগৎবাবু তক্তাপোষের উপর বসে পড়েন। ভদ্রলোক বেঁটে, নেয়াপাতি ভুঁড়ি, সওদাগরী অফিসের বড়বাবু। সন্ধ্যাবেলা পান করা তাঁর অনেক দিনের অভ্যেস, আজকেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। নেশার ঝোঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় গিয়েছিলি, তোর বাবা যে ভেবে ভেবে ম'ল।

শ্যামলের হয়ে শশধরবাবু উত্তর দেন, কোচিং ক্লাসে পড়তে গিয়েছিল।

—ওরে বাবা, ইস্কুলের ক্লাস, তার ওপর কোচিং ক্লাস, বিদ্যের জাহাজ হবি নাকি?

শ্যামল উত্তর দেয় না, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। জানে সন্ধ্যের পর মামার কথার উত্তর দিয়ে লাভ নেই, উনি অনর্গল বকে যান।

—খবর্দার বেশি লেখাপড়া করিসনি, তাহলে অফিসের ক্লার্ক কি বেয়ারা ছাড়া আর কিছু হতে পারবি না।

কথা তাঁর বেশ জড়িয়ে আসে, আরও জোর দিয়ে বলেন, আমার বাবা ভীষণ লেখাপড়া করেছিল, ফল কি হ'ল, না ইস্কুল মাস্টার। ষাট টাকার বেশি মাইনে এক পয়সা বাড়লো না। তারপর মনে কর তোর বাবা এই শশধরদা, হাজার হোক গ্র্যাজুয়েট তো, কি হ'ল? না অষুধের ক্যানভাসার।

শ্যামল এ প্রসঙ্গ চাপা দেবার চেষ্টা করে, মামা, আমি যাই, মুখ হাত পা ধুয়ে নিই—

—দাঁড়া, যা বলছি শোন, আমি আরও কম লেখাপড়া করেছি, কোন রকমে ম্যাট্রিকটা পাস করেছিলাম, যাহোক তাই বড়বাবু হতে পেরেছি। তুই যদি আরও কম পড়িস তাহলে একদম বড় অফিসার হয়ে যাবি। কেউ আটকাতে পারবে না।

ভেতর থেকে মাসীমা হাঁক দিলেন, এস সবাই, খাবার দেওয়া হয়েছে।

শ্যামল এই সুযোগই খুঁজছিল—যাই মাসীমা, বলে সাড়া দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

শ্যামলকে বাড়ি পৌঁছে রাঘব বোয়ালের বাড়ি আসতে কেষ্টর অনেক দেরি হয়ে গেল, তাঁর বড় ছেলে বললে, বাবা আপনার জন্যেই এতক্ষণ বসেছিলেন, এই মাত্র খেতে ওপরে গেছেন।

—আসতে দেরি হয়ে গেল, বড় ঝামেলার কাজ বুঝতেই তো পারছেন, আমি বরং কাল আসব।

—আপনি বসুন, আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করে আসছি।

কেষ্টকে বেশিক্ষণ বসতে হ'ল না, রাঘব বোয়াল নিজেই নেমে এলেন।

—তোমাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম।

—না, এই এসেছি। আপনাকেই এত রাত্রে বিরক্ত করলাম।

—মোটেই নয়, মোটেই নয়। রাঘব বোয়াল ঘন ঘন মাথা ঝাড়েন। তারপর, কি খবর বল?

—আমি দল ঠিক করেছি, আমাদের ভোটার লিস্ট দেবেন, আমরা নিজেরা গিয়ে আলাপ করে আসব। বিশেষ করে বস্তিগুলোতে, ভোট তো ঐখানেই বেশি পাওয়া যাবে।

—তুমি ঠিক বলেছো, যাঁরা অবস্থাপন্ন, তাঁদের ধরবার আমার লোক আছে। বস্তিগুলো যদি তুমি যোগাড় করতে পার, তাহলে অনেকটা কাজ এগুবে।

কেষ্ট বিজ্ঞের মত হাসে, তাইত বলছি। এদের হাত করা শক্ত নয়। ভাই ভাই বলে পিঠে হাত দিয়ে বোঝাতে হবে, দু-একদিন ভাল-মন্দ খাওয়াতে হবে, এর বেশি কিছু নয়। তাছাড়া এখন ছোটখাট ক্লাবগুলোকেও হাত করতে হবে, এদের কিছু চাঁদা দিলেই আপনার দিকে চলে আসবে।

—সে তো দিতেই হবে। লাইব্রেরীতে কিছু বই দেওয়া, ফুটবল-ক্লাবে জার্সি, ব্যাডমিণ্টন-ক্লাবে রাত্রে আলো দেওয়া—

কেষ্ট বাধা দেয়, ব্যস ব্যস। এ করলে আর দেখতে হবে না। দেখি ক'টা ভোট বাক্সয় পড়ে। কয়েকটা জনসভার ব্যবস্থা করতে হবে তো।

—সে তোমরা যা ভাল বোঝ—

—আমি সব পাড়াতেই ব্যবস্থা করে রাখছি, সেই পাড়ার লোক দিয়েই সভা ডাকাব। তারা নিজেরা এসে বক্তৃতা দেবার জন্যে আপনাকে আমন্ত্রণ জানাবে। আপনি গিয়ে দু'চারটে গরম গরম কথা বলবেন—

রাঘব বোয়াল উৎসাহিত হন, এ তোমার খুব ভাল বুদ্ধি হয়েছে,

একবার বক্তৃতা দিতে উঠলে আর আমাকে পায় কে, প্রথমেই সরকারের নামে নিন্দে করতে হবে, দেশে কি রকম দুর্নীতি রয়েছে, কালো বাজারীদের অত্যাচার, পুলিস জুলুম। এ সব বিষয়ে খুব শক্ত শক্ত কথা আবার মুখস্থ আছে।

কেষ্ট সায় দিয়ে বলে, আপনার বক্তৃতা কে না শুনেছে, যেমন ভাষা তেমনি বলবার ভঙ্গি, এ ইলেক্‌সানে আপনার জয় নিশ্চিত!

গলাটা একটু নামিয়ে বলে, কিছু টাকার দরকাব, ছোঁড়াগুলোকে হাতে রাখা চাই তো।

—কত দেবো, বেশি টাকা তো নেই, একশ' টাকায় হবে?

—অত কি হবে, টাকা পঞ্চাশ হলেই আপাতত চলে।

রাঘব বোয়াল পকেট থেকে টাকা বার করে দেন, কেষ্ট পাঁচখানা দশ টাকার নোট নিয়ে বেরিয়ে আসে।

জীপ-এ করে কেষ্ট ঘুরে বেড়ায়, সকাল থেকে রাত্রি। গাড়িতে তেল ফুরিয়ে আসলে পাড়ায় ফেরে, আর নয়ত রাত্রে বাড়িতে শোবার জন্যে। ক'দিনের অবিশ্রান্ত কাজ।

রাঘব বোয়াল বলেন, কেষ্ট কাজের লোক বটে, এই ক'দিনে চার দিক গরম করে তুলেছে।

বন্ধু প্রভাত বলে, কেষ্টটা চিরকাল ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ালো।

অনন্ত-কেবিনের আশুদা বলেন, যাক, কেষ্টর দৌলতে পাড়ার ক্লাবগুলো আবার চেগে উঠল।

কেষ্ট কোন কথা বলে না, নিজের মনে কাজ করে যায়। রাস্তায় প্রায়ই দেখা যায় জনকয়েক চিৎকার করতে করতে চলেচে,—ভোট ফর রঘু ব্যানার্জী। সেই সঙ্গে কত রকমের শ্লোগান যা কেষ্টই ঠিক করে দিয়েছে। অন্য পার্টির নকল করে। যে পাড়া থেকে যে দলই

বেরোক, রাঘব বোয়ালের বাড়ির সামনে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে যায়।

পাড়ায় পাড়ায় পোস্টার লাগান হয়েছে, নানা ভাষায়, নানা রঙে। অন্য প্রার্থীদের পোস্টারের ওপর কেষ্ট ইচ্ছে করে নিজেদের গুলো দিয়েছে। সে নিয়ে কত জায়গায় ঝগড়া হয়।

—কে মশাই রঘু বাঁড়ুজ্যে, জীবনে নাম শুনিনি—

—শুনবেন কি করে, অন্ধকূপের মধ্যে বসে আছেন।

—কি করেছেন তিনি?

—কি করেন নি? কেষ্ট নির্বিকার ভাবে ফিরিস্তি দিয়ে যায় রাঘব বোয়ালের গুণের।

—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন থেকে আজ পর্যন্ত যত রাজনৈতিক আন্দোলন হয়েছে মায় ট্রামভাড়া সংগ্রাম অবধি সব ব্যাপারই তিনি নিজে চালিয়েছেন, কিন্তু নাম প্রকাশ করেননি।

কেষ্টর দল পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেয় রাঘব বোয়াল কত বড় একজন নীরব কর্মী।

এরই মধ্যে একদিন দুপুরবেলা চৌরঙ্গীর সিনেমার সামনে দাঁড়িয়ে কেষ্ট ভাবছিল ঢুকবে কি না, এমন সময় একটি মেয়ে এসে কাছে দাঁড়ায়, বলে, আমার একটা কথা শুনবেন?

অন্যমনস্ক হয়ে কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, কি?

—আমার ছোট ভাই-এর বড় অসুখ, মর-মর। এই দেখুন ডাক্তারের প্রেসক্রিপসন্, ওষুধ কেনার পয়সা নেই।

কেষ্ট হাসে। মেয়েটি করুণ চোখে তাকায়, টাকা চাই না, এই অষুধ কটা কিনে দিন।

কেষ্ট খুব আস্তে মন্তব্য করে, এখনও কাঁচা।

মেয়েটি তখনও ঘ্যান-ঘ্যান করে, তিন দিন থেকে চেষ্টা করছি, এই এক শিশি অষুধ একজন কিনে দিয়েছিলেন। বড়ী, মিক্সচার, কিছুই দিতে পারিনি। ডাক্তার বলেছে আজ ওষুধ না পড়লে—

কেষ্ট হঠাৎ বলে, বেশ, আমি তোমাদের বাড়ি যাব, যদি দেখি তোমার ভাই-এর সত্যি অসুখ, আমি টাকা দেব।

—অত দূরে কি যেতে পারবেন? টালিগঞ্জে, রেফিইজি বস্তীতে থাকি।

—ঠিক আছে, ঠিকানা দাও।

মেয়েটি ঠিকানা বলে, কেষ্ট নোট-বুকে লিখে নেয়, জিজ্ঞেস করে, তোমার নাম?

—গৌরী।

সন্ধ্যের আগেই কেষ্ট হাজির হয় টালিগঞ্জের উদ্বাস্তু বস্তিতে। গাড়ী থেকে নামতে দেখে তাকে জমিদার বাড়ির পাকা দালান পার করিয়ে নিয়ে যাওয়া হল ভিতরের বস্তিতে। খবর পেয়ে গৌরী এগিয়ে এসে তাকে ঘরে নিয়ে যায়।

—এই নোংরা জায়গায় আপনার কষ্ট হবে জেনেই আসতে বারণ করেছিলাম।

কেষ্ট উত্তর দেয় না, গৌরীর সঙ্গে ছোট কুঠরীর সামনে এসে দাঁড়ায়। মাটির ঘর, ওপরে টিনের চালা। ঘরের এক কোণে নোংরা বিছানায় একটা ছেলে শুয়ে আছে প্রায় নির্জীব।

গৌরী ভেতরে ঢুকে গিয়ে বলে, ওই আমার ভাই।

কেষ্ট স্তম্ভিত হয়ে যায়, ক'দিন ভুগছে?

—প্রায় এক মাস।

—দেখি ডাক্তারের প্রেসক্রিপসান?

গৌরী এগিয়ে দেয়, তার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে কেষ্ট বলে, আমার সঙ্গে একজনকে দাও, এখুনি ওষুধ কিনে পাঠিয়ে দেব।

—চলুন, আমিই যাব।

—এর কাছে কে থাকবে?

—ভগবান।

কেষ্ট আর কথা বলে না। গৌরী বলে, গাড়ীতে যাবার দরকার নেই, ডাক্তারখানা পাশেই আছে।

কেষ্ট গৌরীর কথা মত ডাক্তারখানার দিকে যায়, পথে শুধু জিজ্ঞেস করে, তোমার আর কে আছে?

—ওই ভাই ছাড়া আর কেউ নেই। গৌরীর চোখ ছল-ছল করে ওঠে।

—কেন?

—পাকিস্তান থেকে কলকাতা আসবার পথেই সকলকে হারিয়েছি।

ওষুধ কিনে কেষ্ট গৌরীর হাতে দেয়, বলে, আমার ঠিকানা রেখে দাও, যদি দরকার হয় চিঠি লিখ।

—আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দেবো, গৌরী কেষ্টকে প্রণাম করে।

কেষ্ট জীপএ উঠে স্টার্ট দেয়।

অনন্ত-কেবিনে কেষ্টর জন্যে সকলে বসে ছিল। ওকে ফিরতে দেখেই চিৎকার করে ওঠে—কেষ্টদা, সারা দিন কোথায় ছিলে, এদিকে যে সর্বনাশ হয়ে গেছে!

—কি হয়েছে?

—আজকের মিটিং-এ একেবারে লোক হয়নি, রাঘব বোয়াল রেগে অস্থির। আজই তোমাকে দেখা করতে বলেছে।

কেষ্ট বিরক্ত হয়, কেন, লোক হ'ল না কেন?

—আহা, ওর কাছেই যে 'হনুমান মার্কা'দের মিটিং ছিল, শালারা এমন বজ্জাত, মিটিং-এর পর চা খাওয়াবে বলে সবাইকে টেনে নিয়ে গেল।

আরও বিরক্ত হয়ে কেষ্ট বলে, তোরা কোন কর্মের নোস, ওদের মাইকের তারটাও তো কেটে দিতে পারতিস ?

—তুমি নেই, সাহস হল না।

—যা, এখন জ্বালাতন করিস না, রাঘব বোয়ালকে বলে দে আমার শরীর খারাপ, কাল দেখা করব।

সবাই চলে গেলে এক কোণে কেষ্ট চুপ করে থাকে। আশুদা একবার জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার, আজ এত চুপচাপ কেন ?

—শরীর ভাল নেই আশুদা।

অনেকক্ষণ বাদে প্রভাত এল, একটা পত্রিকা কেষ্টর সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বললে, দেখ, এবারের ইস্যুটা কেমন হয়েছে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেষ্ট নেড়ে চেড়ে দেখে বলে, ভাল।

—কভারের ছবিটা দেখ, এরকম টাটকা মেয়ের ছবি দেখেছিস ? এ বই স্টল-এ পড়তে পাবে না, একেবারে হট্ কেক। কেষ্ট উত্তর দেয় না, জানে প্রভাত এখনও বক-বক করবে।

—সূচীপত্র বার কর, সব কটা লেখা আমার। গোপেশ রায়, বীণা চ্যাটার্জী, 'ক খ গ', সৌমেন তালুকদার—সব আমি। কিন্তু পড়ে দেখ, একবারও বুঝতে পারবি না যে একজনই সব লিখেছে।

—বাহাদুর বটে !

—লেখকদের একটি পয়সা দিতে হবে না, এ না হলে আজকালকার দিনে কাগজ চলে ?

প্রভাত একটু চুপ করে থেকে কেষ্টর দিকে ভাল করে তাকিয়ে বলে, কি হয়েছে রে, এত গম্ভীর কেন ?

কেষ্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে, দুনিয়াটা বড় গোলমেলে।

পরদিন সকালে কেষ্ট এল রাঘব বোয়ালের বাড়ি। আগে থেকেই সেখানে মিটিং চলছিল। কেষ্টকে দেখে তিনি বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন, ছি, ছি, আর বোল না। লজ্জার এক শেষ! বক্তৃতা দিতে গিয়ে মাঠে একটা লোক নেই! আর নাকের ডগায় হনুমান মার্কাদের কি ভিড়, ঘনঘন জয়ধ্বনি, এত অপমান আর আমার জীবনে হয়নি।

কেষ্ট কথা চাপা দেয়, আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, তাই যা গোল-মাল। সামনের মিটিং-এ নিশ্চয় এর শোধ তুলব। পরশু তেকোণ-পার্কে আমাদের মিটিংএ দেখবেন কি কাণ্ড হয়।

রাঘব বোয়ালকে আশ্বস্ত করে কেষ্ট তার দলবল নিয়ে বসল পরামর্শ করতে। পুলিন বললে, কেষ্টদা, বলে তো এলে পরশু দিন তেকোণ-পার্কে মিটিং করবে, কিন্তু সেদিন হনুমান মার্কাদেরও যে ঐখানে মিটিং আছে।

—জানি, ওরা সময় দিয়েছে পাঁচটা, আমরা চারটে থেকে মাঠের অন্য দিকটা দখল করে বসব। যত লোক আসবে, দেখবি সুড়-সুড় করে আমাদের দিকে চলে আসবে। ওদের মিটিং কিছুতেই জমবে না।

যে কথা সেই কাজ। রাতারাতি কেষ্টর দল তেকোণ-পার্ক রাঘব বোয়ালের পোস্টারে ছেয়ে দিল। দুপুর থেকে মাইকে সিনেমার গান বাজতে লাগল, দেখতে দেখতে ছোটখাট ভিড় জমে ওঠে।

কেষ্ট বলে, দেখতে হবে না, মাঠ ভরে যাবে। বেকার, ভ্যাগাবণ্ড আর স্কুল-কলেজ-পালান ছাত্রের সংখ্যা কি কম নাকি? এমন তেকোণ-পার্ক তিনখানা ভরে যাবে।

পুলিন বলে, কিন্তু সাবধান, ওদের দলও ছেড়ে কথা কইবে না, শেষ পর্যন্ত মারামারি হতে পারে।

—আমি তো তাই চাই, আমরা তৈরি হয়ে এসেছি। ওরা তো আঁটঘাট বেঁধে আসবে না, খুব একচোট হয়ে যাবে।

রাঘব বোয়াল বক্তৃতা দিতে এসে অবাক হয়ে গেলেন। এত লোকের সামনে তিনি আগে কখনও বলেন নি। কেষ্টর দলের লোক মাইকে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে ঘন ঘন করতালি, শাঁখ, কাঁসর-ঘণ্টা বেজে ওঠে। রাঘব বোয়াল জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা শুরু করলেন। চললও কিছুক্ষণ, কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। হনুমান মার্কাদের অনেকে এসে পড়ে চিৎকার চেঁচামেচি করে বক্তৃতা থামিয়ে দিতে চায়। কেষ্টর দলও তৎপর হয়ে ওঠে। বচসা শুরু হয়ে গেল, দাঙ্গা হবার উপক্রম, কয়েক মিনিটের মধ্যে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কেষ্টর দল সোডার বোতল ছুঁড়তে থাকে, বেশ কয়েকজন জখম হল। রাঘব বোয়াল এক সুযোগে বক্তৃতা থামিয়ে গাড়ী চড়ে পালিয়ে গেলেন। দাঙ্গার জের চলল অনেকক্ষণ। হনুমান মার্কাদের দল প্রথমটায় মার খেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু আরও লোকজন নিয়ে ফিরে এসেছিল। ঠিক সময় পুলিস এসে না পড়লে রক্তারক্তি কম হত না। হাতের কাছে যাদের পেল, পুলিস গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। মাত্র দু'জন ছাড়া কেষ্টর দলের সকলেই পুলিস আসার আগেই পালিয়েছিল।

কেষ্টরা ফিরলে উৎকণ্ঠিত রাঘব বোয়াল জিজ্ঞেস করলেন, কি হল আমি তো কিছুই বুঝতে পারলাম না। মারামারি কেন ?

কেষ্ট জবাব দিলে, হিংসে, হিংসে, তা ছাড়া আর কি! ওদের মিটিং-এ লোক হয় নি, তাই ইচ্ছে করে গোলমাল বাধাল।

—সোডার বোতল ছুঁড়ছিল কারা ?

—ওরাই তৈরি হয়ে এসেছিল, ভাগ্যিস আমাদের বিশেষ কিছু লাগেনি। নিরীহ জনতার উপর অত্যাচার।

রাঘব বোয়াল বলেন, যাই বল, এত ভিড় হবে আমি আশা করি নি।

—বলেছি তো নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন, আপনার জয় অনিবার্য।

ক'দিনই শ্যামল এসে ফিরে গেছে, কেষ্টর সঙ্গে দেখা হয় নি। অবশ্য আজকাল অনন্ত-কেবিনে একলা বসে থাকতে তার খারাপ লাগে না। আশুদা, প্রভাত, পুলিন অনেকের সঙ্গেই আলাপ হয়ে গেছে। আশুদা বলেন, অত 'কেষ্টদা' 'কেষ্টদা' করে ছটফট কর কেন? বসে চা খাও না। একবার যে এখানে চা খেয়েছে, সে ঘুরে ফিরে ঠিক এখানে আসবেই।

প্রভাত খেই ধরে, তা আর বলতে, আশুদা'র চা না খেলে আমি তো লেখার ইন্সপিরেশনই পাই না।

শ্যামল জিজ্ঞেস করে, এখানে এত গোলমালের মধ্যে কি করে লেখেন?

প্রভাত হাসে, আমার এখানে-সেখানের বাছ-বিচার নেই, যেখানে বসিয়ে দেবে, লিখে যাব। এই দেখ না, একটা উপন্যাস লিখছি। মাত্র তিন দিনে এতখানি লেখা হয়ে গেছে, আর খুব হলে সাত দিন, তিনশ' পাতার মোটা বই।

—বই এর কি নাম?

—মধুবালা।

—সিনেমার মধুবালা?

প্রভাত হাসে, বিজ্ঞের হাসি, তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই, শুধু ঐ নামটা দিয়েছি। এখন থেকে বই-এর অর্ডার আসছে।

একটু চুপ করে থেকে শ্যামল জিজ্ঞেস করে, আপনি ডিটেক্‌টিভ বই লেখেন নি?

—অনেক, তবে নিজের নামে নয়। নাম খারাপ হয়ে যায় কিনা, তাই 'দেবদূত' ছদ্মনামে লিখি।

শ্যামল বিস্মিত হয়, আপনিই দেবদূত ?

প্রভাতের উত্তর দেবার আগেই কেষ্ট এসে পড়ে, এই যে শ্যামল, ক'দিনই তোর সঙ্গে দেখা হচ্ছে না, কি খবর ?

প্রভাত বলে, তোরা গিয়ে ওদিকটায় বোস কেষ্ট, আমি ততক্ষণ আরও দু'চ্যাপ্টার লিখে নিই।

শ্যামল উঠে এসে কেষ্টর পাশে বসে পড়ে, কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, চেহারায় বেশ চটক এসেছে দেখছি, ভালো মানুষ ভাবটা কেটে গেছে, ভাল।

শ্যামল আগের মত লজ্জা না পেয়ে বলে, আজ আমি আপনাকে খাওয়াব কেষ্টদা।

—খুব বড়লোক হয়েছিস বুঝি ?

—এই ক'দিনে প্রায় দশ টাকা পেয়েছি।

—বাঃ বাঃ, বাহাদুর তো !

শ্যামল উৎসাহিত হয়, প্রথম দিন যে লাল বাড়িতে গিয়াছিলাম, সেখান থেকে পুরোন বই নিয়ে এসেছি। বিক্রি করে চার কি সাড়ে চার টাকা পাব।

—বাড়িতে কেউ কিছু জানতে পেরেছে ?

—না।

কেষ্ট ব্যাগ থেকে একটা চাঁদার খাতা বার করে শ্যামলের দিকে এগিয়ে দেয়।

—সরস্বতী পুজো আসছে, খাতা নিয়ে চাঁদা তুলে বেড়াবার চেষ্টা করলে দিনে চার পাঁচ টাকা ঠিক উঠবে। দুপুরের দিকে যাবি, যে সময় মেয়েরা থাকে।

শ্যামল ঘাড় নেড়ে কেষ্টর হাত থেকে খাতা নেয়, এ যে অনাথবান্ধব সমিতির চাঁদার খাতা।

—তাই তো দিলাম, এদের পুজো খুব নামকরা. চাঁদা চাইবার অসুবিধে হবে না। কিন্তু সাবধান! ওদেরই দলের কারো কাছে গিয়ে হাজির হোস না।

শ্যামল হেসে উত্তর দেয়, সে আমি ম্যানেজ করে নেব।

আজ কেষ্টর ঘুম ভেঙে যায় অন্য দিনের চাইতে অনেক আগে।

রাস্তায় ধরানো উনুনের ধোঁয়ায় ঘর ভরে গেছে। বিরক্ত হয়ে কেষ্ট নীচে নেমে এসে কলতলায় মুখ ধুয়ে নেয়, ডাকে, শ্যামা চা দিয়ে যা। কেষ্টকে এত আগে উঠতে দেখে বিস্মিতা শ্যামা জিজ্ঞেস করে, এত সকালে উঠে পড়েছ, কোথাও যাবে বুঝি?

কেষ্ট তাকে ভেঙিয়ে বলে, কোথাও যাবে বুঝি? ঘরময় যে ধোঁয়া, সকাল বেলা জানলাগুলো বন্ধ করে দেওয়ারও সময় হয় না?

—ও মা, তাইতো! আমি এক্কেবারে ভুলে গেছি কাকু, ছি ছি!

কেষ্ট থামিয়ে দিয়ে বলে, যা, চট করে এক কাপ চা নিয়ে আয়, আমায় বেরুতে হবে।

কেষ্ট ওপরে উঠে গিয়ে জামা-কাপড় পরে। জুতো-জোড়া বড় ময়লা হয়েছিল, বসে পালিশ করে নেয়। একটু পরে শ্যামা চা নিয়ে আসে, সঙ্গে গরম তেলেভাজা। কেষ্ট খেতে খেতে বলে, বাঃ, বেশ গরম তো, নে দুটো খেয়ে দ্যাখ।

কথামত শ্যামা একটা বেগুনি নিয়ে মুখে দেয়, উঃ, ভীষণ গরম!

শ্যামা মুখ থেকে বার করে, উঃ-আঃ করতে থাকে। কেষ্ট হেসে ফেলে।

হঠাৎ শ্যামা জিজ্ঞেস করে, কাকু, তুমি বিয়ে করবে না?

কেষ্ট বিস্মিত হয়, এ ধরনের প্রশ্ন সে আগে শ্যামার কাছে শোনেনি, জিজ্ঞেস করে, বিয়ে কেন?

—বাঃ, সবাই তো বিয়ে করে।

কেষ্ট হাসে, এ নিয়ে কথা হচ্ছিল বুঝি?

—হ্যাঁ, কালকে।

—কে বলছিল?

—বিভূতিবাবুরা এসেছিলেন যে—

—কোন্ বিভূতিবাবু, ঐ হলদে বাড়ির ভাড়াটেরা?

—হ্যাঁ, শীলাদি'র সঙ্গে তোমার বিয়ের জন্যে।

—কি কথা হ'ল?

—বাবা বললেন তোমার সঙ্গে কথা বলতে।

কেষ্ট সিগারেট ধরায়, যাক, তোর বাবার তাহলে এতদিনে বুদ্ধি হয়েছে।

ব্যাগ হাতে নিয়ে কেষ্ট সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়, শ্যামা চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে, কাকু, তোমার একটা চিঠি এসেছিল, পেয়েছ?

—কই না!

—আমি যে তোমার কোটের পকেটে রেখেছিলাম।

—দিয়ে যা।

শ্যামা ছুটে গিয়ে কেষ্টর হাতে চিঠি দিয়ে আসে। চিঠিটা খুলতে খুলতে কেষ্ট রাস্তায় বেরয়, গৌরীর চিঠি।

"শ্রীচরণেষু,

আপনি সেদিন আমার অনেক উপকার করিযাছেন। আমার ভাই একটু ভাল আছে। আরও পাঁচ টাকার ওষুধ কিনিতে হইবে, আপনি যদি দয়া করিয়া ঐ কয়টি টাকা দেন তো বড় উপকার হয়। আমি সকাল নয়টা হইতে প্রায় দু'তিন ঘণ্টা ধর্মতলার মোড়ে থাকি। দয়া করিয়া একবার আসিবেন। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। ইতি

প্রণতা গৌরী।"

চিঠি পড়ে কেষ্ট পকেট থেকে টাকা বার করে দেখে কত আছে।

কেষ্ট যখন এসপ্লানেডে এসে জীপ থামালো তখন প্রায় এগারোটা বাজে। অফিস যাবার ভিড় চলে গেছে তবু গাড়ী চলার বিরাম নেই। কেষ্ট গাড়ী পার্ক করে চারদিকে তাকায়, কিন্তু গৌরীকে দেখতে পায় না। অন্যমনস্ক হয়ে দেখছিল বইএর স্টলে কত লোকের ভিড় হয়েছে, রিফিউজিদের দোকানে জিনিস বিক্রি হচ্ছে। কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল ছিল না। গৌরীর ডাকে চমক ভাঙ্গে।

—আপনি অনেকক্ষণ এসেছেন ?

—না, বেশিক্ষণ না। ভাই কেমন আছে ?

—আগের চেয়ে একটু ভাল, ওষুধে কাজ দিয়েছে, কিন্তু রোগীর পথ্যি দিতে পারছি কই !

—ডাক্তার কি খেতে বলেছে ?

—সব দামী দামী খাবার, ফল, দুধ, ছানা।

কেষ্ট কি বলবে ভেবে পায় না।

—এখুনি আসছি, বলে গৌরী হঠাৎ এগিয়ে যায় রাস্তার মধ্যে। কেষ্ট দেখে পুলিসের হাত দেখানোর জন্যে অনেকগুলো গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছে। গৌরী সেখানে গিয়ে ভিক্ষে চায়। কেষ্ট সেই দিকেই তাকিয়ে থাকে। ময়লা গাড়ী, তেলের অভাবে চুলে জট পড়েছে, কি বলছে শোনা যায় না, চোখে করুণ প্রার্থনা। ব্যগ্র হাতে গাড়ীর দরজা আঁকড়ে ধরছে, ড্রাইভারের ধমকে আবার হাতটা সরিয়ে নেয়। হয়ত কোন গাড়ীর কাছে কিছু পাবার আশায় আগ্রহ ভরে ছুটে যায়, পয়সা পেলে দাতার উদ্দেশে শুভ কামনা জানায়, না পেলে নিরাশ হয়।

পুলিসের বাঁশিতে গাড়ীগুলো আবার চলতে আরম্ভ করে, গৌরী কেষ্টর কাছে ফিরে আসে।

—কত পেলে ?

গৌরী ক্লান্ত স্বরে বলে, ছ' আনা। একটু থেমে বলে, একটা টাকাও পুরো হল না। কেউ যে শুনতে চায় না।

কেষ্ট ম্লান হাসে, শুনলেও এরা দেয় না।

—সব কথা শুনলে দেয়। কেন আপনি তো দিয়েছেন।

কেষ্ট সে-কথার উত্তর না দিয়ে পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে এগিয়ে দেয়,—এই নাও, তোমার ভাইকে ভাল পথ্যি দিও।

টাকা নিতে গিয়ে গৌরীর চোখে জল আসে, বলে, আপনি দেবতা।

কেষ্ট শব্দ করে হেসে ওঠে, দেবতাই বটে, ওই যে আবার গাড়ী থেমেছে, দেখ যদি আর কোন দেবতা পাও।

গৌরীর উত্তরের অপেক্ষা না করেই কেষ্ট গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যায়।

কেষ্ট বরাবরই গাড়ী জোরে চালায়, আজও ভিড়ের মধ্যে দিয়ে হর্ন বাজিয়ে বেশ জোরেই গাড়ী চালাচ্ছিল কিন্তু মন তার গাড়ীর দিকে ছিল না। ভাবছিল গৌরীর কথা। কতখানি সরল, মানুষের ওপর কি গভীর বিশ্বাস, আর ভুলতে পারছিল না একটা কথা, 'আপনি দেবতা'।

এক জায়গায় ভিড় দেখে গাড়ী থামাতে বাধ্য হল। সকলে ধর ধর করে চেঁচাচ্ছে। কেষ্টর আসার মিনিটখানেক আগে কোন ফোর্ড গাড়ী পাড়ার একটি দশ বার বছরের ছেলেকে চাপা দিয়ে চলে গেছে। কেষ্টকে তারা অনুরোধ করে, আপনার গাড়ী করে ছেলেটাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে দিন।

কেষ্ট বলে, ওকে বরং ট্যাক্সি করে নিয়ে যান, আমি ততক্ষণ ফোর্ড গাড়ীটা ধরতে পারি কি না দেখি।

কেষ্ট জোরে গাড়ী চালিয়ে দেয়, শুনতে পায় পিছু থেকে বলছে সবাই, নীল রং, বড় ফোর্ড, মেয়ে চালাচ্ছে।

রাস্তা বেশ চওড়া, জোরে চালাবার অসুবিধে হয় না। কিছুক্ষণের মধ্যেই দূরে ফোর্ড গাড়ীটা দেখা যায়। কেষ্ট অ্যাক্সিলেটারে আরও চাপ দেয়। ফোর্ড গাড়ীটাও বেশ জোরে চলেছে। অনেক বেঁকে ঘুরে, প্রায় বালীগঞ্জের কাছে এসে গাড়ীটা বড় দোতলা বাড়ির মধ্যে ঢুকে যায়। কেষ্ট তার পেছনে গাড়ী থামিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ে। গাড়ীর সামনের সিটে চালকের পাশে একটি মেয়ে বসেছিল, ভয়ে তার মুখ সাদা হয়ে গেছে। পিছনে দু'তিনটি ছোট ছেলে-মেয়ে আর এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। কেষ্ট কাছে এসে কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করে, আপনারা কি মানুষ, একটা ছেলেকে চাপা দিয়ে পালিয়ে এলেন?

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি গাড়ী থেকে নেমে ভয়ে ভয়ে উত্তর দেন, ঠিক পালিয়ে আসিনি।

—নয়ত কি, শরীরে এতটুকু দয়ামায়া নেই?

ভদ্রলোক আমতা-আমতা করেন, নতুন ড্রাইভার, বুঝলেন কি না—

কেষ্ট রেগে বলে, ড্রাইভার তো গাড়ী চালাচ্ছিল না, ওর ওপর দোষ দিচ্ছেন কেন? গাড়ী তো উনি চালাচ্ছিলেন।

কেষ্ট ইঙ্গিতে মেয়েটিকে দেখিয়ে দেয়।

মেয়েটি এবার কথা বলে, যে ছেলেটি চাপা পড়েছে সে কে?

—আমার শালা।

—খুব বেশি লেগেছে?

—মরল কি বাঁচল, তা দেখবার আপনাদের সময় কোথায়?

—মিথ্যে এ কথা বলছেন, আমরা তো দাঁড়াতে চেয়েছিলাম, সবাই ক্ষেপে মারতে এল দেখেই তো—

—ক্ষেপবে না, বিধবার সবে ধন নীলমণি ছেলে। যাক্ গে, হাস-পাতালে নিয়ে গেছে, এখন দেখা যাক্।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক তাকে থামিয়ে কথা বলেন, ছেলেটির চিকিৎসার

জন্যে যত টাকা লাগে, আমরা দেবো। এ নিয়ে আর থানা-পুলিস করবেন না। এত বড় বাড়ির বৌ, বুঝলেন কি না—

কেষ্ট শান্ত গলায় বলে, সে তো বুঝতেই পারছি। দেখি, আমার শাশুড়ীকে যদি রাজী করাতে পারি। এখন আমায় টাকা-পঞ্চাশ দিন, আবার হাসপাতালেই যাই, কখন কি লাগে বলা তো যায় না।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। মেয়েটির কাছ থেকে টাকা নিয়ে ভদ্রলোক কেষ্টর হাতে গুঁজে দেন। বুঝতেই পারছি আপনার মনের অবস্থা, কিন্তু বিশ্বাস করুন, ছেলেটি অমন করে ছুটে এসে না পড়লে গাড়ীতে ধাক্কা লাগতো না।

কেষ্ট টাকাটা পকেটে রাখতে রাখতে বলে, যদি বেঁচে যায় আপনার চিকিৎসার টাকাটা দিলেই হবে, কিন্তু মরে গেলে জানি না আমার শাশুড়ী আপনাদের ছেড়ে দেবেন কি না।

আর কোন কথা না বলে কেষ্ট গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে আসে। চিন্তিত মুখে ভদ্রলোক সবাইকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে যান। ফটকে দারোয়ান বসেছিল, তার সামনে গাড়ী থামিয়ে কেষ্ট এক টাকা বখ্শিস দেয়, দারোয়ান সেলাম করে।

—ঐ বুড়ো বাবু কে?

—বাড়ির মালিক।

—ঐ মেয়েটি?

—মাইজী।

—অত ছোট?

—নয়া মাইজী।

—ও, দ্বিতীয় পক্ষ? কেষ্ট বাঁকা হাসে।

ফেরবার পথে কেষ্ট আবার ঘটনাস্থলে আসে। খবর নিয়ে জানতে পারে, ঐ ছেলেটি মোড়ের মিষ্টিওয়ালার দোকানে কাজ করে।

—ধরতে পারলেন নাকি ?

কেষ্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কই, পেছু পেছু কত দূর দৌড়লাম, কোথায় যে বেঁকে গেল !

পাড়ার ছেলেরা উত্তেজিত হয়ে বলে, ধরতে পারলে গাড়ীর দফা রফা করতাম।

কেষ্ট সায় দেয়, আমিও কি ছাড়তাম নাকি ? পরে মিষ্টিওয়ালাকে বলে, আমি এসে খবর নিয়ে যাব, ছেলেটি কেমন থাকে।

নতুন বাংলা মাস পড়ে গেছে, এরই মধ্যে পত্রিকা বার হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু প্রেসের গোলমালে হয়ে ওঠেনি। তাই সকাল থেকেই প্রভাত সম্পাদকের সঙ্গে উঠে-পড়ে লেগেছে, পত্রিকা কাগজে মুড়ে তার ওপর নাম-ঠিকানা লিখছে। গ্রাহকদের সংখ্যা বেশি না হলেও, সময় মত বই না পেলে চাঁদা দেওয়া বন্ধ করে। সম্পাদক বলে, গ্রাহক তো সব, খাদক। পত্রিকার দেরি হলেই শালাদের মেজাজ গরম। কড়া কড়া চিঠি পাঠাবে।

প্রভাত কাজ করতে করতে উত্তর দেয়, পয়সা দিয়েছে, করবে না ? আমরা যখন টাকা দিয়ে লেখা নিই, তখন কি আর ছেড়ে কথা কই ? লেখককে বেঁধে ফেলে গল্প লেখাই না ?

—এবারের গেট আপ কেমন লাগছে ?

—ওপরের ছবিটা তেমন জোর হয়নি।

সম্পাদক মুখ বাঁকায়, হতভাগা জীবনটার জন্যে। কেউ তার ছবি ছাপিয়েছে কখনও ? আমি তার নাম করিয়ে দিলাম আর শালা এখন আমার কাছেই টাকা চায়।

প্রভাত বিস্মিত হয়, বল কি, জীবনও টাকা চায় ?

—নয় তো আমি কুমারেশের ছবি নিই ! ও ত বক্স ক্যামেরায় ছবি তোলে।

—যাকগে, পত্রিকার মুখ এঁটে দেওয়া হয়েছে, স্টলে দাঁড়িয়ে বাবুদের আর পাতা ওল্টাবার উপায় নেই। ও ঠিক কেটে যাবে।

এ-হেন নামকরা পত্রিকার আফিস। উত্তর কলকাতার অনেক গলি ঘুঁজির মধ্যে একটি ছোট কামরায়, যার সন্ধান শুধু ডাকযোগেই পাওয়া সম্ভব। ঘরে আসবাবের মধ্যে একটা কালিপড়া কাঠের টেবিল, আর দু'খানা নড়বড়ে চেয়ার। তাই সম্পাদক আর সহ-সম্পাদক মাটিতে মাদুর বিছিয়ে কাজে ব্যস্ত।

প্রভাত আড়মোড়া ভেঙ্গে বলে, এবারের গল্পটা তেমন সুবিধের হয় নি।

—শুরুটা ভালই ছিল, শেষের দিকটা ঘুলিয়ে গেছে।

—কি করব, একেবারে সময় পাই না। চিঠি পত্তরের জবাব দেব, প্রবন্ধ লিখব, তারপর অনুবাদ করব। এদিকে গল্প উপন্যাস সব খিচুড়ী পাকিয়ে যায়।

সম্পাদক উৎসাহ দেয়, তুমি তো সব্যসাচী হে, তুমি ছাড়া কি এ কাগজ চলতো?

কাজ শেষ হতে প্রায় বারোটা বেজে গেল, প্রভাত কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে আসছিল, সম্পাদক বলে, বেলারাণীর সঙ্গে ইণ্টার-ভিউটা ভুলে যেও না।

—সে তো সোমবার দিন।

—একটা ভাল ছবি ওঁকে দিয়ে সই করিয়ে নিও, আমাদের জন্যে বিশেষ ভাবে তোলা লিখে দিতে হবে।

প্রভাত সায় দিয়ে বলে, সে সব আমি ঠিক করে নেব। প্রশ্ন উত্তরও আমার সব লেখা হয়ে গেছে, ওঁকে একবার শোনাতে হবে। একটু থেমে বলে, বালীগঞ্জে বাড়ি, ট্যাক্সি করে যাব, ভাড়াটা দিয়ে দিও।

—বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে ট্যাক্সি চেপো, এখান থেকে নয়।

—সে আর বলে দিতে হবে না।

হাসতে হাসতে প্রভাত বেরিয়ে আসে।

রাঘব বোয়ালের বড় গাড়ী এসে দাঁড়াল অনন্ত-কেবিনের দরজায়। আশু বাবু হন্তদন্ত হয়ে নেমে এলেন, কাউকে খুঁজছেন স্যার?

রাঘব বোয়ালের ছেলে পিছনের সিট থেকে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, কেষ্টবাবু কোথায় জানেন?

—দিন-দুই এ-দিকে আসেনি।

—তাকেই যে দরকার—

আশু বাবু টাকে হাত বোলান, এলে বরং পাঠিয়ে দেবো।

—আপনাকে বলে যাচ্ছি, ছেলেরা যারা আসবে সব আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন, বাবা সকলের সঙ্গে কথা বলতে চান।

—নিশ্চয়, এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আশুবাবু মুখ বাড়িয়ে হাঁক দেন, ভোঁদা, নরেশ, যা শীগগিরি যা, বাঁড়ুজ্জে মশাই ডেকে পাঠিয়েছেন।

রাঘব বোয়ালের ছেলে চলে যায়। আশুবাবু দোকানে উঠে এসে বিড়-বিড় করেন, কেষ্টকে নিয়ে এই জ্বালা, মাথার যদি এতটুকু ঠিক থাকে।

ভোঁদা বলে, এ আর নতুন কি, তবু তো কেষ্টদা এবার একটু বেশি মন দিয়েছে।

—তোমরা আর দেরি করো না বাপু, যাও।

—আর তো সাত দিন, রাঘব বোয়ালের পয়সায় ক'দিন নবাবী করে নিই। তার পর আর কে পুঁছছে, আপনিই কি আর দোকানে ঢুকতে দেবেন?

আশুদা সে-কথায় কান দেন না। কোণের টেবিলে শ্যামল বসে ছিল, সে দিকে এগিয়ে যান। তোমার কেষ্টদা'র কোন খবর জান নাকি, শ্যামল?

—না ক'দিনই ধরতে পারছি না, তাই তো এখানে বসে আছি।

—কিছু খাবে নাকি?

—খেয়েছি। একটু থেমে বলে, আশুদা, আপনাকে কিন্তু চাঁদা দিতে হবে।

—কিসের চাঁদা?

—সরস্বতী পুজোর।

—ওরে বাবা! তোমাকে নিয়ে এ পর্যন্ত কুড়ি জন হ'ল। মা সরস্বতী আমায় ইস্কুল থেকে ঝাঁটা মেরে তাড়িয়েছিলেন, তবু তাঁর পুজোর সময় চাঁদা দিতে হবে, কি আব্দার দেখ!

—সে আমি শুনব না আশুদা, আপনার নামে এক টাকার রসিদ কেটে রেখেছি, এই দেখুন—বলে সত্যিই রসিদ বার করে আশুদা'র হাতে দেয়।

—তবে আর চাইছ কেন? এক টাকার খেয়ে দাম দিও না। তাহলেই আমার চাঁদা দেওয়া হয়ে যাবে, কি বল?

—তাতে আমি রাজী আছি। নিতাই, পাঁউরুটি আর ডিম দিয়ে যা।

ঘর প্রায় ফাঁকা ছিল, তাই আশুদা বসে বসে শ্যামলের সঙ্গে গল্প করেন। বিশেষ করে নিজের জীবনের কথা, কত কষ্ট করে দোকান করেছেন, কত রকমের কাজ করেছেন, তারই বিবরণ। কথা হয়তো অনেকক্ষণ চলতো, যদি না কেষ্ট এসে পড়ে হাঁক দিত।

—কি খবর আশুদা, দু'দিন আপনার পাত্তা পাই নি যে?

—তাই বটে, চোর এসে বুড়ীকে বলছে, তুমি তো আমায় ছুঁতে পারলে না!

—কেন, কি হল?

—কি আবার হোল, রাঘব বোয়াল যে লোক পাঠিয়ে পাগল করে মারছে।

কেষ্ট বিরক্ত হয়, ওঃ জ্বালাতন করে মারলে, রাঘব বোয়াল আর রাঘব বোয়াল। আমায় যেন মাইনে দিয়ে চাকর রেখেছে। সব সময় হাজিরা দিতে হবে, যত সব—

—আহা, মাথা গরম করছ কেন ?

শ্যামল এতক্ষণে কথা বলে, কেষ্টদা, আপনার সঙ্গে যে দেখাই হচ্ছে না !

—কি করবো বল, কত দিক সামলাবো ?

—আমায় চাঁদা দিতে হবে কেষ্টদা—

—চাঁদা, কিসের ?

আশুদা টিপ্পুনী কাটেন, সরস্বতী-পুজোর, বিদ্যের দৌড় তো তোমার আমারই মত, কিন্তু চাঁদা দিতে হবে।

শ্যামল আবদারের সুরে বলে, বাঃ সবাই চাঁদা না দিলে ভাল করে পুজো হবে কি করে ?

কেষ্টর বেশ মজা লাগে, জিজ্ঞেস করে, কাদের পুজো ?

—অনাথ-বান্ধব সমিতির। এই দেখুন আশুদা, প্রভাতদা, সবাই-এর কাছে চাঁদা নিয়েছি, আপনাকে এক টাকা দিতেই হবে।

কেষ্ট পকেট থেকে এক টাকা বার করে ওর হাতে দেয়, ঐ নে, থাক থাক, রসিদ পরে দিয়ে দিস আমি চলি—

শ্যামল বাধা দেয়, না কেষ্টদা, আমাদের সমিতিতে সে হবার জো নেই। টাকা নিলেই রসিদ দিতে হয়।

—তবে দাও।

শ্যামল খস-খস করে রসিদ লিখে দেয়। কেষ্ট একদৃষ্টে সেই দিকে তাকিয়ে থাকে, চোখ দুটো জ্বল-জ্বল করে ওঠে।

কেষ্ট চলে যাবার পর শ্যামল অনন্ত-কেবিন থেকে বেরিয়ে সোজা

পার্কে এসে হাজির হল। ওদের বিদ্যাভবনের কাছেই এই পার্ক, দু'মিনিটের রাস্তা। স্কুলপালানো ছেলেদের ছোটখাট আড্ডা এখানে রোজই বসে। আজ অবশ্য এখনও কেউ আসেনি। বারটা বেজে গেছে, ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ। পার্কের এক কোণে ঘরের বাইরে গাছ-তলায় খাটিয়া পেতে মালী শুয়ে আছে। অন্য দিকে সাধারণের বিশ্রামের জন্য যে শানবাঁধানো, মাথা ঢাকা, ছোট ঘরটি রয়েছে, সেখানে দু'জন ফিরিওয়ালা পাশে মাল রেখে ঝিমুচ্ছে। শ্যামল রোজকার মত পুবদিকের পেয়ারা গাছটার তলায় গিয়ে বসে। খুব আস্তে হাওয়া বইছে, ছায়ায় বসলে বেশ আরাম লাগে। শ্যামল চিৎ হয়ে শুয়ে দেখছিল গাছের উঁচু ডালে ছোট ছোট পেয়ারা হয়েছে, দু-তিনটে পাখী কিচমিচ করে ঝগড়া লাগিয়েছে।

—এই বাঁদর, ঘুমুচ্ছিস ? রেলিং টপকে মদন পার্কের ভেতর এসে শ্যামলকে ঠেলা দেয়।

শ্যামল ঠিক ঘুময়নি, তন্দ্রার ভাব এসেছিল, উঠে বসে বলে, দূর গাধা বেশ আরাম লাগছিল, তুই নষ্ট করে দিলি।

—দিব্যি মৌজ করে শুয়ে আছিস, তোর আর কি ? আমাদের শালা এক মিনিটের ফাঁক নেই। একবার বাইরে যেতে চাইলে মাষ্টাররা কটমট করে তাকায়। তেমনি সব ভালো মানুষ ছেলে জুটেছে, বলে কি রে সিগারেট খেতে যাবি ?

শ্যামল হাসে, বেশ হয়েছে, তুই তো আর ক্লাস রোজ ফাঁকি দিতে পারবি না, যা রাগী দাদা, বেত মারবে।

মদন মুখটা গম্ভীর করে বলে, সেই তো জ্বালা। একটা সিগারেট দে, এখুনি ক্লাসে ফিরতে হবে।

শ্যামল সিগারেট বার করে মদনের হাতে দেয়, নিজেও ধরায়।

—এ সময় এলি যে, টিফিনের তো দেরি আছে।

—এক পিরিয়াড আগেই ছেলেদের উঠোনে জড় করেছে, হেড মাষ্টার কি বক্তৃতা দেবে। আমি সেই সুযোগে এই দুটো নিয়ে পালিয়ে এলাম।

মদন পকেট থেকে দুটো 'ইন্সট্রুমেণ্ট বক্স' বার ক'রে শ্যামলের সামনে রাখে।

—একেবারে নতুন যে—

—নিলে কেউ পুরোন নেয়?

—কার?

—কে জানে, আমাদেরই ক্লাসের।

শ্যামল বাক্স দুটো নেড়ে-চেড়ে বলে, আজই ঝেড়ে দেবো।

—দু'-একটা দোকানে যাচিয়ে নিস্—।

—তুই আর আমায় শেখাস না।

মদন একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, তোর কেষ্টদার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিবি না?

—দেবো তো বলেছি। কেষ্টদা এখন খুব ব্যস্ত, রোববার ভোট হয়ে যাক, তার পর একদিন—

সিগারেট শেষ হয়ে আসে, মদন জোর টান দেয়, পালাই, দেরি হলে ধরা পড়ে যাব।

—তাহলে কখন দেখা হবে?

মদন কি যেন ভেবে নেয়, একটা ছবি দেখবি?

—কোথায়?

—বীথিকায়, 'চিচিং ফাঁক' খুব ভাল হয়েছে।

—আলিবাবার গল্প?

—না, না, এ শুধু খিস্তি ভরা।

—কে আছে?

—বেলারাণী।

—মাইরী! আমি তাহলে গেটের কাছে থাকব। ছ'টায় সময়।

—ঠিক আছে। সম্মতি জানিয়ে মদন আবার রেলিঙ টপকে পার্কের বাইরে চলে যায়।

এ'কদিন কেষ্ট একেবারেই ফুরসুৎ পায়নি। সামনের রবিবার ভোট দেবার দিন, এরই মধ্যে সব কিছু ব্যবস্থা তাকে করতে হয়েছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চতুর্দিকে লোক পাঠিয়েছে, প্রত্যেক সেণ্টারের কাছে নিজেদের অফিস খোলার ব্যবস্থা করেছে, রাঘব বোয়ালকে বলে তার বন্ধুদের কাছ থেকে অনেকগুলো গাড়ী আনিয়েছে, প্রয়োজন মত খুঁজে খুঁজে ছেলে যোগাড় করে এনেছে, যারা বিভিন্ন সেণ্টারের ভার নিয়ে সেই দিন কাজ চালাতে পারবে। এর মধ্যে কথা কাটাকাটি, ঝগড়া হয়েছে অনেকের সঙ্গে। বিশেষ করে পুলিন, সে তো বলেই গেল, চললাম আমি হনুমান মার্কাদের দলে। দেখব কোন শালা রাঘব বোয়ালকে জেতায়।

কেষ্ট চেঁচিয়ে উত্তর দিয়েছিল, কাজ করবার জন্যে সবাইকে এখানে আনানো হয়েছে। গুলতানী করবার জন্যে নয়।

পুলিন কেষ্টকে ভয় করে। তাই মুখের ওপর জবাব না দিয়ে বেড়িয়ে এসে অন্যদের কাছে বলেছিল, কেষ্টদার ফুটানী দেখলি? রাঘব বোয়ালের পয়সায় নবাবী করছে আর আমরা দুটো পয়সা চাইলেই খিঁচিয়ে ওঠে। চেনে না আমায়, পুলিন মণ্ডল যে সে ছোকরা নয়, এর শোধ আমি ঠিক তুলব।

এ নিয়ে দলের মধ্যে অনেক কথা উঠেছিল। এমন কি, রাঘব বোয়াল বলেছিলেন, কেষ্ট, এ সময় ঝগড়াঝাটি করা ভাল নয়, পুলিনকে ফিরিয়ে আন, নয় ত বল আমি নিজেই ডেকে আনছি।

কেষ্ট এতে সায় দেয়নি, কোন দরকার নেই ওকে ডাকবার। ও সব ছেলেকে শায়েস্তা করতে আমি জানি।

আজ সেই বহু-আকাঙ্খিত রবিবার। ভোর থেকে উঠে কেষ্টর দল কাজ শুরু করেছে। আগের দিনের নির্দেশ মত ছেলেরা এক এক সেণ্টারে জমা হয়। কেষ্ট জীপে করে ঘুরে বেড়ায়, কাজ ঠিক এগুচ্ছে কি না দেখে।

—তোমাদের এখানে পঁচিশ জন ছেলে এসেছে ?

এদের মোড়ল নিতাই উত্তর দেয়, দু'জন ছাড়া আর সবাই এসেছে। ভোটার-লিষ্টের 'ইনচার্জ' করেছি অতীনকে, ও দু'জনকে নিয়ে এখানে বসবে।

—ভোটারদের রিসিভ করবে কারা ?

—সত্যেন আর বিশু, ভোটার 'স্লিপ' ওরাই হাতে ধরিয়ে দেবে।

—গাড়ী বিশ্বাসী লোকের হাতে দিও, ভোটার আনতে গিয়ে না লেকে বেড়িয়ে আসে।

দরকারী কথার মধ্যেই সত্যেন এক কোণ থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে, কেষ্টদা, খাবার আসবে কখন, চা সিগারেটে তো আর পেট ভরবে না ?

—এরই মধ্যে ক্ষিদে পেয়ে গেল ? এখনও তো কোন কাজই করিস্ নি।

—টিফিনের আগেই কিন্তু খাবার আসা চাই, মাংস থাকবে তো ?

—তুই কি বিয়ে বাড়ি পেয়েছিস নাকি ? তবে লুচি আলুর দমের ভাল ব্যবস্থাই আছে।

ভোট দেবার জন্যে যারা মুখিয়ে ছিলেন, সেণ্টার খুলতে না খুলতে হুড়মুড় করে ভেতরে চলে যান। সে কিন্তু বেশিক্ষণের জন্যে নয়, আস্তে আস্তে ভিড় পাতলা হয়ে আসে।

কেষ্ট বলে—প্রথম চোটে শেখান-পড়ানো লোকেরা চলে গেছে। এখন আর নিজের গরজে কেউ আসবে না, সাধাসাধি করে আনতে হবে।

কেষ্টর কথাই ঠিক। বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোটদাতার সংখ্যাও বাড়তে থাকে। সব সেণ্টারেই প্রার্থীদের আফিসে ভোটদাতারা জমায়েৎ হয়ে চা, সিগারেট পান করেন। ভলেন্টিয়াররা খাতির করে বলে, মনে রাখবেন স্যার, অমুক মার্কা বাক্সে—

ভদ্রলোক হেঁ হেঁ করে হাসেন, তা না হলে এই রোদ্দুরে কষ্ট করে আসি? দেখি এক গ্লাস ঠাণ্ডা সরবৎ—

তিনটি গ্লাস এক সঙ্গে এগিয়ে আসে, সঙ্গে সঙ্গে পান, সিগারেট। ভদ্রলোক সব ক'টির সদ্ব্যবহার করে উঠে দাঁড়ান। তাঁকে অনুপ্রাণিত করবার জন্যে ভলেন্টিয়াররা সমবেত কণ্ঠে কানে তালা লাগিয়ে চিৎকার করে, ভোট ফর রঘু ব্যানার্জী—

ভদ্রলোক দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসেন, ডান হাত বাড়িয়ে নির্বিকার কণ্ঠে বলেন, ফেরার ভাড়াটা, দেড় টাকা।

—ভোট দিয়ে আসুন, আমাদের লোক গিয়ে ছেড়ে আসবে।

—ফিরে এলে তখন তো আর চিনতে পারবেন না। ভাড়াটা আগে থেকে নিয়ে নেওয়াই ভাল।

অগত্যা নগদ বিদায় করতে হয়। আরেক খিলি পান মুখে দিয়ে ভদ্রলোক ভোট দেবার জন্যে এগিয়ে যান।

বেশ কয়েকটি সেণ্টারে হনুমান মার্কাদের সঙ্গে ঝগড়া লেগে গেল রাঘব বোয়ালের দলের। জনৈক ভোটদাতা রাঘব বোয়ালের আফিস থেকে চা সিগারেট খেয়ে আবার বুঝি হনুমান মার্কাদের ক্যাম্পে লুচি সন্দেশ উড়িয়েছে। ব্যস্, আর যায় কোথা, তাকে কেন্দ্র করেই গোলমালের সূত্রপাত। ফলে অনেক নিরীহ ভোটদাতার জামা ছিঁড়ল,

মেয়েদের মধ্যে অনেকে ভোট না দিয়ে বাড়ি চলে গেল, দু'দলের অসম্মান জনক চিৎকারে পাড়ার লোক দরজা-জানলা বন্ধ করতে বাধ্য হল।

কেষ্টর হেড আফিসে খবর আসে, ওদের এক সেন্টার থেকে ভোটার লিষ্ট চুরি হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে কেষ্ট সেখানে ছুটে যায়।

—কি করে চুরি হ'ল ?

বিশু বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে, আমরা কি করে জানব কেষ্টদা, খানিক আগে পুলিন এসেছিল—

কেষ্ট রাগে ফেটে পড়ে, পুলিন, ড্যাম্ রাস্কেল। তাকে কে ঢুকতে দিলে ?

—তার যে এ মতলব, কি করে বুঝব ? এসে বলল বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, এক গ্লাস জল খাওয়া। জিজ্ঞেস করলাম, কেন, হনুমান মার্কারা জল দিচ্ছেন না বুঝি ? জিভ কেটে বললে, ছি, ছি, কেষ্টদার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বলে ঐ হনুমানদের দলে যাব ?

—সরালে কি করে ?

—ট্যাক্সি থেকে ক'জন লোক নামলেন, আমি বেরিয়ে নামিয়ে আনতে গেছি, ইতিমধ্যে পুলিন কখন বোরিয়ে গেল। আমি ফিরে এসে আর ভোটার লিষ্ট খুঁজে পাই না।

কেষ্ট ঠোঁট কামড়ায়, তোমরা যেমনি গাধা, পুলিনটা তেমনি শয়তান !

সে সেণ্টারে রাঘব বোয়ালের দল ভোটারলিষ্টের অভাবে আর বিশেষ-কাজ করতে পারে না। রাঘব বোয়াল মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বলেন, তখনই বলেছিলাম কেষ্ট, পুলিনের সঙ্গে ঝগড়া করা উচিত হয়নি।

রাঘব বোয়ালের কথা যে কতখানি সত্যি তা আরও বেশি করে প্রমাণ হল এক 'মিল এরিয়ায়'। কেষ্ট সেখানে নিশ্চিন্ত হয়েছিল অন্তত শতকরা আশীটা ভোট রাঘব বোয়াল পাবেই। সেই জন্যেই সেদিকে

আজ কেষ্ট বিশেষ নজর দেয়নি। কিন্তু পরিদর্শনে এসে সে অবাক হয়ে গেল!

বিপিন বলল, সর্বনাশ হয়েছে কেষ্টদা।

—কি ব্যাপার?

—এখানে কেউ ভোটই দিতে পারছে না।

—মানে?

—কোথা থেকে একদল লোক এসে দাঁড়িয়ে গেছে! পালোয়ান চেহারা, ভিড় করে আছে। ভোট দিতে যাচ্ছেও না, কাউকে যেতেও দিচ্ছেনা।

—এ আবার কি রসিকতা, পুলিস কি করছে?

—পুলিস তো রয়েছে, ওরা বলছে, আমরা এদিককার লোক সবাই হনুমানজীকে ভোট দেবো, নেতার জন্যে অপেক্ষা করছি।

বিরক্ত হয়ে কেষ্ট সেণ্টারের দিকে এগিয়ে যায়, কথা মিথ্যে নয়। এক দল লম্বা চওড়া লোক গেটের সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের অশ্লীল মন্তব্যে ও অসভ্য ব্যবহারে কেউ ত্রিসীমানায় যাচ্ছে না।

এক সময় বিপিন চুপি-চুপি বলে, খবর পেলাম কেষ্টদা, এ-ও না কি পুলিনের কাজ।

কেষ্ট চোখ তুলে তাকায়।

—ও জানত এখানে আমরা সব চেয়ে বেশি ভোট পাব। তাই হনুমান মার্কাদের দলে গিয়ে এই কাণ্ডটা করিয়েছে।

এর পর আর কেষ্টকে দেখা যায় নি। শুধু সেই দিন নয়, তার পরদিনও। এর মধ্যে কত জন অনন্ত-কেবিনে এসে কেষ্টর খোঁজ করেছে, নির্বিকার আশুদা বলেছেন, তার খবর জানি না ভাই!

কিন্তু পুলিসের লোক এসে যখন তার সন্ধান করলে, তিনি চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি বলুন তো ?

—গুণ্ডামীর চার্জ।

—কোথায় ?

—পুলিন মণ্ডল নামে একটি ছেলে থাকে এই পাড়ায়, চেনেন বোধহয় ?

—চিনি বই কি।

—তাকে ইলেকশানের দিন রাত্রিবেলা কারা রাস্তায় মেরে হাত-পা ভেঙ্গে দিয়েছে।

—কি সর্বনাশ !

আশুদা যদিও বিস্ময় প্রকাশ করলেন, কিন্তু তাঁর মুখ দেখেই বোঝা গেল এ খবরটি তাঁর অজানা ছিল না।

যাঁদের সন্দেহ হয় বলে পুলিনবাবু নাম দিয়েছেন, কেষ্ট দাস তাঁদের মধ্যে এক জন। পুলিস ইন্সপেক্টর চলে যেতেই আশুবাবু দোকান থেকে বেরিয়ে কেষ্টর বাড়ির দিকে গেলেন।

যথাসময়ে ট্যাকসী থেকে নেমে প্রভাত দরজার বেল টিপতেই, বেলারাণীর চাকর বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি ছায়ামঞ্চ থেকে আসছেন ?

—হ্যাঁ।

—ভেতরে আসুন। দরজা বন্ধ করে প্রভাতকে ভেতরের বৈঠকখানায় বসিয়ে দেয়। এ ঘর প্রভাতের অপরিচিত নয়, আগেও বেলারাণীর সঙ্গে এইখানে এসে আলাপ করে গেছে। আসবাবপত্রের বাহুল্য না থাকলেও ঘরটি পরিষ্কার করে সাজান। প্রভাত কাগজপত্র বার করে নেড়েচেড়ে দেখে। জানে, বেলারাণীর নামতে যথারীতি আধঘণ্টা দেরি হবে। ইতিমধ্যে চাকরটি চা দিয়ে গেল।

অন্যদিনের চেয়ে আজ বেলারাণী একটু আগেই নামে। একমুখ হেসে হাত তুলে নমস্কার করে বলে, আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি, সেজন্যে মাপ করবেন।

প্রভাত উঠে দাঁড়িয়েছিল, বললে, না না, আজ আপনি মোটেই বেশি সময় নেন নি। তার ওপর আপনার ভৃত্যটি অতিথি সৎকারে বেশ পটু।

—সে আমার ভাগ্য।

কিছুক্ষণ টুকরো আলোচনার পর প্রভাত আসল কথা পাড়ে, আপনি আমাদের আগের সংখ্যা দুটো পেয়েছেন নিশ্চয় ?

—হ্যাঁ, পেয়েছি।

—বিশিষ্ট তারকারা প্রশ্নোত্তর দিয়েছেন, দেখেছেন বোধ হয় ?

—বেশ সুন্দর হয়েছে, ওঁরা কি নিজেরাই—

—পাগল হয়েছেন, সব আমার লেখা। এবার আপনার নামে প্রশ্নোত্তরগুলো যাবে।

—লিখে এনেছেন, দেখি ?

প্রভাত কয়েকটি কাগজ এগিয়ে দেয়, বেলারাণী ওপর ওপর চোখ বুলিয়ে বলে, প্রশ্নগুলি তো বেশ ইণ্টারেস্টিং, আপনার কাগজের পাঠকরা দেখছি—

প্রভাত হেসে বাধা দেয়, এ প্রশ্ন সবই আমার, পাঠকরা কি আর এত বুদ্ধিমান ?

—তার মানে, ওরা কি কোন প্রশ্নই করে না ?

—করে, তবে আমরা তার কোন উত্তর দিই না। উপরে লেখা থাকে দেখবেন, আমাদের কাছে এত চিঠি এসেছে যে, সব কটির উত্তর দেওয়া সম্ভব হল না।

—এতগুলো নাম-ঠিকানা দিয়েছেন—

—এ কি কম মেহনতের কাজ, এমন ঠিকানা দিতে হবে যাতে না কেউ পরে গোলমাল করে।

বেলারাণী হঠাৎ হেসে গড়িয়ে পড়ে, এটি বড় সুন্দর লিখেছেন, প্রশ্ন ...আপনি মাথায় কি তেল মাখেন? উত্তর...জবাকুসুম, মহাভৃঙ্গরাজ, ক্যাস্টর অয়েল মিশিয়ে তাতে তিন ফোঁটা ইভনিং ইন প্যারিস দিই।

—কোন পাঠিকা এটি পরীক্ষা করে দেখলে কি হবে জানি না!

বেলারাণী হেসে বলে, আমার যে বব্‌চুল তা কি তারা খবর রাখে না ভাবেন?

প্রভাত কথার মোড় ফেরায়, নীচের দিকে মিষ্টি খাওয়ার প্রশ্নটি দেখুন।

বেলারাণী পড়ে,...রসগোল্লা না সন্দেশ, কি খেতে ভালবাসেন? উত্তর...পরীক্ষায় খাতায় সন্দেশ, তবে কেউ পাঠালে রসগোল্লা পছন্দ করি। সত্যি কিন্তু প্রভাতবাবু, আমি রসগোল্লা খেতে ভালবাসি।

প্রশ্নোত্তর নিয়ে এ ধরনের হাসাহাসি চলে। প্রভাত একসময় জিজ্ঞেস করে, আপনার যে প্রডিউসার হবার কথা ছিল, কদ্দুর এগুলো?

—এখনও পাকাপাকি হয নি।

—হলে আমায় মনে রাখবেন কিন্তু।

—সে আর বলতে হবে না, বই তুললেই আপনাকে দিয়ে সিনেরিও লেখাবো। নতুন কিছু লিখেছেন নাকি?

—একটা বড় উপন্যাস।

—কি নাম?

—মধুবালা।

বেলারাণী কপট রাগের ভান করে বলে, মধুবালার জীবনী বেশি ইণ্টারেস্টিং হল বুঝি?

—কি মুস্কিল, জীবনী কেন হবে। নায়িকার নাম মধুবালা। বুঝছেন না, যাতে বই বিক্রি হয়।

—বেলারাণী নাম দিলে তো বই বিক্রি হত না!

প্রভাত অপ্রতিভ হবার ছেলে মোটেই নয়, বলে, আপনার কি শুধু নামটাই দেব, পুরো জীবনী দিয়ে বই লিখব।

—আমাকে খুশি করাব চেষ্টা করছেন বুঝি?

—বাঃ, ইংরাজীতে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জীবনের উপর কত সুন্দর সুন্দর বই আছে, আমাদের দেশেই বা তা হবে না কেন?

—পরে এক দিন আপনার সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করব।

—কবে বলুন?

—বললাম তো, এক দিন।

প্রভাত আর এ প্রসঙ্গের জের টানে না। বলে, এক কপি ছবি দিন এ মাসের কভারে দেব।

—সে আবাব কি, দুটো ছবি তো পোস্টে পাঠিয়েছি।

—পুরোন ছবি না, আপনার বিশেষ ভঙ্গিমায় তোলা।

প্রভাতেব দিকে আড়চোখে দেখে নিয়ে বেলারাণী হেসে বলে, আপনি ভারী দুষ্টু, শেষ পর্যন্ত না নিয়ে ছাড়বেন না দেখছি।

বেলারাণী উঠে গিয়ে দেরাজ থেকে ছবি বার করে প্রভাতের হাতে দেয়। ইংরাজী নায়িকার অনুকরণে লোলকটাক্ষভরা, শ্লথ ভঙ্গিমার ছবি।

প্রভাত তারিফ করে বলে, বাঃ, বেশ সুন্দর উঠেছে তো! কে তুলেছে?

—কেন, পিনাকী। ওই তো আমার সব ছবি তোলে।

প্রভাত উঠতে উঠতে বলে, না এবারের পত্রিকা পাঁচশো কপি বেশি ছাপাতে হবে দেখছি। নমস্কার-বিনিময়ের পর প্রভাত যখন বাইরে বেরিয়ে এল তখন প্রায় এগারোটা বেজে গেছে।

আশুবাবু কেষ্টদের বাড়ির দরজায় কড়া নাড়তে ভেতর থেকে চিৎকার করে তার দাদা জিজ্ঞেস করে, কে কড়া নাড়ে ?

—আমি আশু, অনন্ত-কেবিন থেকে আসছি।

—কা'কে চাই ?

—কেষ্ট বাড়ি আছে ?

—নেই।

একটু চুপ করে থেকে আশুবাবু বলেন, বিশেষ দরকার আছে, দরজাটা একবার খুলুন না।

কেষ্টর দাদা একপাটি দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে উত্তর দেয়, আমি সব জানি। পুলিসে হুলিয়া দিয়েছে, কোথায় কা'কে খুন করে এসেছে।

—আহা খুন করবে কেন, সব পুলিন মণ্ডলের বদমাইশি।

—আপনারাই কেষ্টর মাথাটা খেয়েছেন, একটা খুনেকে নিয়ে বাড়িতে বাস করা!

তার দিকটা এক বার ভাবুন, বেচারী বিপদে পড়েছে। এ সময় আমাদের সকলের উচিত—

—উচিত ঘণ্টা, ও সব বাঁদরের জেলে যাওয়াই ভাল। আমি পুলিসের লোকদের সাফ সাফ বলে দিয়েছি, দু'দিন ওর পাত্তা নেই—

আশুবাবু বিড়-বিড় করে বলেন, জানি না ভাল করলেন কি না—

—ভাল-মন্দ আমাকে শেখাতে হবে না। ব'লে কেষ্টর দাদা দড়াম করে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়।

আশুবাবু ফিরে আসছিলেন, মোড়ের মাথায় কেষ্টর সঙ্গে দেখা। দিব্যি টেরী কেটে হাসতে হাসতে তার দিকেই এগিয়ে আসে, কি আশুদা, এদিকে হঠাৎ ?

—তোমার বাড়িতে গিয়েছিলাম।

—দাদা খুব ক্ষেপে আছে নিশ্চয় ?

—ক্ষেপে মানে, পারলে আমাকেই বোধ হয় জেলে পাঠিয়ে দিতেন।

কেষ্ট তাচ্ছিল্যভরে বলে, ও একটা পাগল! আপনার দোকানে যাওয়া যাক, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে, চলতে চলতে আশুদা বলেন, থানা থেকে লোক এসেছিল।

—জানি।

—কি হবে ?

—কি আবার হবে ? একদিন ধরে নিয়ে যাবে, আপনারা গিয়ে জামিনে খালাস করে আনবেন।

—তার পর ?

—কিছুই নয়, প্রমাণ অভাবে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে।

—কিন্তু পুলিন ?

—ও আর কারো সঙ্গে শয়তানী করতে পারবে না, জন্মের মত শিক্ষা হয়ে গেল।

দোকানের কাছে এসে কেষ্ট মত বদলায়, চলুন অন্য কোথাও যাই।

—কেন ?

—আপনার দোকানে অনেক লোক, সবাই-এর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে আর ভাল লাগছে না।

কেষ্ট আশুবাবুকে নিয়ে অন্য রাস্তা ধরে। বড় রাস্তা পেরুতেই আশু-বাবু বললেন, অন্য কোন্ দোকানে যাবে! বরং আমার বাড়ি চল।

আশুবাবুর বাড়ি কাছেই, সেখানে পৌঁছতে দেরি হয় না। বাইরের বৈঠকখানায় কেষ্টকে বসিয়ে আশুবাবু ভিতরে চলে যান। কেষ্ট ডেকচেয়ারে বসে সিগারেট ধরায়, আপনা হতেই চোখ বুজে আসে।

আশুবাবু ফিরে এসে কেষ্টর দিকে ভাল করে তাকিয়ে বলেন, তোমায় বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। কাল কোথায় ছিলে?

—এক বন্ধুর বাড়ি।

—সারা দিন তোমায় দেখিনি।

—রুগীর সেবা করতে গিয়েছিলাম।

—কোথায়?

—টালীগঞ্জ।

—কার অসুখ?

—গৌরীর ভাই-এর।

—গৌরী কে?

—আপনি চেনেন না। একটু হেসে বলে, ছেলেটা বাঁচবে না।

—কি হয়েছে?

—বোধ হয় যক্ষ্মা।

—আহা! একটু পরে বলেন, খাবার আনতে বড় দেরি করছে, তুমি বস, আমি নিয়ে আসি।

কেষ্ট সতৃষ্ণ নয়নে বলে, আশুদা, গরম চা।

খাবার আনতে বেশি দেরি হয় না, চা করতে আর নিমকি ভাজতে যেটুকু সময় লাগে, আশুবাবু ফিরে এসে দেখেন কেষ্ট ঘুমিয়ে পড়েছে। জাগাতে মায়া হ'ল, ছেলেকে ফিস্ ফিস্ করে বলে গেলেন, আমি দোকানে যাচ্ছি, কেষ্ট উঠলে ভাল করে চা নিমকি খাইয়ে দিস্।

ঘুম থেকে উঠেই শ্যামল শোনে মামা চেঁচামেচি করছেন, তাঁর জামার পকেট থেকে পাঁচ টাকার নোট চুরি গেছে। শ্যামল চোখ রগড়াতে রগড়াতে সে-ঘরে ঢোকে, কি হয়েছে মামা?

জগৎবাবু ঝাঁঝের সঙ্গে বলেন, ভূতের রাজত্ব, কাল রাত্রে আমার

পকেটে পাঁচ টাকা ছিল, আজ একটা পয়সা নেই। পাখা গজিয়ে উড়ে গেল নাকি?

—এতো আশ্চর্য কথা মাসীমা, সব জায়গা দেখা হয়েছে?

মাসীমা বললেন, সব জায়গা তো খোঁজা হ'ল। ছোটদা কাল অন্য কোথাও ফেলে আসনি তো?

জগৎবাবু আরও রেগে যান, তোমাদের ওই এক কথা, কিছু হারালে আমিই নিশ্চয় কোথাও ফেলে এসেছি। কেন, আমার কি মাথার ঠিক থাকে না, মাতাল হয়ে—?

শ্যামল জগৎবাবুর পক্ষ নিয়ে বলে, এ কথা ঠিক মাসীমা, বাড়িতে প্রায়ই এটা-ওটা চুরি যাচ্ছে। এই তো ক'দিন আগে বাবা স্কুলের মাইনে দিয়ে গেলেন, তার মধ্যে দু'টাকা পেলাম না। নিশ্চয় কেউ আমার পকেট থেকে তুলে নিয়েছে।

—আগে বলিস নি তো?

—বলে কি হবে? মিছিমিছি গোলমালের সৃষ্টি, যে নিয়েছে সে তো ফেরত দেবে না?

জগৎবাবু জোর দিয়ে বলেন, আমি নিশ্চয় করে বলছি, এসব ওই হতভাগা নটবরটার কাজ।

মাসীমা আস্তে আস্তে বলেন, নতুন লোক তো নয়, বেশ কিছুদিন কাজ করছে—

—ওরা সব পারে, আজ-কাল একটা বিশ্বাসী লোক পাবে না।

শ্যামলকে ডেকে বললেন, আমি দরকারী কাজে বেরুচ্ছি, তুই ওকে জিজ্ঞেস করে দেখ, সন্দেহ হলেই দিবি বেটাকে তাড়িয়ে।

জগৎবাবু চলে গেলে মাসীমা বললেন, শ্যামল, কাজটা কি ঠিক হবে? মিছিমিছি একটা লোককে সন্দেহ করা—

—মামা যখন বলে গেলেন, একবার ওর বাক্স-প্যাঁটরাগুলো দেখা উচিত, নয়ত ফিরে এসে আমাদের ওপর চটে যাবেন।

শ্যামল যখন নীচে গিয়ে নটবরকে বাক্স-বিছানা খুলে দেখাতে বলে, সে প্রথমটা আশ্চর্য হয়ে যায়, বাবু এই কথা বলে গেলেন!

—আমি কি তবে মিথ্যে বলছি! সাধু সাজতে হবে না, বাক্স খোল। কথামত নটবর বাক্স খুলে দেয়। শ্যামল জিনিসপত্তর নেড়েচেড়ে দেখে, এ নতুন কাপড় কোথায় পেলে?

—পুজোর সময় মাসীমা দিয়েছিলেন।

—মাথার তেল, সাবান, এসব কেন?

—দেশে পাঠাব, গাঁয়ের লোক কাল যাবে।

—কেনবার টাকা পেলি কোথায়?

—নটবর বিরক্ত হয়ে বলে, আপনারা কি মাইনে দেন না?

—এঃ, খুব যে মুখের উপর কথা বলতে শিখেছিস, দাঁড়া, বাবু আসুক বাড়িতে।

জগৎবাবু ফিরে আসার জন্য আর অপেক্ষা করতে হয় না। নটবর সোজা মাসীমার কাছে গিয়ে বলে, আমার মাইনে চুকিয়ে ছুটি দিন মা।

মাসীমা ঠাণ্ডা গলায় বলেন, বাবু আসুন।

—আমি এ-বাড়িতে কাজ করব না। এত দিন রয়েছি একটা জিনিসের এদিক-ওদিক হয়নি, আর আজ আমাকে এক কথায় চোর বললেন।

আর কিছু না বলে নটবর সেখান থেকে হন্ হন্ করে চলে যায়। মাসীমার কাছে সব শুনে শ্যামল বললে, তবে ও-ব্যাটা নিশ্চয় চোর, এক কথায় যখন কাজ ছেড়ে পালাল—

—কি জানি বাবা, লোকটা তো কখনও খারাপ ছিল না?

—বুদ্ধি দেবার লোক জুটেছে বোধ হয়।

শ্যামল আর কথা না বাড়িয়ে জামা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। মদনদের পাড়ায় আসতে তার বেশি সময় লাগে না, ট্রাম থেকে নেমে ছু' মিনিটের হাঁটা পথ। গলির মোড়ে ফুটপাথের ওপর বসে মদনরা আড্ডা মারছিল, শ্যামলকে দেখে হাঁক দেয়,—এই শ্যামল, এ দিকে—

শ্যামল ওদের মধ্যে গিয়ে বসে, সকলেই প্রায় তার পরিচিত। এখানে এসে কত দিন সে আড্ডা মেরে গেছে, মদন এর নাম দিয়েছে আড্ডা-সঙ্ঘ। নামকরণ যে খুবই সঙ্গত হয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনতলা বাড়ির নীচে বড় ফুটপাথ, তারই একাংশে আড্ডা-সঙ্ঘের আসর বসে। একতলায় রেশন আফিসের গুদাম বলে সারাক্ষণই ফুটপাথে ছু'তিনটে ঠেলাগাড়ী থাকে। প্রয়োজন-মত ছেলেরা ঠেলা-গাড়ীর মাটিছোঁয়া অংশটায় বসে, কেউ বা তার পাশের পাথরটায়, কখনও ফুটপাথেই কাগজ পেতে। সামনেই পানের দোকান। বড় বাড়ির নীচে বলে অনেকক্ষণ ছায়া থাকে। প্রথম দিন এসে শ্যামল তারিফ করে বলেছিল, বাঃ বেশ খাসা জায়গা! কারুর বাড়ি নয়, দোকান নয়, সরকারী ফুটপাথ, যে কেউ এসে আড্ডা দিতে পারে, কারো কিছু বলার নেই।

মদন হেসে বলেছিল, শুধু এই, সামনের বাড়ি দেখেছিস? ছোট বারান্দাওয়ালা, ওখানে যা আছে—

—কি রে, কি? শ্যামল চারিদিকে তাকায়

—চিড়িয়া।

—মাইরি?

—এক উকিল থাকে, তাঁর পাঁচ মেয়ে। বড় ছু'জনের বিয়ে হয়ে গেছে। সেজ মেয়েটির সঙ্গে আমাদের মন্টুদা—

মন্টুদা শ্যামলের অচেনা নয়। মদনের সঙ্গে অনেক বার দেখেছে,

সুন্দর চেহারা। ফর্সা রঙ্, টানা ভুরু, গানও বেশ ভাল করে, বিশেষ করে সিনেমার গান।

প্রথম দিন মদনের কথা শুনে শ্যামল খুব অবাক হয়েছিল। এ বিষয়ে আরও শোনার জন্যে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে গা-সওয়া হয়ে গেছে। কত দিন দেখেছে মন্টুদা এই আড্ডা-সঙ্ঘে বসে গান গায় আর মেয়েটি বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। শ্যামলের প্রথম প্রথম চোখ তুলে তাকাতে লজ্জা করত। পরে দেখেছিলো, মেয়েটি এমন ডানাকাটা পরী কিছু নয়, সাধারণ মেয়েই। বয়স ছাড়া আর কিছু আকর্ষণীয় আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু মন্টুদা যে মেয়েটির জন্যে পাগল এ বিষয়ে কারুর সন্দেহ নেই। আজও সবাইকে বলছিল আমার মনের কথা তোমরা বুঝবে না ভাই।

ভোঁদা উৎসাহ দিয়ে বলে, যা হোক হেস্ত-নেস্ত করে ফেলুন, মন্টুদা, আমরা আপনার পেছনে ঠিক আছি।

—এ সব ব্যাপারে গায়ের জোর চলে না রে ভাই।

—নন্দিতার বাবাকে একটা চিঠি লিখেই দেখুন না।

মন্টুদা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, কোন লাভ নেই, হেমন্তবাবু আমাকে দু চোখে দেখতে পারেন না। ওনাকেই বা দোষ দেব কি, পাত্র হিসেবে আমি সত্যিই তাঁর মেয়ের যোগ্য নই।

—কেন, অযোগ্য কিসের? ক'টা ছেলে আপনার মত গান করতে পারে?

মদন খেই ধরে, আর এমন রোমিও মার্কা চেহারাই বা কোথায় পাবে? ওঁর বড় জামাইটি তো একটি হোঁদল কুৎকুৎ।

—আপনি তো অন্যদের মত ভ্যাগাবণ্ড নন, রীতিমত দশটা পাঁচটা অফিস করেন।

মন্টুদা উঠে পড়ে, কেরানীর আবার আফিস, চলি ভাই।

ভোঁদা চট্ করে হাত বাড়িয়ে দেয়, সিগারেটের প্যাকেটটা দিয়ে যান মন্টুদা।

মন্টুদা সিগারেট, দেশলাই দুটোই ওর হাতে দিয়ে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে বাড়ির দিকে চলে যায়।

শ্যামল প্রথম কথা বলে, পাগলা!

ভোঁদা সিগারেট ধরিয়ে বলে, যাই বল, খাঁটি প্রেমিক, ভেজাল নেই।

মদন হাই তোলে, আজ কিন্তু তেমন জমলো না। এমন ছুটির দিনে না মন্টুদার দু'-একটা কড়া গান, না সামনের বাড়ির নীল শাড়ী।

শ্যামল জিজ্ঞেস করে, মদন, বেরুবি নাকি?

—চল।

দু'জনে উঠে পড়ে। চলতে চলতে কেষ্টর বিষয়ে আলোচনা হয়। মদন জিজ্ঞেস করে,—কেষ্টদাকে থানায় ধরে নিয়ে গেল?

—সে তো চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে, আশুদা গিয়ে জামিনে খালাস করে এনেছে।

—কোর্টে কেস হবে তো?

—হবে, কিন্তু প্রমাণ পাবে না। সেদিন যাদের সঙ্গে ছিল রাত্রে, তারা সাক্ষী দেবে।

—আমার সঙ্গে কবে আলাপ করিয়ে দিবি?

—সেই কথাই বলতে এলাম, তোকে নিয়ে টালীগঞ্জের বস্তীতে যেতে বলেছে।

—কেন, সেখানে কি হবে?

—কেষ্টদার ব্যাপার কি বোঝা যায়, বলল কে একজন মর-মর, হয়তো শ্মশানে নিয়ে যেতে হবে। নিশ্চয় কোন দাঁও মারবে।

মদন হঠাৎ বলে, সে দোকানদারটা আবার এসেছিল। ওকে টাকা না দিলে চলবে না, বলছে বাড়িতে বলে দেবে।

শ্যামল পকেট থেকে পাঁচ টাকার নোট বার করে মদনের হাতে দেয়।

—কোথায় পেলি?

—মামার পকেট থেকে।

—সাবাস, আজ না পেলে মুস্কিল হত। চল, বুড়োকে আগে টাকাটা দিয়ে আসি।

বালাগঞ্জের ট্রাম থেকে নেমে কেষ্ট দোতালা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। এই বাড়িতেই সে এসেছিল দিনদশেক আগে ছেলে-চাপা-দেওয়া ফোর্ড গাড়ীর অনুসরণ করে। আজ তার রুক্ষ চুল, কালী বসা চোখ, ময়লা কাপড় দেখে বাড়ির কর্তা সন্ত্রস্ত হ'ন, আপনার শালা ভাল আছে?

কেষ্ট ম্লান হাসে। ভদ্রলোক উত্তর না পেয়ে আবার জিজ্ঞেস করেন, কি হয়েছে বলুন?

—না, এখনও মারা যায় নি।

—তবে কি—

কথা শেষ করতে না দিয়ে কতকগুলো প্রেসক্রিপসন কেষ্ট পকেট থেকে বার করে দেয়। বলা বাহুল্য, এগুলি গৌরীর ভাইয়ের। ভদ্রলোক হাতে নিয়ে খুলেও দেখেন না, বলেন, এ আর আমি কি দেখব? আপনি এত দিন আসেন নি কেন? আমার স্ত্রী রোজই আপনার কথা জিজ্ঞেস করেন।

—মিছিমিছি এসে আর কি হবে, কিছুই তো বোঝা যায় নি। ডাক্তাররা বলছেন, 'অপরেশন' করলে হয়ত বাঁচতে পারে। তাই—

—আমরা কি করতে পারি বলুন?

—অন্তত শ'খানেক টাকা এখুনি চাই।

—বসুন। এনে দিচ্ছি।

ভদ্রলোক ওপরে চলে গেলেন। একটু পরে শুধু টাকা নয়, সঙ্গে চাকরের হাতে সিঙ্গাড়া, মিষ্টি প্লেটে নিয়ে এলেন।—আমার স্ত্রী পাঠিয়ে দিলেন, খেয়ে নিন্।

কেষ্ট হাত্ জোড় করে বলে, মাফ করবেন, খাবার মত মনের অবস্থা আমার এখন নেই।

ভদ্রলোক জোর করেন, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, এখনও পর্যন্ত কিছু খাননি, যা পারেন—

কেষ্ট কথার উত্তর না দিয়ে একটা সন্দেশ জল দিয়ে গিলে ফেলে।

—কেমন থাকে একটু জানাবেন, বিশেষ চিন্তিত রইলাম।

কেষ্ট সম্মতি জানিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ে।

কেষ্ট কোথাও এতটুকু সময় নষ্ট না করে সোজা টালীগঞ্জে চলে আসে। সমস্ত বস্তীটায় বিষাদের ছায়া পড়েছে। ছেলেটির অবস্থা খারাপ, কেষ্ট তা সকালেই দেখে গিয়েছিল, টাকার দরকার না থাকলে হয়ত সে এখান থেকে বার হ'ত না। ওদিকে গিয়েছিল বলেই যদি দরকার হয় ভেবে শ্যামলকে খবর পাঠায়। তারপর টাকার যোগাড় করে বস্তীতে ফিরেছে। গৌরীর ঘর থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসে, ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে দেখে ছেলেটি মারা যায়নি, তবে আর বেশিক্ষণ নয়, হাঁপরের মত শ্বাস টান্‌ছে। এমনি ভাবে প্রায় আধ ঘণ্টা যমের সঙ্গে বোঝাপড়া চল্‌ল। তারপর সব শেষ।

গৌরীর বুকফাটা কান্না, অন্যদের লোকদেখানো চোখের জল, বয়ঃ-জ্যেষ্ঠদের অহেতুক ব্যস্ততা কেষ্টকে এতটুকু বিচলিত করে না। বস্তীরই একটি যুবককে ডেকে সে একান্তে পরামর্শ করে।

—ছেলেটির সৎকারের কি হবে?

—জানি না, গৌরীকে জিজ্ঞেস করব?

—কোন ব্যবস্থা কি হয়েছে ?

—কে করবে, ওদের তো কেউ নেই।

—যদি টাকা দিই, তুমি একটা খাটিয়া কিনে আনবে ?

—দিন, কাছেই মড়াপোড়ানোর খাট পাওয়া যায়, আমি এখনই নিয়ে আসছি।

যুবকটি চলে যায়। কেষ্ট জমিদার-বাড়ির প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে সিগারেট খায়। বিরক্তির কান্না তার অসহ্য লাগে! কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে খেয়াল ছিল না, শ্যামলের ডাকে ফিরে তাকায়। মদনকে নিয়ে সে এসে হাজির হয়েছে। শ্যামল নিজে থেকেই বলে, ঠিকানা খুঁজে পেতে প্রাণ বেরিয়ে গেছে কেষ্টদা, সেই কখন থেকে ঘুরছি।

—আমিও তাই ভাবছিলাম এতক্ষণ এলি না কেন।

—এই আমার বন্ধু, মদন—

কেষ্ট মদনের দিকে তাকিয়ে বলে, তোমার কথা শ্যামলের কাছে অনেক শুনেছি, আজ দু'জনে এসেছ ভালই হয়েছে।

মদন হেসে বলে, কত দিন থেকে আপনার কাছে আসব ভাবছি—

—জানি। কেষ্ট একটু থেমে বলে, এখন এক বার শ্মশানে যেতে হবে একটি ছেলেকে পোড়াতে।

শ্যামল কৌতূহল প্রকাশ করে, কে কেষ্টদা ?

—এই বস্তীরই একটা ছেলে, একটু আগে মারা গেছে। তোমরা গিয়ে কয়েকটা জিনিস কিনে আন, আমি বলে দিচ্ছি।

কেষ্ট বস্তীর ভেতর চলে যায়। মদন সেই দিকে তাকিয়ে বলে, কেষ্টদা, এত গম্ভীর লোক না কি ?

—সব রকম অ্যাকৃটিং ওর জানা আছে।

—কি ব্যাপার বল্ তো ?

—এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না।

দু'জনে ঘুরে ঘুরে এদিক-ওদিক দেখে। কেষ্ট এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে নিয়ে ফিরে আসে।

—পণ্ডিত মশাই, আপনি এই ছেলে দু'টিকে একটু বুঝিয়ে দিন কি কি জিনিষ আনতে হবে।

পণ্ডিত মশাই বললেন, আমি বরং এদের সঙ্গেই যাচ্ছি, যে কয়টি জিনিস না আনলেই নয়, নিয়ে আসব।

বস্তী থেকে বেরুতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গেল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সব রকম ব্যবস্থাই কেষ্ট করেছিল, কিন্তু গৌরীর কাছ থেকে তার ভাইয়ের মৃতদেহ নিয়ে আসতেই যা দেরি হ'ল। গৌরী ছোট মেয়ের মত হাউ-মাউ করে কাঁদছে, আমার যে আর কেউ রইল না গো, আমি আর একলা কিসের জন্য বেঁচে থাকব?···কাঁদতে কাঁদতে সে অজ্ঞান হয়ে না পড়লে কেষ্টদের বেরুতে বোধ হয় আরও দেরি হয়ে যেত। সংজ্ঞাহীন গৌরীকে পণ্ডিত মশাইয়ের জিম্মায় রেখে কেষ্টরা খাট নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

কাঁধ দিচ্ছে মাত্র চার জন। সামনে কেষ্ট আর রাজেন, বস্তীর সেই যুবকটি। মদন আর শ্যামল পিছন দিকে। মদন আগে অনেক বার কাঁধ দিয়েছে, থেকে থেকে চেঁচায়, বল হরি, হরিবোল।

খানিক দূর গিয়ে শ্যামল কাঁধ বদলায়, নাঃ, হালকি আছে।

মদন উত্তর দেয়, সেই জন্যেই তো বেছে বেছে খাট নিয়েছি, যাতে না কাঁধে লাগে।

—আমি কিন্তু আগে শ্মশানে যাইনি।

—আমি অনেকবার গিয়েছি। এই তো সেদিন এক বুড়ীকে নিমতলায় নিয়ে গেলাম, খুব ধুমধাম হ'ল। খৈ ছড়াচ্ছে, পয়সা ছড়াচ্ছে, ভিখারীদের খুব মজা।

মদন বলে, বাড়ি ফিরতে আজ অনেক রাত হয়ে যাবে।

—কেন ? শ্যামল জিজ্ঞেস করে।

—শ্মশানে পৌঁছে খালি চুল্লী পাওয়া, কাঠের যোগাড়, অনেক সময় লাগবে।

কেষ্ট শুধু বললে, শ্মশানে পৌঁছে দিয়ে তোমরা বাড়ি চলে যেও, সব কাজ আমি করে নেব।

যদিও কেষ্ট বলেছিল শ্যামলদের চলে যেতে কিন্তু মৃতদেহ আগুন না ধরা অবধি তারা শ্মশানে ছিল। পাঁচ-ছটা চুল্লী জ্বলছে অন্ধকারের মধ্যে, সে-ও এক দৃশ্য।

শ্যামল এক সময় চুপি চুপি মদনকে বলে, কৈ আমার তো ভয় করছে না!

—ভয় করবে কেন ?

—কি রকম যেন মনে হ'ত, শ্মশানে এলে ভয় করে।

—চল্, এইবার কেটে পড়ি।

শ্যামল এগিয়ে গিয়ে কেষ্টর কাছে এসে দাঁড়ায়, কেষ্টদা, আমরা এবার যাই ?

কেষ্ট পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে শ্যামলকে দেয়, বলে, তোরা চলে যা, কাল কিংবা পরশু আমার সঙ্গে অনন্ত-কেবিনে দেখা করিস, মদন তুমিও এস।

তারা চলে যায়। কেষ্ট আর রাজেন অনেকক্ষণ বসে থাকে। সব কাজ শেষ করে বস্তীতে ফিরতে রাত হয়ে গেল। কেষ্ট রাস্তায় দাঁড়িয়ে রাজেনকে অনুরোধ করে, আমি আর ভেতরে যাব না। দেখে এস তো আর কোন দরকার আছে কি না।

রাজেন চলে গেলে কেষ্ট সামনের চায়ের দোকান থেকে এক ভাঁড় চা কেনে। সারা দিনের অনিয়মের পর গরম চা খেতে গিয়ে কেমন যেন গা ঘুলিয়ে ওঠে। একটু পরেই রাজেন ফিরে এসে খবর দেয়, এখন

আর কিছু দরকার নেই, গৌরীর কাছে বস্তীর অন্য মেয়েরা আছে। অনেকক্ষণ কেঁদে এখন ঘুমিয়ে পড়ছে।

কেষ্ট সেখান থেকে হেঁটে এসে মোড়ের মাথায় বাস ধরে।

সারা রাত কেষ্ট ঘুমুতে পারে না। কি একটা অস্বোয়াস্তি বুক ভার করে রয়েছে। বার বার যে কথা মনে পড়েছে তা হোল গৌরীর নিঃসহায় কান্না। গৌরী একা, এই বিরাট পৃথিবীতে তার আপনার বলতে কেউ নেই। ঠিক এ ধরনের কোন চরিত্রের সঙ্গে কেষ্টর পরিচয় ছিল না। হয়তো গল্পে পড়েছে কিংবা কারো কাছে শুনেছে, কিন্তু নিজের জীবনে এ অভিজ্ঞতা তার বিচিত্র মনে হয়।

ঘরের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে আসছিল, ছাদে গিয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস নেয়।

দূর আকাশে একটা তারা খসে পড়ে।

সেই দিকে তাকিয়ে কেষ্টর আর এক কথা মনে হয়। তার নিজের বলতে কি আছে? এ বিরাট পৃথিবীতে সে-ও তো একা, আত্মীয়-স্বজন কারো কথাই আজ তার মনে পড়ে না। এই ছাদের নীচেই শুয়ে আছে দাদা, বৌদি, অথচ কতখানি ব্যবধান! শ্যামাও আজ-কাল ওপরে আসতে পারে না। জানলায়, দরজায় তার নিষেধের পর্দা টাঙানো রয়েছে। এ চিন্তার শেষ কোথায়?

কেষ্টর হঠাৎ মনে হয় গৌরী তার চেয়ে সুখী। তার কেউ নেই বলে সে একা, কিন্তু কেষ্টর সবাই আছে, তবু সে একা। গৌরীর চেয়ে আরও বেশি একা।

কেন জানা নেই, এ চিন্তা তার মনে শান্তি এনে দিল, নিজেকে তার অনেক হাল্কা মনে হয়। ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুম তার দেহ-মন আচ্ছন্ন করে ফেলে।

অনন্ত-কেবিনে যে আসে আশুবাবুই তাকেই জিজ্ঞেস করেন, কেষ্টর কোন খবর জান ?

বেশির ভাগ লোকই বলে, তারা কিছু জানে না। শ্যামল অবশ্য বলেছিল, কেষ্টদা'র সঙ্গে শ্মশানে গিয়েছিলাম।

—কবে ?

—এই তো ক'দিন আগে, একটা ছেলেকে পোড়াতে।

প্রভাত দূর থেকে মন্তব্য করে, কেষ্টকে আবার এ রোগে ধরল কেন ?

আশুবাবু বলেন, তা কেন, দরকারের সময় ও তো বরাবরই কাঁধ দেয়।

—কি জানি, আমার ও-সব ভাল লাগে না। নিজের বাড়ির লোককেই পুড়িয়ে অস্থির, তার ওপর পাড়ার লোক!

—সবাই-এর মত তো আর সমান নয় ?

প্রভাত আর তর্ক করার সময় পায় না। ছায়ামঞ্চের সম্পাদককে দেখে ব্যস্ত হয়ে তার সঙ্গে আলোচনা শুরু করে, সত্যি বলছ, পুলিস গোলমাল করবে ?

—তাই তো শুনছি, ও লেখাটা ছাপানো ঠিক হয়নি।

—তুমিই তো জোর করে বললে লিখতে।

—ভাবলাম বেশি বিক্রি হবে। হলও তাই, প্রায় পাঁচ শ' কপি বেশি কেটেছে। কিন্তু আচ্ছা ফ্যাসাদে ফেলেছে!

—এমন কি অশ্লীল হল ?

সম্পাদক ব্যাজার মুখে বলে, শ্লীল-অশ্লীলের কি আর বাঁধা মাপকাটি আছে, যখন যা খেয়াল চাপে—

—আগেও তো একবার নোটিস পাঠিয়েছিল ?

—সে প্রায় দু'বছর আগে। খেসারতও কম দিতে হয়নি, পাঁচশো টাকা।

—তারপর ?

—কাগজের নাম পাল্টালাম, এখন আবার ধরেছে। সম্পাদক, প্রকাশক হওয়ার এই বিপদ। তোমাদের আর কি, লিখেই খালাস।

—কি করবে ঠিক করেছ ?

—টাকা-কড়ি কিছুই নেই। যদি বলে, হয় জেলে যাও নয় জরিমানা এত টাকা, অগত্যা জেলেই যেতে হবে।

চায়ে চুমুক দিয়ে প্রভাত জিজ্ঞেস করে, বৌদিকে বলেছেন ?

—বলে লাভ নেই, ওর গায়ে যা কিছু গয়না ছিল সবই সেঁকরার দোকানে বাঁধা আছে।

সম্পাদককে খুবই বিমর্ষ দেখায়। আসন্ন বিপদের হাত থেকে বাঁচাবার কোন পথই পায় না।

উৎসাহ দিযে প্রভাত বলে, ঘাবড়িযো না, দেখি আমি কি করতে পারি। শেষ পর্যন্ত কারুর কাছে না পাই, বেলারাণীকে একবার বলে দেখব। আমাদেব কাগজটা ও সত্যি ভালবাসে।

ইতিমধ্যে কেবিনে হৈ-চৈ করার লোকেরা এসে গেছে, সকলেই কেষ্টর সাকরেদ। বিশু চেঁচিয়ে বলে, কেষ্টদা এই সময় ডুব মারলো ? এদিকে রাঘব বোয়ালের কাছে উঠতে বসতে মুখ-খিঁচুনী খাচ্ছি।

ভোঁতন বলে, রাঘব বোয়ালের আর দোষ কি, ওর পয়সায় এত দিন নেচেছ কুঁদেছ, এখন ভোটের যা রেজাল্ট !

—সত্যি, কি হল বল তো ? যতদূর খবর বেরিয়েছে সবাই [illegible] জিতছে।

—কেষ্টদা ওস্তাদ লোক, টাইম মাফিক কেটে পড়েছে।

—কি আশ্চর্য ! বাড়িতে গেলে পাওয়া যায় না, ভোরবেলা বেরিয়ে যায় আর অনেক রাতে ফেরে।

বিশু মন্তব্য করে, কেষ্টদা'র জন্যে হা পিত্যেশ করলে তো চলবে না, চল, রাঘব বোয়ালকে যা হোক কিছু বলে আসি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সকলে সায় দেয়, চল, যা আছে বরাতে।

বিদ্যাভবনের কাছে এসে শ্যামল দেখে, ছেলেরা সব বাইরে দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি করছে, ভেতরে ঢুকছে না। মদন সামনের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আরেক জন ছেলের সঙ্গে গল্প করছিল। শ্যামলকে দেখে উল্লসিত হয়ে বলে, তুই এসে পড়েছিস, খুব ভাল হয়েছে। আমি ভাবছিলাম তোরই কাছে যাব।

—ব্যাপার কি, স্কুল হবে না ?

—স্ট্রাইক !

—কেন ?

—কে জানে ! সকালে এসেই শুনলাম ক্লাসে যেতে হবে না, স্ট্রাইক করতে হবে। ব্যস—

—আজকাল বেশ এমনি এমনি ছুটি পাওয়া যায়।

—চল, আমরা কেটে পড়ি। এই যে চুণীলাল, এর বাড়ি যা বলেছি, তুই চুণীলালকে চিনিস না ? চুণীলাল মদনের পাশেই দাঁড়িয়েছিল, তার দিকে তাকিয়ে বলে, স্কুলে দেখেছি।

—ফার্স্ট ক্লাসে পড়ে। লেখাপড়ায় বেশ ভাল, প্রত্যেক বছর পাস করে। আমরা থার্ড ক্লাস পর্যন্ত একসঙ্গে পড়তাম—কথা বলতে বলতে তারা তিনজনে এগুতে থাকে। চুণীলালের বাড়ি বেশি দূরে নয়, ছুটো রাস্তা পেরিয়ে ডান দিকে মোড় নিতে হয়।

বেশ বড় বাড়ি, ছুটো ঘর পেরিয়ে চুণীলালের পড়ার আড্ডা। চুণীলাল বলে, এইটি আমার রাজত্ব, এখানে পড়ি, শুই, সব কিছু করি।

শ্যামল তারিফ করে, কটা ছেলে এমন নিজস্ব ঘর পায়, আমার তো দেখেই লোভ লাগছে। সকলে একসঙ্গে ছোট খাটটার ওপরেই বসে পড়ে। মদন চুণীলালকে বলে, এই শ্যামলের কথাই আমি বলছিলাম। ওর হাতে অনেক সময় আছে, তোমাদের কি কাজের দরকার ?

চুণীলাল শ্যামলের দিকে তাকায়, তাহলে তো খুব ভাল হয়। সারা দিন স্কুলে থেকে, তারপর পড়া করতে হয়, তাই বেশি সময় পাই না, যদি তোমাব সুবিধে থাকে—

শ্যামল অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, কিসের সুবিধে ?

—দেশের কাজ করার।

—দেশ।

—হ্যাঁ, চোখ বুজে বসে থাকলে তো আমাদের চলবে না, দেশের জন্যে ভাবতে হবে। অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে—

শ্যামল থামিয়ে দেয়, কার অত্যাচার ?

—সে কি আর একদিনে বোঝান যায় ? আমাদের অফিসে এস, দেবেনদা সব বুঝিয়ে দেবেন।

—দেবেনদা ?

—আমাদের নেতা, এরকম লোক আমি দু'টি দেখিনি। খুব বড় পণ্ডিত, দেশের জন্যে জেলে গেছেন কত।

মদন এতক্ষণে কথা বলে, আমি আর শ্যামল তোমার সঙ্গে এক দিন যাব।

—একদিন কেন ? আজই চল না।

শ্যামল হঠাৎ প্রশ্ন করে, তোমরা কি কাজ কর ?

চুণীলাল বিজ্ঞের হাসি হাসে, সে কি এক রকম, হাজরটা কাজ আছে। এই যে স্ট্রাইক, সে তো আমাদেরই কাজ।

—তাই না কি?

—কোন স্কুল আজ হবে না। সকাল থেকে আমাদের দল চলে গেছে, তোমাকেও এ-সব কাজ করতে হবে।

—এতে আমি রাজী আছি।

—আমাদের দাবী যদি না মানা হয়, তাহলে এই দলে এমন একদল ছেলে আছে যারা নিমেষে কলকাতা শহর লণ্ডভণ্ড করে সব কিছু বন্ধ করে দিতে পারে।

মদন ও শ্যামল সবিস্ময়ে চুণীলালের কথা শোনে, তার বক্তৃতা আর দলের চমকপ্রদ কীর্তিকলাপ।

ঐ ক'দিন যে কেষ্টকে কেউ খুঁজে পায়নি, বলা বাহুল্য, তার প্রধান কারণ গৌরী। সংসারে অভিজ্ঞ কেষ্ট ভাল করেই বুঝেছিল গৌরীর মন থেকে লজ্জা, ভয়, সংকোচ সরিয়ে দিতে না পারলে তাকে সহজ করে তোলা সম্ভব নয়। সেই জন্যেই রোজ কেষ্ট তাকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে, কথার কৌশলে ফেলে-আসা দিনের কথা জেনে নিয়েছে এবং তারই ফাঁকে এই গোলমেলে দুনিয়ায় সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্যে নিজের যুক্তিকে গৌরীর মনে বদ্ধমূল করার চেষ্টা করেছে। বার বার সে বলেছে, অত কাঁদলে চলে না, নিজেকে না দেখলে কে তোমায় দেখবে।

গৌরী কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, আর যে পারছি না।

—পারতে হবেই।

—আপনি ভাবতে পারছেন না, এই এক বছরের মধ্যে বাবা, মা, ভাই, বাড়ি-ঘর—

কেষ্ট নীচু গলায় বলে, জানি তুমি সব হারিয়েছ, কিন্তু বাঁচতে তো হবে।

গৌরী উদাস চোখে অন্যদিকে তাকিয়ে উত্তর দেয়, আর ইচ্ছে নেই।

—ও কথার কোন মানে হয় না।

—কার জন্যে বাঁচব ?

—নিজের জন্যে।

গৌরী উত্তর খুঁজে পায় না, নীরবে মাথা নাড়ে।

কেষ্ট ধমকে ওঠে, যদি মরতেই চাও তো চটপট মর, গঙ্গায় অনেক জল আছে।

একথা বলেই কেষ্ট চলে এসেছিল। কিন্তু আধঘণ্টা বাদে মাথা ঠাণ্ডা হলে সে বুঝতে পারে অন্যায় করেছে। গৌরীর সব আশা ভেঙ্গে গেছে, তার উপর অযথা এতখানি কঠোর হওয়া উচিত হয়নি। ফিরে এসে দেখে, গৌরী সেইখানেই বসে আছে। কেষ্টকে দেখে কাতরকণ্ঠে বলে, আমায় কিছু পয়সা দেবেন, ক্ষিদে পেয়েছে।

কেষ্ট পকেট থেকে একটা টাকা বের করে দেয়।

—আপনি আমার জন্যে এত করলেন, জানি না—

—শোধ দিতে পারবে কি না ভাবছ ? হাতে পয়সা থাকলে যার দরকার তাকে দিই, ফেরত পাব বলে নয়।

—শরীরটা খারাপ লাগছে, এখন আমি আসি।

কেষ্ট গৌরীর দিকে তাকিয়ে বোঝে সত্যিই সে অসুস্থ। বলে এতক্ষণ বাড়ি যাওনি কেন ?

—আপনাকে না বলে কি করে যাব, তা ছাড়া হাতে একটাও পয়সা ছিল না।

—তুমি ভেবেছিলে আমি ফিরে আসব ?

গৌরী এতক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, চলতে চলতে বলে, হ্যাঁ।

—কেন ?

—তা জানি না।

পরদিন সন্ধ্যেবেলায় কেষ্ট মনুমেণ্টের অদূরে গৌরীর সঙ্গে বসে আলু-কাবলী খাচ্ছিল। দিনের আলো নিবে গেছে, দূরে এসপ্ল্যানেড, বিজ্ঞাপনে ঝকমকে আলো, ট্রাম-বাস কত রকম লোক। সেই দিকে তাকিয়ে থেকে কেষ্ট হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, এত বড় শহরে তোমার থাকার একটা জায়গা হবে না ?

গৌরী খুব আস্তে উত্তর দেয়, এত দিন তো হয়নি।

—তুমি চেষ্টা করনি।

—করেছি।

—কি ?

—কলকাতায় পৌঁছে আমি আর আমার ভাই ওই টালীগঞ্জের বস্তীতে থাকার জায়গা পেলাম সেও শুধু পণ্ডিত মশাইয়ের জন্যে। বস্তীর সামনে যে পাকা দালান দেখেছেন ওটা এক জমিদারের। উনি পণ্ডিত মশাইকে খুব শ্রদ্ধা করেন। কলকাতায় এলে পণ্ডিত মশাই ওদের বাড়ি উঠতেন। আমরা যখন নিঃস্ব অবস্থায় এখানে এলাম, উনি দয়া করে নিজের জমিতে এই বস্তীটি করে দেন। আমরা সাত-আট ঘর লোক থাকি সবাই এক গাঁয়ের। আগে ভাড়া নিতেন না, এখন—

কেষ্ট বাধা দিয়ে বলে, আমি তা শুনতে চাই না, তুমি নিজে কি চেষ্টা করেছ ?

—তাই তো বলছি। থাকবার জায়গা পেলাম, কিন্তু হাতে এক পয়সাও নেই। ভাইটা এসেই অসুখে পড়ল, কি দুর্ভাবনা! কাজের জন্যে বাড়ি বাড়ি ঘুরেছি, কিছুই পাইনি।

—কেন ?

—কে আমায় রাখবে? কি পারি আমি, না শিখেছি লেখাপড়া, না আছে ভারী কাজ করার শক্তি।

—সেলাই-এর কাজ জান না?

—জানি। কাউকে করে দিলে খুশি হয়, কিন্তু পয়সা দেয় না।

—ঘরের কাজ?

—কে আমার জামিন হবে? উটকো লোক কেউ রাখতে চায় না।

—কোথাও কাজ পাওনি?

—দু-এক জায়গায় পেয়েছি। যারা ভূতের মত খাটিয়ে নেয় আর মাসের শেষে ছুতো খুঁজে তাড়িয়ে দেয়, মাইনে দেয না। তখন অত টাকার দরকার,—

গৌরী থেমে যায়। কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, তার পর?

—ভিক্ষে শুরু করলাম, ভাইয়ের চিকিৎসা তাতে যা হয় হত। এমনই বরাত, হল একেবারে রাজরোগ। কেষ্ট কোন উত্তর দেয় না। গৌরী নিজের মনে বলে, ভিক্ষেই বা আজকাল ক'জন দেয়, আর দেবেই বা কত জনকে। এত ভিখিরি!

—তোমার মত ভিখিরিকে কেউ ভিক্ষে দেয় না—

গৌরী কেষ্টর মুখের দিকে না তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, কেন?

—তুমি তো চোখ তুলে ভিক্ষে চাও না।

—মানে?

—যদি বাবুদের চোখে চোখ রেখে ভিক্ষে চাইতে, তারা দিত।

গৌরী বিস্মিত হয়, আপনি কি বলছেন?

—সত্যি কথা, এক বর্ণ বানিয়ে বলছি না। দয়া করে কেউ ভিক্ষে দেয় না, খুশি হয়ে দেয়।

—আপনি?

—আমার কথা ছেড়ে দাও, একদিন জানতে পারবে। তবে যা

বলছি শুনে রাখ। চোখ তুলে চললে এ শহরে থাকবার তুমি অনেক জায়গা পাবে, বেশ ভাল ভাবে থাকবার। নইলে না খেয়ে মরতে হবে।

গৌরী কি বলতে যায়, কেষ্ট থামিয়ে দিয়ে বলে, আর দেরি কোর না, বাড়ি যাও।

এ প্রসঙ্গের শেষ কিন্তু এখানেই হল না। পরদিনই সকালবেলা কেষ্টর সঙ্গে দেখা হতেই গৌরী ঐ একই কথার অবতারণা করে।

—কাল আপনি যা বললেন আমি এখনও বুঝতে পারিনি।

—এখনও ভোলনি সে-কথা? আস্তে আস্তে বুঝে ফেলবে।

—আপনি আমায় কি করতে বলেন?

কেষ্ট তার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, আমি যা বলব তাই করবে?

—তা ছাড়া আর কি করব?

—আমার সঙ্গে দোকানে চল, কয়েকটা জামা কাপড় কিনে নাও।

—জামা-কাপড়?

—তোমার কাপড়-চোপড় বড় ময়লা, একসঙ্গে ঘুরলে লোকে তাকায়।

—কিন্তু আপনার কাছ থেকে কি করে নেব, বস্তীর লোকেরা কি ভাববে?

—কি আবার ভাববে, সবাইকে বোল কেষ্টদা দিয়েছে।

গৌরীর চোখ আনন্দে নেচে ওঠে, কেষ্টদা, সত্যি আপনাকে কেষ্টদা বলে ডাকব?

—নয়ত কি কেষ্ট বলে ডাকবে ভেবেছিলে?

গৌরী লজ্জায় আরক্ত হয়ে ওঠে, ছি ছি, আপনি যে কি বলেন?

—চল, দোকানে যাওয়া যাক।

রাস্তায় চলতে চলতে রেফিউজিদের ফুটপাথের দোকান থেকে ওরা শাড়ী-ব্লাউজ কেনে। গৌরী প্রথমেই বলে দিয়েছিল, দুটি মিলের শাড়ী ছাড়া আর কিছু কিনবে না। কেষ্ট কথার অন্যথা করে নি, গৌরীর পছন্দমত নীল আর হলদে রংয়ের ছাপা শাড়ী কিনে দেয়।

—ব্লাউজ কিনবে না?

—আমার আছে।

—আর কি নেবে?

গৌরী একটু ইতস্তত করে বলে, বরং একটা সায়া—

—নাও না।

দোকান থেকে বেরিয়ে কেষ্ট বলে, বিকেলে নিশ্চয় করে নীল শাড়ী পরে এস।

গৌরী সম্মতি জানিয়ে চলে যায়।

আজ প্রায় চার দিন বাদে দুপুরবেলা কেষ্ট অনন্ত-কেবিনে এল। বিশেষ কোন লোক ছিল না, আশুবাবু চেয়ারে বসে ঢুলছিলেন। কেষ্টর গলা শুনে চম্‌কে উঠে, চোখ কচলে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি বল তো? থাকো-থাকো আজকাল কোথায় উপে যাও পাত্তা পাওয়া যায় না!

সে-কথার উত্তর না দিয়ে কেষ্ট আশুবাবুর কাছে একটা চেয়ারে বসে পড়ে, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে, চটপট খাবার দিতে বলুন।

—কি আনবে?

—ডিম-ভাজা, রুটি-মাখন আর যদি চপ থাকে—পেট ভরে খাব।

আশুবাবু অর্ডার দিতে রান্নাঘরে চলে যান। ফিরে এসে কেষ্টর

পিঠ চাপড়ে বলেন, সত্যিই আশ্চর্য লাগছে, এরকম হাসি-খুশি ভাব তো তোমার অনেক দিন দেখি নি?

—কেন, আমি কি চিরকাল হা-হুতাশ করেই বেড়াব, বলিহারি বুদ্ধি!

—এ বুড়োকে ফাঁকি দিতে পারবে না, কি হয়েছে বল।

—আপনার কি মনে হয়?

আশুবাবু ভেবে নিয়ে বলেন, হয়তো কোথাও পাকা চাকরী পেয়েছো।

—ঠিক ধরেছেন। পাকা চাকরী, তবে মাইনে দেয় না। যাক্ গে, এদিকের খবর বলুন।

আশুবাবু এতক্ষণ ভুলে গিয়েছিলেন, এবার ব্যস্ত হয়ে বলেন, সর্বনাশ হয়েছে, রাঘব বোয়াল কাৎ—

—সে তো জানি, হেরে গেছে। তাতে কি হোল?

—এর পরও জিজ্ঞেস করছ কি হ'ল? ভদ্রলোক রেগে আগুন, ছোঁড়াগুলোকে যা তা বলে গালমন্দ দিয়েছেন।

কেষ্টর মুখ থমথম করে, কি বলেছে?

—বিশেষ করে তোমার উপর রাগ, ওর টাকা নষ্ট করেছ, ওর নাম ডুবিয়েছ তোমরা—

—সে গাধাগুলো কিছু বলতে পারলো না?

—কি বলবে, জান তো তুমি ছাড়া ওরা এক পা চলতে পারে না।

কেষ্ট হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়, খাবার রেখে দিতে বলুন, আমি রাঘব বোয়ালের সাথে দেখা করে আসি।

আশুবাবু ব্যস্ত হয়ে পড়েন, এত তাড়া কিসের? না খেয়ে যেও না। কিন্তু কেষ্ট ততক্ষণে রাস্তায় নেমে পড়েছে, ও কত বড় শয়তান আমি দেখতে চাই।

রাঘব বোয়ালের বাড়ি যাবার পথে কেষ্টর সঙ্গে ভোঁতনদের দেখা হয়ে গেল, তারা অনেকেই রকে বসে আড্ডা মারছিল। ভোঁতন বলে, কেষ্টদা, এতদিন কোথায় ছিলে, আমরা যে গরুখোঁজা করছি।

কেষ্ট সে-কথার জবাব দেয় না, গম্ভীর গলায় বলে, আমার সঙ্গে আয়।

—কোথায়?

—রাঘব বোয়ালেব বাড়ি।

—ওরে বাপ্‌স্। সেদিন যা অপমান করেছে, আর ও-মুখো হচ্ছি না।

—এত ভয় কেন, আয় আমার সঙ্গে।

ভোঁতন রেগে বলে, তুমিই আমাদের নাচিয়ে দিয়ে কেটে পড়লে, আর যত অপমান সইতে হ'ল—

—তোরা কি মানুষ, বেশ করে শুনিয়ে দিয়ে আসতে পারলি না? চল আমার সঙ্গে।

আর কেউ আপত্তি করতে পারে না, অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেষ্টর সঙ্গে যেতে হয়। আজ কিন্তু দারোয়ান গেট ছেড়ে দেয় না, বজ্রগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করে, কিসকো মাঙতা?

কেষ্ট খিঁচিয়ে ওঠে, কা'কে চাই জান না, রাঘব বোয়ালকে, তোমার বাবুকে।

দারোয়ান আব বাধা দেবার সাহস পায় না। কেষ্টর মেজাজ দেখে বাবুকে খবর দিতে ছুটে।

কেষ্টরা এসে বসবার ঘরে জমা হয়। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে না। আসন্ন ঝড়ের পূর্বমুহূর্তের মত থমথম করছে। কেষ্টর চোখমুখ লাল, জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে।

রাঘব বোয়ালের চিৎকার শোনা যায়, কাহে ঘুস্‌নে দিয়া।

তারপরেই সিঁড়িতে পট পট করে চটির আওয়াজ। পর্দা সরিয়ে রাঘব বোয়াল দ্রুত ঘরের মধ্যে ঢোকেন, কি চাই?

কেষ্ট দাঁতে দাঁত ঘষে বলে, কৈফিয়ৎ!

রাঘব বোয়াল হতভম্ব হয়ে যান, কৈফিয়ৎ কিসের?

—এদের কাছে আপনি কি বলেছেন?

—কেন, ওরা বলেনি?

—আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই। বুঝতে পারছি না ওরা বাড়িয়ে বলছে কি না।

রাঘব বোয়ালের আর ধৈর্য থাকে না, বলেন, ওরকম চড়া গলায় আমার সামনে কথা বোল না।

—কেন, আমি কি আপনার চাকর?

—শাট্-আপ্।

—ইউ শাট্-আপ।

ঘর-সুদ্ধ সবাই শিউরে ওঠে। ভোঁতনরা ভয় পায়, তারা জানে রেগে গেলে কেষ্টর মাথার ঠিক থাকে না। তেমনি ভয় পায় রাঘব বোয়ালের বাড়ির লোকেরা যারা এর মধ্যে এসে জড়ো হয়েছে ঘরে, বারান্দায়। তারা জানে, মুখের ওপর কথা রাঘব বোয়াল কোন দিন বরদাস্ত করতে পারে না। অসহ্য রাগে রাঘব বোয়ালের কান লাল হয়ে ওঠে, তোমাদের আমি পুলিসে দেব, শয়তান! টাকা চুরি করেছ।

তাকে থামিয়ে কেষ্ট চিৎকার করে বলে, টাকা চুরি আমরা করিনি। তুমি করেছো, এত বড় বাড়ি, গাড়ী, সব লোক ঠকিয়ে। আমরা চোর হলে তুমি ডাকাত।

—কি! রাঘব বোয়ালের মুখ দিয়ে কথা বার হয় না।

—তুমি প্রত্যেক দিন লোক ঠকাও, আমরা ঠকাব তোমাকে?

রাঘব বোয়ালের বড় ছেলে কেষ্টর কাছে এগিয়ে আসে, বাজে গোল-মাল বাড়ির ভেতর করবেন না, রোজ এসে যে টাকা নিয়ে গেছেন তার কি করেছেন জবাব দিন।

—ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ করেছি। কে জান্‌ত আপনার বাবাকে? চার দিকে তার নাম ছড়িয়ে দিয়েছি, এতগুলো মিটিং ডেকেছি, নিজের চোখেই তো দেখেছেন।

—এত করলেন কিন্তু বাক্সে ভোট পড়ল না কেন?

—দেশের লোক আর গাধা নেই বলে। তারা মানুষ চিনতে শিখেছে। ভোট দিয়েছে একজন প্রফেসারকে, সে এত বিজ্ঞাপনও দেয়নি, লোক ভোলাবার চেষ্টাও করেনি।

রাঘব বোয়াল আর চুপ থাকতে পারেন না, হাঁক দেন, দারোয়ান, রঘু পাঁড়ে—

—দারোয়ানদের বাবাও আমাদের কিছু করতে পারবে না। তবে কেন হেরেছেন, আসল কারণটা জেনে নিন, আমাদের দোষ নয়, নিজের দোষেই। এত দিন ধরে যে সব নিরীহ লোকের উপর অত্যাচার করেছেন তারাই চাবুক মারলে এবার আপনাকে।

একথা বলেই কেষ্ট নিজের দলকে ডাক দেয়, চলে এস সবাই।

ভোঁতনরা এতক্ষণ কাঠ হযে দাঁড়িয়েছিল, সংকেত পেয়ে কেষ্টর সঙ্গে হুড়মুড় কবে বেরিয়ে আসে। হতবাক রাঘব বোয়াল নিষ্ফল আক্রোশে চেযাবে বসে পড়েন। চাকর, দারোয়ানদের আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ছেলেকে বলেন, ওদের সব কাজে যেতে বল, আর ডাক্তারকে একবার খবর পাঠাও।

নির্দিষ্ট জায়গায় পৌছে কেষ্ট দেখে গৌরী দাঁড়িয়ে আছে, পরনে তার সকালের কেনা সেই নীল শাড়ী।

—তুমি অনেকক্ষণ এসেছ?

—আধ ঘণ্টার ওপর।

—একটা কাজে আটকে পড়েছিলাম।

—তাতে কি হয়েছে, আমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত কি দেখছিলাম।

—নতুন শাড়ী পরে বেশ দেখাচ্ছে।

গৌরী চুপ করে থাকে।

—চল, একটু বেড়িয়ে আসি।

কেষ্ট গৌরীকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করে। সাহেবী পাড়ার বড় বড় দোকানের সামনে, যেখানে আলোর মেলা, সেখান দিয়ে হাঁটতে দু'জনেরই ভাল লাগে। কত রকম জিনিস, রং-বেরঙের মূল্যবান সামগ্রী। এক সময় কেষ্ট বলে, কত দামী দামী জিনিস দেখছ?

—বেশ সুন্দর!

—ঐ শাড়ীগুলোর দাম জান?

—কত?

—একশ', দেড়শ', দুশ'।

—বা-বা! কারা পরে?

—যাদের অনেক্ল টাকা আছে।

গৌরী কেষ্টর দিকে তাকায়।

—তাই ত, অনেক দূর হেঁটে এসেছি। বাড়িতে রান্না করেছ?

—না, গিয়ে করব।

—চল, বরং কোন দোকানে ঢুকে খেয়ে নেওয়া যাক।

মিষ্টির দোকানে ঢুকে ওরা কেবিনের মধ্যে গিয়ে বসে। গৌরী বলে, বাঃ, কি সুন্দর জায়গা! এতটুকু ঘর, পাখা ঘুরছে, পাথরের টেবিল—

দোকানের ছোঁড়া চাকর এসে জিজ্ঞেস করে, কি আনব বাবু?

কেষ্টর যা মনে এল দু'চার রকম খাবার বলে দেয়। গৌরীর মন অনেক দিন বাদে বেশ হালকা হয়ে যায়। দু'জনে নানা রকম গল্প করে। গৌরী হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, আপনার বাড়ির কথা যে বলবেন বলেছিলেন।

কেষ্ট হাসে, হ্যাঁ, আমার একটা বাড়ি আছে—

—বলুন—

—ওই তো বললুম, এখনও ভাগ হয়নি। হ'লে আমার হবে নীচে একখানা ঘর, ওপরে একটা, এক ফালি ছাদ।

—তা নয়, বাড়িতে কে আছেন ?

—কেউ নেই।

—সেদিন যে বলছিলেন শ্যামার কথা ?

—ও আমার ভাইঝি।

—তবে কেউ নেই বললেন কেন ?

—ওকে আর আমার কাছে আসতে দেয় না।

—কে ?

—দাদা-বৌদি।

—ওদের ভাল লাগে না।

—দাদা-বৌদির কথা তো বলেন নি ?

—কেন ?

—বড় টাকা-আনা-পয়সার লোক। মনটা এতটুকু ছোট। কেষ্ট আঙুল দিয়ে দেখায়। ইতিমধ্যে খাবার এসে পড়ায় এ প্রসঙ্গ চাপা পড়ে যায়। দু'জনেরই বেশ খিদে পেয়েছিল, তাই ভাল করে খাবারের সদ্ব্যবহার করে। কচুরী, সিঙ্গারা, আরও দু'বার আনিয়ে নিতে হয়।

খাওয়া শেষ হলে দাম চুকিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল।

—তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চল, জোরে বৃষ্টি নামার আগে ট্রামে করে তোমাকে পৌঁছে দিই।

গৌরী জোরে হাঁটতে থাকে। ট্রামে বেশি ভিড় ছিল না, সামনের

দিকে খালি সিটে হু'জনে পাশাপাশি বসে। গৌরী বলে, আজও কিন্তু কাজের কথা হল না।

—সে নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না।

—কত দিন আপনি এরকম টাকা দেবেন ?

—যত দিন তোমার দরকার।

টালীগঞ্জের কাছে এসে ট্রাম থামে, বেশ জোরে বৃষ্টি পড়ছে। হু'জনে নেমে দৌড়ে একটা গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়ায়।

—উঃ, কি বড় ফোঁটা !

—তোমার জামা-কাপড় যে একেবারে ভিজে গেছে !

—আপনি বুঝি শুকনো আছেন ?

—আমার তো ভয় নেই, ভেজা অভ্যেস আছে। দেখ, তোমার আবার জ্বর না হয়।

—আমরা বাঙালদেশের লোক, জলেই মানুষ। ঐ যে ট্রাম আসছে, আপনি চলে যান।

—বেশ, তুমি তাহলে বাড়িতে যাও।

কেষ্ট ট্রাম-স্টপেজে আসে। সেখানে রাজেনের সঙ্গে দেখা, একেবারে ভিজে গেছেন যে কেষ্টবাবু !

—হঠাৎ বৃষ্টি এল।

—গৌরী কোথায় গেল ?

—বাড়ি গেছে।

প্রথম ট্রামটা এক রকম না থেমেই চলে যায়। অগত্যা কেষ্ট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাজেনের সঙ্গে আলাপ করে। রাজেন জিজ্ঞেস করে, আপনারা তো ভবানীপুরে মিষ্টির দোকানে গিয়েছিলেন, না ?

—হ্যাঁ, তুমি ও-পাড়ায় ছিলে বুঝি ?

—বাজারের কাছেই ছিলাম, দেখলাম আপনারা ঢুকলেন।

—তুমি এলে না কেন?

—কাজ ছিল। কিন্তু শাড়ী কিনে আপনি ঠকে গেছেন।

—কেন?

—ও দোকানগুলোতে দামের ঠিক থাকে না। আরও আট আনা, দশ আনা কমে পাওয়া যেত।

দ্বিতীয় ট্রাম এসে পড়ে।

—আজ চলি ভাই, আর একদিন আসব।

কেষ্ট ট্রামে উঠে পড়ে।

যদিও প্রভাত সম্পাদককে ভরসা দিয়েছিল কিছু টাকা যোগাড় করে দেবে বলে, কিন্তু কোথাও তেমন সুবিধে করে উঠতে পারে না। তাই 'সবুজ ঘাসের' ট্রেড-শো দেখতে এসে বেলারাণীর সঙ্গে দেখা হতেই সে ঐ কথার অবতারণা করে।

—আপনাকে একটা কথা বলার আছে।

বেলারাণী হেসে জিজ্ঞেস করে, কি ব্যাপার? আবার প্রশ্নোত্তর না কি?

—না, আমাদের পত্রিকা সম্বন্ধে।

—কি হয়েছে?

প্রভাত আমতা-আমতা করে, মানে একটু মুস্কিল হয়েছে, সম্পাদকের নামে ওয়ারেণ্ট এসেছে। হয় জেল, নয় ফাইন।

—হঠাৎ!

—হঠাৎ আর কি, একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল, ওরা বলেছে অশ্লীল।

বেলারাণী অবাক হয়, এমন লেখা ছাপালেন কেন?

—আমি তো আর ছাপাই নি, সব ঐ সম্পাদকের কাজ। একেবারে আকাট মুখ্যু, ইংরিজি থেকে অনুবাদ করেছে—

—তাই তো ভাবনার কথা!

প্রভাত আস্তে আস্তে বলে, প্রায় পাঁচশো টাকার দরকার। জানেনই তো কাগজের অবস্থা, কোথা থেকে যে এত টাকা দেবে—

—পাঁচশো! সে তো অনেক টাকা! এক কাজ করুন, চাঁদা তুলুন। আমি দশ টাকা দেব অখন।

প্রভাত আর এ বিষয়ে কথা বলার উৎসাহ পায় না। বেলারাণী নিজে থেকে জিজ্ঞেস করে—'সবুজ ঘাস' কেমন লাগল?

—তেমন সুবিধের হয়নি।

তখনও অনুষ্ঠান শেষ হয়নি। বেলারাণী বলে, চলুন, আমরা বরং বেরিয়ে পড়ি। ভিড় ভাঙ্গলে বড় দেরি হবে।

—চলুন।

বেলারাণী এগিয়ে গিয়ে এক ভদ্রলোককে ডেকে আনে। আলাপ করিয়ে দেয়, ইনি বিনোদ রায়, অভিনেতা, প্রযোজক, আরও অনেক কিছু। আর ইনি প্রভাতবাবু, বই লেখেন।

কথা বলতে বলতে তারা নীচে নেমে আসে, কর্মকর্তাদের সঙ্গে দু'-চারটে মুখের কথা হয়। বেলারাণী সকলকেই 'বেশ হয়েছে', 'বেশ হয়েছে', ব'লে গাড়ীতে উঠে পড়ে। বিনোদের বড় গাড়ী, নিজে চালায়। সামনের সিটেই তিন জনে বসে পড়ে।

বাড়ি পৌঁছে বেলারাণী প্রভাতকে ছাড়ল না। বললে, আসুন, আমাদের সঙ্গে। কফি খেয়ে যাবেন।

তারা তিন জনে বসবার ঘরে এসে বসে। প্রভাত ভালো করে বিনোদের দিকে তাকিয়ে দেখে। সুশ্রী চেহারা, সিল্কের পাঞ্জাবী, দামী কোঁচান ধুতি! হাতে সিগারেটের টিন, চোখে রোদ্দুরের-চশমা।

প্রভাত প্রশ্ন করে, আপনি কোন্ ছবিতে কাজ করছেন?

বিনোদ উত্তর দেয়, ছবিতে বেশি কাজ করি না, থিয়েটারে অভিনয় করি।

—কোন্ থিয়েটারে?

—অ্যামেচার।

—ওঃ।

—বেলার জন্যে এবার ফিল্ম লাইনে নামছি।

—কোন্ বইতে?

—'নিয়তির পরিহাস'।

—কার লেখা?

বেলারাণী উত্তর দেয, লেখকের নাম প্রভাতবাবু।

প্রভাত বিস্মিত হয়, তার মানে?

—আপনাকে আগেই বলেছিলাম, আমি প্রডাকসান করবো।

—হ্যাঁ, বলেছিলেন বটে।

—তারই প্রথম বই আপনাকে লিখতে হবে।

আনন্দে প্রভাতের চোখ-মুখ নেচে ওঠে, এতক্ষণ বলেননি একথা, নাম কে ঠিক করলে?

—আমি।

—চমৎকার নাম দিয়েছেন, পোস্টার পড়লেই লোকের ভিড় হবে।

—খুব ভালো করে লিখতে হবে প্রভাতবাবু!

—কিন্তু প্লটটা তো এখনও বললেন না?

বেলারাণী মিষ্টি করে হাসে, পরে বলবো। এখন থেকে প্রায়ই আসতে হবে আপনাকে, সিনারিও লেখা তো সোজা কথা নয়।

—ও নিয়ে আপনি ভাববেন না, একেবারে ফার্স্ট ক্লাস করে দেবো। তা ছাড়া হাতে সময়ও অনেক, পত্রিকাই যখন উঠে গেল।

বিনোদ এতক্ষণ এদের কথা শুনছিল, কফির পেয়ালায় শেষ

চুমুক দিয়ে বলে, বেলা, তোমার সঙ্গে দরকারী কথাটা সেরে নিই।

বেলারাণী উত্তর দেয়, তাড়া কি, হবে এখন।

প্রভাত বোঝে, তারই জন্যে এরা কথা বলতে পারছে না। উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় চায়, আমায় মাপ করবেন, এবার চলি।

—এখনি উঠবেন?

—আজ চলি, কাল বরং আসবো, বলে নমস্কার করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

বিনোদ উঠে গিয়ে বেলারাণীর সঙ্গে এক সোফায় বসে।

—কই, এ ভদ্রলোকের কথা তো আগে বলনি?

বেলারাণী অন্যমনস্ক ভাবে বলে, মনে ছিল না। দেখা হতে ভাবলাম, একে দিয়ে লেখালেই হবে।

—টাকা নেবে তো?

—কত আর? শ'তিনেক টাকা।

—মাত্র?

—আবার কি। লোকটি ভাল, তবে বুদ্ধি কম। দেখলেই তো বুঝতে পারো—

—আশ্চর্য, সবাইকেই তুমি বোকা মনে কর?

বেলারাণী ফুলদানীর ফুলগুলো সাজিয়ে রাখে।

—কি দরকারী কথা বলছিলে?

—আমায় কত টাকা দিতে হবে?

—যা বলেছিলে—

—ঠিক তো তার বেশি কিন্তু দিতে পারব না।

বেলারাণী হাসে, দিলেও নোবো না। যত কমে সম্ভব বই তুলতে হবে, দেখছো তো বাজার?

—পরিচালক ঠিক করেছ ?

—প্রমোদ।

—প্রমোদ ? কি বলছো, ও যে একেবারে অনাড়ী।

—তাতে কি হয়েছে, সাড়ে সাত শো'র পুরো বই ! চল্লিশ দিনের মামলা।

—একটু রিস্কি হয়ে যাচ্ছে। গম্ভীর হয়ে মন্তব্য করে।

—মোটেই না। লোক আসবে বেলারাণীকে দেখতে, পরিচালককেও নয়, লেখককেও নয়।

বিনোদ কি বলতে যাচ্ছিল, বেলারাণী থামিয়ে দিয়ে বলে, ওপরে চল বিনোদ। দেরি হয়ে গেল, আমি চান করে নিই।

বেলারাণীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রভাত হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে চলে। নিজেকে তার খুব হাল্কা মনে হয়। এতদিন বাদে অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ সিনেমার গল্প লেখার সুযোগ পেয়ে বেলারাণীকে মনে মনে ধন্যবাদ জানায়। এই সুখবরটি অরুণাকে না জানিয়ে বাড়ি ফিরতে তার ইচ্ছে করে না। অরুণা প্রভাতের ছাত্রী, প্রাইভেটে তিনবার ম্যাট্রিক ফেল করে এ বছর পাস করেছে। আগের দু' বছর অন্য মাস্টার ছিল, বার বার ফেল করায় তাদের তাড়িয়ে প্রভাতকে আনা হয়। আশ্চর্য প্রভাতের কপাল, অরুণা পাস করল ! এমন কি, থার্ড ডিভিশানে নয়, সেকেণ্ড ডিভিশানে। অরুণার বাবা বলেছিলেন, আপনার বাহাদুরী আছে, অরুণা যে পাস করবে আমি ভাবিনি, তাই ত বিয়ের সম্বন্ধ করছিলাম।

প্রভাত অমায়িক হেসে উত্তর দিয়েছিল, মেয়ে আপনার খুব শার্প, ঠিক কোচিং পায়নি বলেই—

—তা তো বুঝতেই পারছি। যাই হোক, ও যতদিন পড়াশুনা করবে আপনাকে ভার নিতে হবে।

বলা বাহুল্য, প্রভাত এ কথায় সম্মতি দিয়েছিল। অরুণা সকালে কলেজে পড়ে বিকেলে প্রভাতের কাছে।

আজ প্রভাত যখন অরুণার বাড়িতে এল, তখন প্রায় দুটো বাজে। উঠানে ঝি বাসন মাজছিল, প্রভাত ডেকে বলে, দিদিমণিকে একবার খবর দাও।

বাইরের ঘরে বসতেই সে শুনতে পায়, ঝি অরুণাকে চেঁচিয়ে ডাকছে। মিনিট দুয়েকের মধ্যে অরুণা নেমে এল। প্রভাতকে দেখে চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করে, এ কি, এখন যে?

—বস, একটা খবর আছে।

—কিসের?

—আমার গল্প সিনেমায় উঠবে।

—সত্যি, কোন্ গল্প?

—'নিয়তির পরিহাস'।

অরুণা হাততালি দেয়, কি মজা, আমাদের পাশ দেবেন তো? সবাই গিয়ে ছবি দেখে আসব। বাবা এমনিতে ছবি দেখে না, কিন্তু আপনার বই হলে নিশ্চয় যাবে। যাই, মাকে বলে আসি।

প্রভাত বাধা দেয়, আহা বোস না, সব কথা শোন।

অরুণা বসে পড়ে, তাই তো আপনার কথাই শুনছি না, এবার বলুন।

—আজই সকালে ঠিক হ'ল, প্রথমেই তোমাকে খবর দিতে এলাম।

অরুণা কপট রাগের ভান করে বলে, আমাকে দেবেন না তো কা'কে দেবেন শুনি? আপনার সেই খেঁদীকে?

—আহা, তার কথা আনছ কেন?

—একশ বার আনব। আমি বরাবর দেখেছি আমার সঙ্গে কথা বলতে গেলেই আপনার খেঁদীর কথা মনে পড়ে, তার মত চালাক ছাত্রী আর পাননি। কিন্তু আহা, বিয়ের সময় আপনাকে একটা চিঠিও দিল না!

প্রভাত মনে মনে বিরক্ত হয়, কি কথা বলতে এলাম আর তুমি কি শুরু করলে বল ত?

অরুণা প্রভাতের মুখটা দেখে নিয়ে বলে, রাগ করছেন বুঝি? আচ্ছা, আর একটি কথাও বলব না। এবার বলুন—

—তোমাকে বেলারাণীর কথা বলেছিলাম, ওরাই বই তুলছে। আমার লেখা উনি খুব ভালবাসেন কি না, তাই আমাকে দিয়েই—

অরুণা এতক্ষণ কোন কথাই শোনে নি, হঠাৎ প্রভাতকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করে, একটা কথা বলব?

—কি কথা?

—রাগ করবেন না?

—বল না?

—বেলারাণীর রংটা খুব ফর্সা? ছবিতে যেমন দেখায়?

—না, শ্যামবর্ণ।

—ওঁর বাঁ গালে একটা 'বিউটী স্পট' আছে, না?

প্রভাত আবার বিরক্ত হয়, আমি অত দেখি নি।

অরুণা হাসে, চোখে-মুখে তার দুষ্টুমি-ভরা, হ্যাঁ, দেখেন নি আবার। আমার কাছে অত সাধু সাজতে হবে না।

—কি মুস্কিল, যা বলি তাই নিয়েই ঝগড়া—

—ঝগড়া তো করি নি। আমাকে একদিন বেলারাণীর কাছে নিয়ে চলুন না?

—সেখানে কি করবে?

—বেশ আলাপ সালাপ করে আসব, কলেজের মেয়েরা সব অবাক হয়ে যাবে।

প্রভাত এবার উঠে পড়ে, আমি তাহলে চলি, আজ আর সন্ধ্যেবেলা আসব না, একেবারে কালকে।

অরুণা বিস্ময় প্রকাশ করে, আশ্চর্য লোক, এলেনই বা কেন, যাচ্ছেনই বা কেন ?

প্রভাত গজ-গজ করে, বললেই বা শুনছে কে ? আমি চললাম।

অরুণা ধমকে ওঠে, যান দেখি কেমন যেতে পারেন ? বসুন ঐ চেয়ারে, আমি মিষ্টি জল নিয়ে আসছি।

—আমার দেরি হয়ে যাবে !

—হোক্ গে, কি এমন রাজকার্য পড়ে আছে শুনি ? যতক্ষণ না আসছি, পত্রিকাটা পড়ুন।

অরুণা আদেশ জারী করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। প্রভাত ভাল-মানুষের মত বসে পত্রিকার পাতা ওল্টাতে থাকে।

চুণীলাল শ্যামলের সঙ্গে দেবেনদার আলাপ করিয়ে দেবার পর থেকে শ্যামল প্রায়ই দেবেনদার বাড়ি যায়। খিদিরপুরের এক প্রান্তে দু'খানা ঘর নিয়ে ওঁর বাসা। দেবেনদাকে শ্যামলের অদ্ভুত লাগে। দেশের জন্যে উনি অনেক ত্যাগ করেছেন, সে সব কথা বলতে বলতে ওঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আবার কত সময় ছেলেমানুষের মত কেঁদে ফেলেন। শ্যামল চুপটি করে শোনে। সেদিনও তিনি বলছিলেন, লেখাপড়া কর শ্যামল, ভাল করে লেখাপড়া কর। জ্ঞান না হলে সত্যিকারের কাজ করা যায় না।

শ্যামল কোন কথা বলে না, জানে, দেবেনদা শুধু বলতেই ভালবাসেন।

—আমরা কলেজ ছেড়েছি অসহযোগ আন্দোলনের সময়, কিন্তু পড়া ছাড়িনি। জেলে, কি বাইরে, সব সময় এন্তার বই পড়েছি—দেশী, বিদেশী যা পেয়েছি। এখনও কত কবিতা আমার মুখস্থ। একটু থেমে আবার বলেন, কিন্তু ভুল করেছি, সারা জীবন ধরেই ভুল করলাম। দেশের জন্যে সব ছেড়েছি, বাড়ি ঘর, সমাজ, কিন্তু কি লাভ হল ?

শ্যামল আস্তে আস্তে বলে, কেন দেশ স্বাধীন হয়েছে, আপনাদের মত লোক না থাকলে—

দেবেনদা হাসেন, স্বাধীনতা তো কাগজে-কলমে। যাদের জন্মে প্রাণপণ করে খাটলাম তাদের কিছুই হল না। না পেলে তারা খেতে, না শিখল তারা লেখাপড়া—

—হবে আস্তে আস্তে।

—আর হবে, বিশ্বাস হারিয়েছি। যে-পার্টির জন্মে হাজার হাজার যুবক সেদিন প্রাণ দিয়েছে আজ সে-পার্টির কি অবস্থা! এক-জনও সত্যিকারের মানুষ সেখানে নেই। যারা কোন দিন দেশের কথা ভাবেনি, এতটুকু ত্যাগ করেনি, সেদিনকার সবচেয়ে বড় স্বার্থপর যারা, তারাই টাকার জোরে আজ পার্টির হোমরা-চোমরা হয়ে বসেছে! আমাদের মত লোকের সেখানে আর স্থান নেই।

কথা বলতে বলতে দেবেনদার চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠে, উত্তেজনায় চেঁচিয়ে ওঠেন, ভেঙ্গে যাবে, সব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। এত বড় মিথ্যে কিছুতেই টিকে থাকতে পারে না।

শ্যামল এইসব কথার কিছুই বুঝতে পারে না। তবে এইটুকু সে জানে, দেবেনদা যা কিছু বলেন, তার পেছনে লুকোন আছে একটি আঘাত-পাওয়া ব্যথিত হৃদয়। তাঁর চিন্তান্বিত মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে এক সময় বলে, দেবেনদা, কালী একবার যেতে বলেছে।

—যেও, ঐ এখন আমার ডান হাত।

বাইরে থেকে কালীকে দেখে শ্যামলের মনে হয়েছিল লোকটা ভাল নয়, কিন্তু কাছে এসে আলাপ হতে তার মত বদলে যায়। উত্তর-কলকাতার এক অখ্যাত গলিতে তার আস্তানা। শুধু-গায়ে লুঙ্গী পরে বসে থাকে। মাথার চুল এত পাতলা যে কালো টাক পরিষ্কার দেখা

যায়। নামের সঙ্গে চেহারার অবিকল মিল। গা দিয়ে জল গড়ালে কালীর মতই দেখায়।

শ্যামল দরজায় কড়া নাড়তে কালী নিজে এসে দরজা খোলে, এস ভেতরে।

দরজা বন্ধ করে শ্যামলকে ঘরের ভেতর নিয়ে যায়। ছোট্ট ঘর, আসবাব নেই বললেই চলে। মাদুরের ওপর বসে শ্যামলের হাতে হাত-পাখাটা ধরিয়ে দেয়, বড় গরম, একটু হাওয়া কর।

শ্যামল এ ধরনের আতিথ্যে বিস্মিত হলেও, কালীর কথামত তাকে বাতাস করে। কালী পালক দিয়ে কানে সুড়সুড়ি দিতে দিতে চোখ বুজেই জিজ্ঞেস করে, বয়স কত?

—ষোল।

—বাবা-মা কত দিন মারা গেছেন?

প্রশ্ন শুনে চমকে ওঠে। তবু উত্তর দেয়, মা মারা গেছেন ছোট-বেলায়, বাবা আছেন।

—ভাই-বোন অনেকগুলি বুঝি?

—আমি একা।

কালী এক চোখ খুলে দেখে, এ লাইনে ক'দ্দিন?

শ্যামল ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করে, এই পার্টিতে?

—পার্টি-ফার্টি নয়, এখন কি করছ?

—কিছুই করি না।

কালী দু'হাত দিয়ে মুখটা রগড়ায়, কি পারো?

শ্যামল আশ্চর্য হয়, কি রকম বলুন?

—পকেট মারতে পার?

শ্যামল স্তব্ধ হয়ে যায়, অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, চেষ্টা করিনি।

—মিথ্যে কথা বলতে পারো?

শ্যামল এবার সহজ গলায় উত্তর দেয়, পারি।

কালী এবার দু'চোখ খুলে ভাল করে তাকায়, হঠাৎ শ্যামলের পিঠ চাপড়ে বলে, বাঃ, তুই ঠিক পারবি।

কালীর কাছে বাহবা পেয়ে সলজ্জ হাসিতে শ্যামলের মুখ ভরে ওঠে। কালী জিজ্ঞেস করে, বড় বড় বাড়ির সামনে পেতলের নেমপ্লেট থাকে দেখেছিস ?

—হ্যাঁ।

—কাল দুটো খুলে আনবি। আমার কাছে তালিম নিতে হলে প্রথমে নজরানা দিতে হয়।

—কাল কখন আসব ?

—এই সময়েই।

শ্যামল চলে যাচ্ছিল, কালী ডেকে বলে, স্ক্রু ড্রাইভার আছে ?

—না।

—ঐ কোণ থেকে দুটো নিয়ে যা।

শ্যামল যন্ত্র নিয়ে কালীর বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ে।

গৌরীর সঙ্গে জলে ভিজে থেকে অবধি কেষ্টর শরীর ভাল নেই। সারা শরীরে ব্যথা, জ্বর, অরুচি। অনেকগুলো উপসর্গ একসঙ্গে দেখা দিয়েছে। কিন্তু সকলের চাইতে কষ্ট দরকারের সময় হাতের কাছে এক গ্লাস জল এগিয়ে দেবার লোক নেই বলে। তবু এরই মধ্যে বাপ-মায়ের নিষেধ অগ্রাহ্য করে শ্যামা এসেছিল। ঘুম ভাঙতে কেষ্ট দেখে, বার্লির গেলাস নিয়ে শ্যামা বলছে, কাকু, এটা খেয়ে নাও।

কেষ্ট সে-কথা না শুনে প্রশ্ন করে, ওপরে এসেছিস যে, বাবা বকবে না ?

—বাবা নেই, অফিসে গেছেন।

—এখন ক'টা বাজে ?

—দুটো বেজে গেছে। কষ্ট হচ্ছে কাকু ?

কেষ্ট চিন্তিত মুখে বলে, ওপরে এসে ভাল করিস নি, তোর বাবা শুনলে বকবে, নীচে যা—

—তোমার যে জ্বর হয়েছে কাকু, ডাক্তারবাবুকে খবর পাঠাব ?

—না, আর একদিন শুয়ে থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে, তুই এখন যা।

শ্যামা কেষ্টর কথামত বার্লির গেলাস রেখে নীচে চলে গেল বটে, কিন্তু সুযোগ পেলেই ওপরে আসে, দরকারী জিনিসপত্র কাকার হাতের কাছে এগিয়ে দেয়।

এরই মধ্যে একদিন বিপত্তির সৃষ্টি হল, শ্যামার ছোট ভাই দিদির ওপর রেগে বাবাকে বলে দিলে, দিদি তোমার কথা শোনে না, খালি খালি ওপরে যায়।

বলরাম সবে অফিস থেকে ফিরছিল, কথা শুনেই মাথায় তার আগুন জ্বলে ওঠে, ডাক দিদিকে।

শ্যামা আসতেই বলরাম সজোরে কান মলে দেয়, বাঁদর মেয়ে, ওপরে কি করতে যাও ?

শ্যামা থতমত খেয়ে যায়, চোখের জল সামলে ধরাগলায় বলে, কাকুর, কাকুর অসুখ করেছে—

বলরাম চিৎকার করে ওঠে, বেশ হয়েছে। ও মরুক, বাঁচুক, তোর তাতে কি ? ওপরে যেতে বারণ করেছি ব্যস, আর কোন কথা শুনতে চাই না।

চেঁচামেচি শুনে শ্যামার মা ছুটে এসেছিল, আহা, একটু বার্লি দিয়ে এসেছে তা অত মারধোর করার কি আছে ?

—মেয়েকে অমন আস্কারা দিও না, বাপের অবাধ্য হওয়া—

শ্যামার মা সুর পাল্টায়, আর তোকেও বলি মেয়ে, নিজের বাপকে তো চিনিস, গোলমাল করিস কেন ?

—এর পর থেকে আমি সব কিছুর জন্যে তোমাকে দায়ী করব, কোন রকম ন্যাকামী আমি পছন্দ করি না।

বলরাম গজ-গজ করতে করতে কলতলায় চলে যায়।

ঠিক এই সময় শ্যামল এসে দরজা ঠেলে। শ্যামার মা বলে, খোকা, দেখ তো কে এল?

খোকন ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দেয়, শ্যামার মা চেঁচিয়ে বলে, জিজ্ঞেস কর কাকে চাইছেন।

খোকনের পুনরুক্তির আগেই শ্যামল উত্তর দেয়, কেষ্টদা আছেন?

খোকন বলে, ওপরে।

শ্যামল দরজা পার হয়ে উঠোনে এসে দাঁড়ায়, শ্যামা বলে ফেলে, কাকুর যে জ্বর।

—একবার বলুন, আমি দেখা করতে চাই, আমার নাম শ্যামল।

সঙ্গে সঙ্গে কেষ্টর গলা শোনা যায়, ওপরে এস, শ্যামল। আমি শুযে আছি।

শ্যামল ওপবে উঠে গিয়ে কেষ্টর বিছানার একধারে বসে পড়ে, কত দিন জ্বর হয়েছে কেষ্টদা?

—ক'দিনই তো—

—আমরা তাই ভাবছি, আপনি আসছেন না কেন। এখন কত জ্বর?

—বেশি নয়, কাল-পরশু খুব বেড়েছিল। দুর্বল করে দিয়েছে বেশ,—কেষ্ট বালিসে ভর দিয়ে উঠে বসে, শ্যামল দেখ তো বাইরে ছাদে বোধ হয় জল আছে, আর ঐ গামছাটা দাও, মুখটা ধুয়ে ফেলি।

মুখ ধুয়ে কেষ্ট অনেকটা সুস্থ বোধ করে। দুটো বিস্কুট আর বার্লি খেয়ে বলে, বেশ ভাল লাগছে এখন।

শ্যামল নিজের থেকেই বলে, টাকার দরকার আছে কেষ্টদা ?

—কেন ?

—আপনার ভাগের অনেকগুলো টাকা আমার কাছে রয়েছে।

—দরকার হলে পরে নেব।

শ্যামল জিজ্ঞেস করে, জানেন, প্রভাতদার বই ছবিতে উঠছে ?

—প্রভাতের ? আমাদের প্রভাত ?

—হ্যাঁ।

—কি বই ?

—নামটা ভুলে গেছি। খুব শক্ত নাম।

—ভাল কথা, প্রভাতের সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয়নি।

—বেলারাণী পার্ট করবে।

—তাই না কি ?

—খুব ভিড় হবে, না কেষ্টদা ?

—ভাল বই হলে হবে নিশ্চয়।

কেষ্টর সঙ্গে শ্যামলের অনেক কথা হয়, কিন্তু সে দেবেনদার বিষয় কিছুই বলে না। কথার ফাঁকে এক সময় জিজ্ঞেস করে, আপনি কবে থেকে বেরুতে পারবেন মনে হচ্ছে ?

—কাল কিংবা পরশু।

—আমি অনন্ত-কেবিনে থাকব, যদি আপনাকে না পাই, এখানে এসে খবর নেব।

—সেই ভাল, আশুদাকে আমার কথা বোল।

—আশুদাই তো আমাকে পাঠালেন, আপনি না গেলে আশুদার মন খারাপ হয়ে যায়।

—আশুদা বড় ভাল লোক।

—আমি তাহলে এখন আসি কেষ্টদা, শ্যামল নীচে নেমে যায়।

ক'দিন থেকেই মদন বড় একলা পড়ে গেছে। শ্যামল আজকাল আর আগের মত আসে না। স্কুল পালিয়ে পার্কে, কিংবা আড্ডা-সংঘের বৈঠকে যেমন শ্যামলের সঙ্গে আগে দেখা হত, দৈনন্দিন কাজকর্মের খুঁটি-নাটি আলোচনা হত, এখন আর তা সম্ভব হয় না। সব সময়েই ব্যস্ততার ভাব দেখিয়ে শ্যামল বলে, চলি ভাই, দেবেনদার কাছে যেতে হবে।

মদন কত সময় বিরক্ত হয়ে বলেছে, কি দেবেনদা দেবেনদা করিস, এ যে কেষ্টদার বাড়া হয়ে উঠল।

—এ অন্য ব্যাপার, না মিশলে বুঝবি না।

—আমি একলা একলা কি করব?

—কি আবার করবি, ইস্কুল যাবি, বাড়ির কাজ করবি, গলায় সোনার হার পরে বসে থাকবি।

—ক'দ্দিন ছবি দেখিনি, চল না একটা—

—বলছি তো সময় নেই, দেবেনদা ছাড়া কালীর কাছে তালিম নিতে হবে।

—কালীকে নাম ধরে ডাকিস্?

—দাদা বললে চটে যায়।

—জাহান্নামে যা, আমার কি, পরে ভুগবি।

শ্যামল একথা গ্রাহ্য করে না। আড্ডা-সংঘের অন্য কারো সঙ্গে মদনের তেমন বনে না। শ্যামলের পরে মাত্র একজন যাকে সে ভালোবাসে সে মন্টুদা। আজ বাড়ি থেকে বেরিয়ে মোড়ের মাথায় মন্টুদার সঙ্গে দেখা, দু'-তিন দিন না কামানোর ফলে মুখময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পরনে ময়লা পাঞ্জাবী। মদনকে দেখে ম্লান হেসে জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাচ্ছ?

—কোথাও যাইনি, এমনি।

—বস, তোমার সঙ্গে একটু কথা বলি।

মদন বোঝে মনুদা এতক্ষণ কথা বলার লোক খুঁজছিল, তাকে পেয়ে সত্যি খুশি হয়েছে, বলে, মনুদা আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে, শরীর খারাপ হয়নি তো ?

—শরীরের আর দোষ কি ভাই, কত আর সইবে!

—আপনি একটুতে বড় মুষড়ে পড়েন, কি এমন হয়েছে বলুন তো ?

—তুমি জানি না মদন, নন্দিতার বাবা পরশু আমাদের বাড়ি গিয়েছিলেন। নন্দিতাকে লেখা আমার চিঠি দেখিয়ে শাসিয়ে এসেছেন, পুলিসে নালিশ করবেন বলে।

—সে কি, তার পর ?

—আমাকে বললেন, তুমি কেন এসব চিঠি দাও, আমার মেয়ে [illegible] তোমায় লিখেছে ? আমি কিছু উত্তর দিইনি! পুলিসেও যদি দেয়, আমি কোনদিন বলব না যে নন্দিতাও চিঠি দেয়।

—কিন্তু উনি কি করে চিঠিটা পেলেন ?

—জানি না। কোনদিন জানতে চাইবোও না, যদি না নন্দিতা নিজে থেকে বলে।

ঠিক এই সময় নন্দিতা এসে তাদের বাড়ির দোতলার ছোট রেলিঙ ধরে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। মনুদা পেছন ফিরে মদনের সঙ্গে কথা বলছিল, তাই মদন ইসারা করে, মনুদা, ওই যে—

মনুদা ফিরে তাকিয়ে নিষ্পলক দৃষ্টিতে নন্দিতার দিকে চেয়ে থাকে। মদন মাথা হেঁট করে। মাঝে মাঝে আড়চোখে মনুদার দিকে তাকায়, দেখে তার মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। হঠাৎ মনুদা তার পিঠ চাপড়ে বলে, চল মদন, তোমাকে কিছু খাওয়াই।

মদন আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে, কি ব্যাপার মনুদা ?

—নন্দিতা আমায় সত্যিই ভালবাসে, আর কোন সন্দেহ নেই।

কেষ্ট যদিও শ্যামলকে বলেছিল সুস্থ হয়েই অনন্ত-কেবিনে আসবে, কিন্তু পরদিন বাড়ি থেকে প্রথম বেরিয়ে সোজা গেল টালীগঞ্জের বস্তীতে গৌরীর কাছে। এ কদিন বার বার তার গৌরীর কথা মনে পড়েছে, অসুখের মধ্যে এমন অসহায় অবস্থায় না পড়লে সে যেমন করে হোক একটা খবর পাঠাতো। ট্রাম-স্টপেজ থেকে হেঁটে গৌরীদের বস্তী পর্যন্ত যেতে কেষ্টর বেশ কষ্ট হয়। দু' জায়গায় দাঁড়িয়ে একটু জিরিয়ে নেয়।

বস্তীর মুখে একটা ছোট ছেলেকে দেখে জিজ্ঞেস করে, গৌরী আছে?

—আছে বোধ হয়, বলে ছেলেটি চলে গেল। কেষ্ট অবাক হয়, আগেও ছেলেটিকে দেখেছে, কেষ্ট আসলে সে লাফাতে লাফাতে গিয়ে গৌরীকে ডেকে আনত। এক বৃদ্ধ দাওয়ার ওপর বসে হুঁকো টানছিলেন, কেষ্ট তাঁকেই জিজ্ঞেস করে, গৌরী আছে?

বৃদ্ধ ব্যাজার মুখে উত্তর দেন, কি করে জানব, কলকাতার শহরে দেখছি সোমথ মেয়েরা ঘরে থাকে না।

এ ধরনের উত্তর কেষ্ট আশা করেনি, গৌরীর ভাইকে পোড়াতে যাওয়ার পর থেকে এ বস্তীর সকলেই তাকে ভালবাসতো, এলেই দুটো কথা বলতো। আজ হঠাৎ যেন সব পাল্টে গেল। আর কোন কথা না বলে কেষ্ট সোজা গৌরীর ঘরের সামনে এসে হাজির হল। দরজা খোলা, গৌরী সেলাই করছিল, কেষ্টকে দেখে চমকে ওঠে, কেষ্টদা—

—কি হয়েছে গৌরী, ওরকম করছ কেন?

গৌরী কোন কথা বলতে পারে না, দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে আসে।

—কি হয়েছে গৌরী, আজ সব কেমন অদ্ভুত লাগছে! কেউ ভাল

করে কথা বলছে না, তুমি কাঁদছ ? গৌরী নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, এতদিন আপনি কোথায় ছিলেন ?

—বাড়িতে।

—ওঃ, গৌরী দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

—কি ভাবছ ?

—ভাবিনি। তবে আজ এলেন কেন ?

—তাতে কোন দোষ হয়েছে ?

—আপনি বাড়ি যান। গৌরী উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

তার দিকে তাকিয়ে কেষ্ট আস্তে আস্তে বলে, সেদিন রাত্রিতে বৃষ্টিতে ভিজে খুব জ্বর হয়েছিল, এতদিন বিছানায় পড়ে ছিলাম, বাড়ি থেকে এক পা বেরুতে পারিনি। আজ প্রথম বেরিয়েই তোমার খবর নিতে এসেছি। একটু থেমে বলে, এখনও বেশ দুর্বল, পা কাঁপছে।

গৌরীর এতক্ষণে খেয়াল হয় এখনও সে কেষ্টকে বসতে বলেনি। উঠে দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছে বলে, এইখানে বসুন।

কেষ্ট গৌরীর পরিত্যক্ত জায়গায় বসে পড়ে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিজে থেকেই কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে, বল ?

—বলব, পরে।

—কখন ?

—এখানে নয়, সবাই কান পেতে আছে।

—কি বলছো ?

গৌরী চারদিক দেখে নিয়ে নীচু গলায় বলে, ঠিকই বলছি, আমাকে-আপনাকে নিয়ে—

—কথা উঠেছে ?

—হ্যাঁ, রাজেন লাগিয়েছে।

—রাজেন ? কেষ্ট গুম হয়ে যায়, ঠিক বলছো ?

—সে অনেক কথা, আমি না কি ভালো মেয়ে নই, আপনার সঙ্গে—। গৌরী ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে।

কেষ্ট স্থির গলায় প্রশ্ন করে, তুমিও কি চাও আমি চলে যাই?

সে-কথার সোজা উত্তর না দিয়ে গৌরী বলে, আমার যে আর কেউ নেই!

—দরকার হলে আমার সঙ্গে যাবে?

গৌরী মুখ তুলে তাকায়, কোথায়?

—জানি না, তবে চেষ্টা করব যাতে তুমি বাঁচতে পারো।

গৌরী চুপ করে থাকে।

—কি বল?

—হঠাৎ কি বলা যায়?

—আমি চললাম, তুমি ভেবে-চিন্তে জানিও।

কেষ্ট ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, গৌরী ডুকরে কেঁদে ওঠে, এরা আমাকে বাঁচতে দেবে না, কেষ্টদা।

কেষ্ট সংযত কণ্ঠে উত্তর দেয়, তুমি শান্ত হয়ে ভাবো, যা ভালো বুঝবে, আমি সেই ব্যবস্থাই করে দেব।

আর কথা না বাড়িয়ে কেষ্ট ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। মুখোমুখি রাজেনের সঙ্গে দেখা, এতক্ষণ সে বাইরে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনছিল। রাজেন খেঁকিয়ে ওঠে, এতক্ষণ কি ফুসমন্তর দেওয়া হচ্ছিল?

কেষ্টর কান লাল হয়ে যায়। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে হাসবার চেষ্টা করে, সবই তো শুনেছো।

—ছি ছি, ভদ্দরলোক ভেবেছিলাম, কেষ্টদা বলে ডেকেছিলাম, শেষে কি না—

—কি?

—একটা অসহায় মেয়েকে টাকার লোভ দেখিয়ে—

—বাজে বোক না, থাবড়ে মুখ লাল করে দেব।

রাজেন ছেড়ে কথা বলার পাত্র নয়, চেঁচিয়ে ওঠে, কার কাছে মেজাজ গরম করছেন, আপনার মত কলকাত্তাই বাবু ঢের দেখেছি। পেটে এক, মুখে এক—

রাগে কেষ্ট কাঁপছিল। ঠাস করে রাজেনের গালে এক চড় মারে। আচমকা আঘাতে রাজেন প্রথমটা ভড়কে গিয়েছিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই বাঘের মত কেষ্টর ওপর লাফিয়ে পড়ে। শরীর দুর্বল না থাকলে কেষ্ট হয়ত কিছুক্ষণ যুঝতে পারত। কিন্তু বলিষ্ঠ রাজেন তাকে এক ধাক্কায় মাটিতে ফেলে অমানুষিক প্রহার করতে থাকে। ইতিমধ্যে চারদিকে লোক জমা হয়ে গেছে, ভিড়ের মধ্যে থেকে কথা শোনা যায়, ছেড়ে দে রাজেন, মরে যাবে যে। কেউ বললে, নাক কেটে যে রক্ত পড়ছে, পুলিস হাঙ্গামায় পড়বি নাকি? সকলেই হৈ-হৈ করছে, গৌরী কোন কথা না বলে এক পাত্র জল নিযে সেখানে ছুটে আসে। রাজেন ততক্ষণে কেষ্টকে ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত চেপে জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে। গৌরী বিনা ভূমিকায় কেষ্টর মাথার কাছে বসে জল দিযে তার মুখের রক্ত ধুয়ে দেয়। গৌরী ভয় পেয়েছিল, হয়তো কেষ্ট অজ্ঞান হয়ে গেছে, কিন্তু তার গর্জানী শুনে একটু আশ্বস্ত হয়। কেষ্ট বিড়-বিড় করে বলে, শরীরটা দুর্বল, তাই বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে, এর শোধ আমি নেব।

রাজেন চিৎকার করে ওঠে, কানে কানে কি বলা হচ্ছে?

কেষ্টর বদলে গৌরীই উত্তর দেয়, রাজেনদা, তুমি ঘরে যাও। ভদ্রলোক অসুস্থ।

রাজেন জ্বলে ওঠে, ভদ্রলোক না চামার। ওর হয়ে আর তোমায় দালালী করতে হবে না।

—কেন মিথ্যে কথা বাড়াচ্ছো, জানো তো সবই। উনি তো আমাদের কোন মন্দ করেন নি?

—ভাল-মন্দ কি তোমার কাছে শিখতে হবে, না, তোমার ঐ বাবুর কাছে?

গৌরী এতক্ষণ পর্যন্ত সংযত ভাবে কথা বলার চেষ্টা করেছে, কিন্তু এবার তার ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, কথা বলতে শিখলে তবে আমার কাছে এসো। যা তা বলতে তোমার মুখে বাধে না?

—যা তা আবার কি? যা সত্যি, তাই বলেছি। অত ঢলাঢলি কিসের? রোজ একসঙ্গে বেড়াচ্ছো, শাড়ী কিনছো, জামা কিনছো, কত ফুর্তি করছো, আমরা কচি খোকা—

অপমানে গৌরীর মুখ কালো হয়ে যায়। ছি, ছি, কি ঘেন্না, কি নোংরা মন তোমার!

এবার অসহায় ভাবে সে অন্যদের দিকে ফিরে তাকায়, কিন্তু কারুর কাছে এতটুকু সহানুভূতি পায় না। বৃদ্ধেরা বললেন, রাজেন তো অন্যায় বলে নি। তুমি আমাদের জ্ঞাতিকন্যা, তোমার ভাল-মন্দ দেখা আমাদের কর্তব্য।

বৃদ্ধারা বললেন, ঢ্যাং-ঢ্যাং করে নেচে বেড়াবেন, তার ওপর চোখা-চোখা বুলি, কে সহ্য করবে।

যুবকেরা বললে, রাজেন ঠিক করেছে, আরও দু'ঘা দিলে হতভাগা আর অন্য মেয়েদের ওপর নজর দিত না।

পণ্ডিতমশাই রায় দিলেন, জীবনে সংযমের দাম অনেক গৌরী, বয়স হলে বুঝতে পারবে।

চাপা কান্নায় গৌরীর দম বন্ধ হয়ে আসে, অসহায় ভাবে কেষ্টর দিকে তাকায়।

কেষ্ট তখন উঠে বসেছে। ক্লান্ত স্বরে গৌরীকে বলে, একটা গাড়ী ডেকে দেবে, বাড়ি যাব।

রাজেন খিঁচিয়ে ওঠে, নিজের পা নেই, যাও না। ও কি করবে—

গৌরী দৃঢ়স্বরে বলে, চলুন, আমি আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসব।

কেষ্টর কোন কথা বলার আগেই রাজেনের দল শাসিয়ে ওঠে, মনে রেখো, ওর সঙ্গে গেলে আর এখানে ঢুকতে পাবে না।

কেষ্ট গৌরীর কাঁধে একটা হাত রেখে সকলকে শুনিয়ে বলে, চল গৌরী, এ নরকে তোমায় এক রাত্রিও ফেলে রেখে আমি শান্তি পাব না।

গৌরী যন্ত্রচালিতার মত কেষ্টর সঙ্গে বস্তী ছেড়ে বেরিয়ে আসে। পেছনে রাজেনের দল তখনও শাসিয়ে যাচ্ছে।

দু'জনে ট্যাক্সীতে পাশাপাশি বসে, কেউ কথা বলে না। দু'জনের মনের মধ্যেই তোলপাড় করছে, গৌরী ভাবছে তার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা। অল্প কদিনের পরিচিত কেষ্টদার উপর সম্পূর্ণ ভরসা করে সে আত্মীয়তার সব বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে চলে এসেছে। কে বলতে পারে এই নতুন পথের শেষ কোথায়? কেষ্টর চোখের সামনে ভাসছে সেই অপ্রীতিকর বস্তীর ঘটনা, সমস্ত শরীর-মন তার আড়ষ্ট হয়ে গেছে। এত দুর্বল যে কোন কিছু চিন্তা করারও শক্তি তার নেই। তাই ট্যাক্সী-ড্রাইভার যখন জিজ্ঞেস করলে, কোন্ দিকে যাবে, কেষ্ট শুধু বাড়ির রাস্তাটা বলে দিয়ে চুপ করে রইল। সারা পথ সে গৌরীকে কোন প্রশ্ন করেনি, শুধু বাড়ির মোড়ে এসে বলেছিল, এখানে নামো, রিক্সা নিতে হবে।

গৌরী তার নির্দেশমত রিক্সায় চেপে বসে।

রিক্সা এসে বাড়ির দরজায় থামলে কেষ্ট নেমে ঠেলা দিয়ে দেখে দরজা খোলা রয়েছে। ভেতরে কাছাকাছি কেউ ছিল না। কেষ্ট গৌরীকে নিয়ে লঘু পায়ে সোজা সিঁড়ি দিয়ে নিজের ঘরে চলে যায়। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে সে প্রথম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। গৌরী আড়ষ্ট

হয়ে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল, কেষ্ট ক্লান্তস্বরে বলে, আমি আর পারছি না গৌরী, একটু শুয়ে পড়ি।

কেষ্ট সত্যি সত্যি বিছানায় নেতিয়ে পড়ে। গৌরী এতক্ষণে তার অদ্ভুত পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে, সব ব্যাপারটাই তার কেমন যেন আশ্চর্য লাগে। মাত্র একঘণ্টা সময়ের মধ্যে জীবনের এ কি বিরাট পরিবর্তন! এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে কেষ্টর সঙ্গে একঘরে রাত কাটাতে হবে তা সে কিছুক্ষণ আগেও কল্পনা করতে পারেনি। চুপ করে কেষ্টর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, দেখে যন্ত্রণায় সে ছটফট করছে। কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে, ঘরে কোন ওষুধ নেই? মৃদু স্বরে কেষ্ট উত্তর দেয়, দেখ তো ওই ছোট বাক্সটায় 'এনাসিন' আছে কি না—

গৌরী বাক্সটাই কেষ্টর কাছে নিয়ে আসে, দু'টো বড়ী সংগ্রহ করে কেষ্ট কোন রকমে গিলে ফেলে আবার শুয়ে পড়ে। অল্পক্ষণের মধ্যে নিশ্চিন্ত আরামে সে ঘুমিয়ে পড়ে।

ক্ষিদে-তেষ্টায় কাতর গৌরী কেষ্টর মাথার কাছে বসে থাকে।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেয়ে অবধি শ্যামা কেষ্টর খাবার ওপরে দিয়ে আসবার জন্যে ছটফট করছিল। বাবা বেরিয়ে যেতেই আর সময় নষ্ট না করে থালা নিয়ে সোজা ওপরে এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকে, কাকু, দরজা খোল, খাঁবার এনেছি।

কেষ্ট তখন ঘুমে অচেতন। গৌরী ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যায়। শ্যামা বার বার দরজায় আঘাত করেও উত্তর না পেয়ে বিচলিত হয়। তার ভাবনা হয় কেষ্টর নিশ্চয় শরীর খুব বেশি খারাপ হয়েছে, তাই ছুটে গিয়ে ছাদের দিকের জানালার খড়খড়ি তুলে ভেতরে উঁকি মারে। গৌরী খড়খড়ি খোলার শব্দে চমকে উঠে দাঁড়ায়। ঘরের মধ্যে এই অপরিচিতা

মেয়েটিকে দেখে শ্যামার বিস্ময়ের সীমা থাকে না। কিন্তু কাকার মাথায় জলপটি দেখে তার স্থির বিশ্বাস হয় কেষ্ট বেহুঁস হয়ে পড়েছে। চিন্তিত মুখে শ্যামা নীচে নেমে আসে। মা জিজ্ঞেস করে, কি রে, খাবারের থালা ফিরিয়ে আনলি যে?

—কাকার খুব অসুখ।

—তাই নাকি, ডাক্তার ডাকতে বললে?

শ্যামা আস্তে আস্তে বলে, আমার সঙ্গে কথা হয়নি।

—তাহলে?

শ্যামা মার কাছে সব কিছু খুলে বলে, জিজ্ঞেস করে, এখন কি করি মা?

মার শঙ্কার চেয়ে কৌতূহল বেড়ে যায়, বলে, চল্ আমিও দেখে আসি।

শ্যামার মা মেয়ের পিছু পিছু উপরে এসে খড়খড়ি তুলে দেখে, কথা মিথ্যে নয়। সত্যিই কেষ্টর শিয়রে একজন অপরিচিতা ভদ্রমহিলা বসে আছে, ঘরের দরজা বন্ধ।

কেষ্টর দাদা বাড়ি ফিরে স্ত্রীর কাছে এ খবর পেয়ে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে, ছিঃ ছিঃ, ভদ্রলোকের বাড়িতে এ সব কি?

—তোমার সবটাতে চেঁচামেচি করা চাই।

—তবে কি মুখ বুজে সব সহ্য করব?

—এ সব কেলেঙ্কারীর ব্যাপার পাড়ায় জানাজানি হওয়াও তো ভাল নয়। মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করো।

—এর আমি হেস্তনেস্ত করে ছাড়বো। তোমায় বলে দিলাম, আর কোন কথা শুনছি না।

বলরাম রেগে উঠোনে পায়চারী করতে থাকে। শ্যামার মা বুঝিয়ে বলে, এখন শোবে চল, সকালে উঠে যা হয় করো।

স্ত্রীর এ যুক্তি বলরামের অপছন্দ হয় না, ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়।

গভীর রাতে কেষ্টর ঘুম ভাঙে। শরীরে আর আগের মত যন্ত্রণা নেই, তবে খুব দুর্বল। কোন রকমে উঠে ঘরের আলো জ্বালে। গৌরী মাটিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। দরজা খুলে ছাদে এসে দাঁড়ায়, খোলা হাওয়ায় শরীর ঠাণ্ডা করে দেয়।

হাজার রকম চিন্তা তাকে চেপে ধরে। গৌরীকে নিয়ে, কি করবে সে? কোথায় যাবে, কোথায় রাখবে? কিছুই ভেবে পায় না। এক-মাত্র ভরসা সকাল বেলা আশুদা, কি প্রভাত যদি সাহায্য করে।

কেষ্টর হঠাৎ খেয়াল হয় তার ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে, আবার ঘরে ফিরে আসে। গৌরী ঘুম ভেঙে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। কেষ্টকে দেখে জিজ্ঞেস করে, আপনি কেমন আছেন?

—ভালো। তোমার ক্ষিদে পেয়েছে?

গৌরী উত্তর দেয় না, কেষ্ট ঘরের কোণ থেকে খানিকটা মিয়ানো বিস্কুট বার করে আনে, গৌরীর হাতে খানিকটা দিয়ে বলে, খাও।

গৌরী আস্তে আস্তে বলে, আপনি যখন ঘুমচ্ছিলেন, কে এসে দরজা ঠেলছিল—

—বোধ হয় শ্যামা।

—তারপর কারা খড়খড়ি খুলে দেখছিল, দু'বার।

কেষ্ট বোঝে দাদা-বৌদি নিশ্চয় খবর পেয়েছে। হঠাৎ বলে, গৌরী, ভোরে উঠেই আমরা বেরিয়ে যাব।

তখনও ভোরের আলো পরিষ্কার হয়ে ফোটেনি, কেষ্ট গৌরীকে নিয়ে নীচে নেমে সন্তর্পণে দরজা খুলে বেরিয়ে যায়। সমস্ত পাড়াটাই ঘুমে অচেতন। সদর রাস্তায় ভিস্তিরা জল দিচ্ছে। নিজেদের পাড়াটা

তাড়াতাড়ি পেরিয়ে মোড়ে এসে রিক্সা নিয়ে প্রভাতের বাড়ির দিকেই যায়।

গলির মধ্যে দু'খানা ঘর নিয়ে প্রভাত থাকে। কেষ্ট অনেক ধাক্কাধাক্কি করার পর প্রভাত ব্যাজার মুখে দরজা খুলে দেয়। কেষ্ট, তুই! এত দিন বাদে কেষ্টকে হঠাৎ এভাবে দেখে আশ্চর্য হয়, জিজ্ঞেস করে, এ সময়, ব্যাপার কি?

কেষ্ট কোন কথার জবাব না দিয়ে বলে, গৌরীকে এনেছি, ঘরে ডেকে নিয়ে আয়।

—গৌরী কে?

—যেই হোক্ সে পরে বলছি, তুই রিক্সা থেকে নামিয়ে ভেতরে নিয়ে আয়!

প্রভাত আর দ্বিরুক্তি না করে গৌরীকে আপ্যায়িত করে, আসুন, বাড়ির দরজায় এসে রিক্সাতে বসে থাকবেন না কি?

গৌরী কথামত ভেতরে যায়। কেষ্ট রিক্সা ছেড়ে দিয়ে চট্ করে মোড়ের দোকান থেকে কচুরী-সিঙ্গাড়া-মিষ্টি কিনে আনে।

প্রভাত রেগে বলে, এ কি, আমার বাড়িতে এসে খাবার কিনে আনলি, তোর যত সব বাঁদরামি—

কেষ্ট সে-কথায় কান না দিয়ে বলে, অনেক দরকারী কথা আছে, তোর পরামর্শ চাই।

—বল।

—একটু পরে, তুই আগে গৌরীর হাত-মুখ ধোবার ব্যবস্থা করে দে।

বাড়িতে প্রভাত একা থাকে, তাই কোন রকমই অসুবিধে ছিল না। গৌরীকে কলঘর দেখিয়ে দিয়ে প্রভাত বাইরের ঘরে এসে কেষ্টকে জিজ্ঞেস করে, কি ব্যাপার বল তো?

— সে অনেক কথা, পুরো একটা উপন্যাস।

—বল তো শুনি?

কেষ্ট খুব সংক্ষেপে বলে যায়, গৌরীর সঙ্গে আলাপ থেকে শুরু করে কালকের সেই অপ্রীতিকর ঘটনার পর অপ্রত্যাশিত ভাবে তার সব ভার নেওয়া পর্যন্ত, সমস্ত কথা।

প্রভাত প্রশ্ন করে, এখন কি করবি ঠিক করেছিস?

—তাই তো ভাবছি।

—মেয়েটাকে বের করে আনলি কেন, ভালোবাসিস?

—সেটা ভাববার সময় পেলাম কই, বোধ হয় রাগের মাথায়।

—বিয়ে করবি?

—যদি কোন উপায় না থাকে।

—এ ছাড়া আর উপায় কি? এত অল্প বয়সের মেয়েকে কি সাধারণ কাজ দিতে কেউ রাজী হবে? আর কি করবেই বা। সমাজের মধ্যে বাঁচতে হলে বিয়ে করতে হবে।

কেষ্ট চিন্তিত মুখে বলে, তুই তো আমার অবস্থা জানিস, এখন কি করে বিয়ে করবো?

—এখন না হয়, দু'দিন পরে।

—তা'পারি, বাড়ি ভাগ হয়ে গেলে। তাও মাস তিনেক তো বটেই, এ ক'টা দিন কি করি?

—ঘর নিয়ে কোথাও ওকে রাখ, তার পর যা হয়—

কেষ্ট বাধা দিয়ে বলে, ঘর পাওয়াও তো মুস্কিল, অনেক কথা উঠবে এখনও তো বিয়ে হয়নি।

—সে জায়গা আমি ঠিক করে দিতে পারি, যদি তোমাদের আপত্তি না হয়।

—কোথায়?

—বেহালার কাছে, পিনাকীদের একটা ঘর খালি আছে।

—কোন্ পিনাকী ?

—ফোটোগ্রাফার, আমাদের কাগজের কভারের ছবিগুলো তো সবই ওর তোলা—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছবিগুলো তো দেখি একই মেয়ের নানা রকম ভঙ্গী—প্রভাত সায় দেয়, সেই মেয়েটার সঙ্গেই থাকে।

—ওর বউ ?

—না, বিয়ে করার ছেলে পিনাকী নয়!

—তবে ?

—এই রকম হাফ-গেরস্ত থেকেই কাটিয়ে দেবে।

গৌরীকে প্রভাতেব বাড়িতেই অপেক্ষা করতে বলে কেষ্ট বাসা দেখতে বেরিয়ে পড়ে। শহরেব এক প্রান্তে ছোট্ট হলদে রঙেব দোতলা বাড়ি। বাড়িওয়ালা উপরে থাকে, নীচেটা ভাড়া দেয়। ঘব দেখে কেষ্ট সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলে, খুশি হয়ে প্রভাতকে বলে, একলা থাকার ভয় নেই অথচ সব আলাদা ব্যবস্থা। এ বেশ ভালোই হ'[illegible]

শ্যামল কালীর কথামত পরদিনই পেতলের নেমপ্লেট এনে দিয়েছিলো বলে সহজেই কালীর সাকরেদ হয়ে যেতে পেরেছে। প্রায়ই শ্যামলের পিঠ চাপড়ে কালী বলে, এ লাইনে খুব হুঁশিয়ার হয়ে কাজ করবি। তাহলে আর কোন ভয় নেই।

কালীর আড্ডায় অনেকের সঙ্গে শ্যামলেব আলাপ হয়েছে, তারা সবাই কালীকে ওস্তাদ বলে ডাকে। যেতে আসতে পায়ের ধুলো নেয়, দেখাদেখি শ্যামলও শিখে ফেলেছে। আজ সে খোলাখুলি কালীকে জিজ্ঞেস করে, ওস্তাদ, আমায় কিছু কাজ দেবে না ?

কালী খেতে বসেছিল, এক গ্রাস ভাত মুখে পুরে পাল্টা প্রশ্ন করে, কি করবি ?

—সে তুমি ঠিক করে দাও। আমি কি বলবো ?

—প্রথমে একটা হাল্কা কিছু কর।

—কি রকম ?

—একজন ছোঁড়া নিতাই-এর কাছে ক'জন লোক চেয়েছে, তাদের একজামিন বন্ধ করে দিতে হবে।

শ্যামল বিস্মিত হয়, কি করে ?

—হাল্লা করতে হবে, আর কি। নিতাই-এর সঙ্গে যাবি, ওরা বলে দেবে।

—এর জন্যে ?

কালী হেসে ওঠে, টাকা মিলবে বৈকি। মুফৎএর কাজ কালী করে না।

হৈ-চৈ করে স্কুল বন্ধ করার অভিজ্ঞতা শ্যামলের যথেষ্ট আছে কিন্তু ঠিক এ ধরনের টাকা নিয়ে অন্যদের পরীক্ষা বন্ধ করাটা তার কাছে নতুন। আগের দিন প্রশ্নপত্র কঠিন হয়েছিল, সেই অজুহাতে কয়েক জন সারা বছর ফাঁকি দেওয়া ছেলে, কালীর দলকে ডেকে এনেছে পরীক্ষা লণ্ডভণ্ড করে দেবার জন্যে।

যে স্কুলের সামনে তারা জড়ো হল, অল্পক্ষণ বাদেই সেখানকার একজন খবর দিয়ে গেল, আপনারা তৈরি থাকবেন। একটু বাদেই কয়েক জন চেঁচামেচি করে বেরিয়ে আসবে, ওদের সঙ্গে আপনারা মিলে যাবেন। ভিতরে ঢুকে খাতা পত্তর—

আর কিছু বলতে হল না। নির্ধারিত সময়ে ছেলেরা বেরিয়ে আসতেই শ্যামলরা তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে গগনভেদী চিৎকার আর শ্লোগান, ছাত্রসংঘ এক হও, আমাদের দাবী মানতে হবে। যারা হলের ভিতর পরীক্ষা দিচ্ছিল, যাতে তাদের অসুবিধে না হয় তাই কর্তৃপক্ষ

হলের দরজা বন্ধ করার আদেশ দিলেন। তাইতেই ঠেলাঠেলি, মারামারির সূত্রপাত। ভাড়া-করা ছাত্ররা জোর করে ভিতরে ঢুকে যায়, দারোয়ানদের ঘুষি মারে, গার্ডেরা বাধা দিতে এলে তাঁদেরও জামা ছিঁড়ে দেয়, কাগজ-পত্র কুটিকুটি করে। শ্যামলেরও মাথায় কেমন যেন নেশা চেপে গেছে, সামনে যে ছেলেটি প্রাণপণ খাতা বাঁচাবার চেষ্টা করছিল তাকে বলে, উঠে পড়ুন, আর কেন ?

ছেলেটি করুণ গলায় বলে, কেন, আমরা পরীক্ষা দেব।

—খুব যে ফার্স্ট বয় এসেছেন, এতগুলো ছেলে পারলো আর তুমি উঠতে পারছো না ? শ্যামল এক দোয়াতে কালী ছেলেটির গায়ে ঢেলে দেয়। পাশের একটি ছেলে বাধা দিতে এলে শ্যামল তার চোখ থেকে চশমা কেড়ে নিয়ে হলের আর এক কোণে ছুড়ে ফেলে দেয়। মিনিট দশেকের মধ্যে সব কিছু বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। আবার 'শ্লোগান' দিতে দিতে বিজয়ী ছেলেরা জয়োল্লাসে হল ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে।

সন্ধ্যের পর শ্যামল কালীর সঙ্গে দেখা করতে যায়। কালী একগাল হেসে বলে, নিতাই-এর কাছে সব শুনেছি, ব্যস, আমার একৃজামিনে তুই পাস হয়ে গেছিস।

শ্যামল কালীর পায়ের ধুলো নেয়, ওস্তাদ, যা বলবে আমি ঠিক করে দেব।

কালী একটা দশ টাকার নোট বার করে শ্যামলকে দিয়ে বলে, এই নে। নিতাই ছাড়া আজ সবাই তোদের দলে নতুন ছেলে ছিল, কিন্তু কেউ কম যায় না, খুব হাল্লা করে এসেছে।

কালীর কাছ থেকে বেরিয়ে শ্যামল পকেট থেকে কলম আর ঘড়ি বার করে। আজকের গোলমালের মধ্যে তিনটে কলম আর দুটো ঘড়ি হাতসাফাই করেছে। সে-কথা কালীর কাছেও সে চেপে গেছে। বাড়ি ফিরে নিজের বাক্সের মধ্যে সেগুলো রেখে দেয়।

রাত্রে খাবার সময় কথা উঠলো, আজকের গোলমালের বিষয়, মামা নেশার ঝোঁকে বললেন, পরীক্ষা কেউ চায় না। আমি তো বলি, কেন মিথ্যে লেখাপড়া করা—

মামার শালা বটুবাবু খন্‌খনে গলায় আপত্তি করেন, তোমার যেমন কথা। ছেলেগুলো যে ক্রমশঃ বাঁদর হচ্ছে। ইস্কুল থেকেই গুণ্ডামি শিখলে বড় হয়ে কি হবে বলতে পারো ?

মামা এ কথার জবাব না দিয়ে শ্যামলকে জিজ্ঞেস করেন, তোরাও পরীক্ষার সময় এ রকম গোলমাল করবি নাকি ?

শ্যামল তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দেয়, ও, যারা লেখাপড়া করে না তারাই গোলমাল পাকায়।

—তোমার মত ভাল ছেলেরা নয়, বলে বটুবাবু তির্যক দৃষ্টিতে শ্যামলের দিকে তাকান।

এই ভদ্রলোকটিকে শ্যামল দু' চক্ষে দেখতে পারে না। রোগা, হাড়গিলে চেহারা। সব বিষয়ে নাক গলানো অভ্যেস। দশ দিনের জন্যে এ বাড়িতে থাকতে এসে দু'মাসের ওপর রয়ে গেছেন, একই ঘরে থাকেন বলে শ্যামলে অস্বস্তির শেষ নেই।

বটুবাবু আবার বলেন, বই নিয়ে কখনও বসতে তো দেখলাম না !

মামা বাধা দেন, আহা, বাড়িতে আর থাকে কতক্ষণ ! ইস্কুল করে, কোচিং ক্লাশে যায়—

—তাই বলে বাড়িতে পড়বে না ? আমরাও তো কিছু খারাপ ছাত্র ছিলাম না, কোন না কোন সময় বাড়িতে বই নিয়ে বসতে হয়েছে।

শ্যামলের বিরক্তি ধরে যায়, ইচ্ছে করে বটুবাবুর মুখে একটা সজোরে ঘুষি লাগায়। তবু কোন কথা না বলে খাওয়া শেষ করে নিঃশব্দে উঠে পড়ে।

বটুবাবু শ্যামলের যাওয়ার দিকে তাকিয়ে বলেন, আমি তোমায় বলছি জগৎ, ছেলেটার মতি-গতি ভাল নয়।

—তোমার সবাইকেই সন্দেহ।

—পরে বুঝবে। গরীবের কথা বাসি হলে সত্যি হয়।

—ওর বাবাকে চেন না বটু, 'অনেস্ট' লোক।

—কাউকে চিনতে আমার বাকী নেই। আজ নয়, একদিন সব বলব। তোমার ছেলেদের মুখ চেয়েও আমার বলা উচিত।

জগৎবাবু আর কথা বাড়াতে চান না, চল হে, রাত হ'ল। হাত ধুয়ে ফেলি।

বাধ্য হয়ে বটুবাবু জগৎবাবুর অনুসরণ করেন।

প্রভাতকে আজকাল বেলারাণীর বাড়ি প্রায়ই যেতে হয়। কারণ এখনও গল্পটা পুরো লেখা হয়নি। বেলারাণী রোজই বিষয়বস্তু বদলায়। তার প্রযোজিত প্রথম ছবিতে নায়িকারূপে সে যাতে সব রকম অভিনয়-প্রতিভা দেখাবার সুযোগ পায় তেমন হওয়া চাই। প্রভাত ফরমাস-মতো খানিকটা করে লিখে নিয়ে যায়। বেলারাণী শুনে বলে, হয়েছে, তবে বড্ড ফরমাসমতো লেখা মনে হচ্ছে।

—বলুন তো একটু অন্য রকম করে দি।

—না না, অন্য রকম করতে হবে না। এতেই প্রাণ আনতে হবে।

—কোথায়?

—ধরুন, যেখানে নায়ক পাগল হয়ে গেল, নায়িকার চরিত্রে আরও 'প্যাথোজ্' চাই।

—কি রকম ডায়ালগ চান বলুন?

বেলারাণী হেসে ফেলে, সে আমি কি জানি। খুব করুণ, মানে দর্শকের চোখে জল এনে দিতে হবে।

অনেক দিন বেলারাণী কাজে বেরিয়ে যায় প্রভাতকে বসিয়ে রেখে, আপনি বসে লিখুন, আমি এখুনি আসছি। হয়তো কোন দিন বেলারাণী সত্যিই তাড়াতাড়ি ফিরে আসে, হয়ত কোন দিন আসে না। প্রভাত বসে থেকে থেকে ক্লান্ত হয়ে চলে যায়। তবে বেলারাণী না থাকলেও যার সঙ্গে প্রায়ই প্রভাতের দেখা হয় সে হোল বিনোদ। নিজের গরজে সে কথা বিশেষ বলে না, তবে প্রভাত প্রশ্ন করলে সে উত্তর দেয়।

আজ প্রভাত বিনোদকে জিজ্ঞেস করে, বিনোদবাবু, গল্পটা কি দাঁড়াবে বলুন তো? বেলাদেবী রোজই তো বদলে দিচ্ছেন।

বিনোদ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলে, বেলা ঐ রকমই, নিজেই বদলে যাচ্ছে তো গল্প।

—ওঁর সঙ্গে আপনার অনেক দিনের আলাপ?

—হুঁ, যখন ও থিয়েটারে নাচতো, তখন থেকে।

—উনি খুব তাড়াতাড়ি নাম করেছেন।

বিনোদ সোফায় গা এলিয়ে দেয়, বলতে গেলে পাঁচ সাত বছরের মধ্যে। তা কম উন্নতি নয়, থিয়েটারের গ্রুপ নাচিয়ে থেকে একেবারে চিত্রতারকা।

—ওঁর সত্যিকারের বয়স কত?

—ভগবান জানেন!

—আপনি জানেন নিশ্চয়?

বিনোদ হাসে, ও জেনে কি লাভ?

বিনোদ উসখুস করতে থাকে, সোফার ওপরই এপাশ ওপাশ ফেরে। নিজের মনেই বিড়-বিড় করে বলে, বেলা যে কোথায় গেল আমায় বসিয়ে রেখে।

—এখুনি আসবেন বোধ হয়।

—আমি আর পারছি না! চলি। বিনোদ উঠে দরজা পর্যন্ত গিয়ে

ফিরে আসে; আপনি আর একলা বসে থেকে কি করবেন, আমার সঙ্গে আসুন।

—কোথায়?

—কোন একটা 'বারে' যাই, চলুন।

বিনোদ গাড়ী করে প্রভাতকে নিয়ে যায় সাহেবপাড়ার দ্বিতীয় শ্রেণীর চীনে রেস্তোরাঁয়। এখানে খাবার আর পানীয়, দুই-ই পাওয়া যায়। এ ধরনের রেস্তোরাঁয় প্রভাত যে আগে আসেনি তা নয়, তবে খুব স্বচ্ছন্দ অনুভব করে না।

বিনোদ জিজ্ঞেস করে, কি পান করবেন?

—আমি করি না।

—করে দেখুন না, একেবারে বিষ নয়।

—তাহলে হাল্কা কিছু দিন।

বিনোদ দুটো হুইস্কির অর্ডার দেয়। পান করতে হলে ভাল জিনিসটাই করুন।

দু'পেগের বেশি খেতে প্রভাতের সাহস হয় না, তাইতেই মাথা ঝিম-ঝিম করে। বিনোদ কিন্তু পাঁচটা পর্যন্ত সোডা দিয়ে চালিয়ে গেল, তারপর জল-মেশানো আরও দুটো। মাংস পেটে পড়তেই নেশা জমে ওঠে। বিনোদের মন খুলে গেছে, বেলারাণীর কথা জিজ্ঞেস করছিলেন, ওর জন্যে কত টাকা নষ্ট করেছি জানেন? হাজার, হাজার। তবু ওকে পেলাম না। আলেয়ার পেছনে ছোটাই সার—

প্রভাতের কৌতূহল হয়, এখনও তো ওর কাছেই আসেন।

—উপায় নেই, কি করবো।

—বেলারাণীকে আপনি ভালোবাসেন?

—ভালো আমি কাউকে বাসিনি, নিজেকেও না। এ লাইনে কত দিন আছি জানেন?

—কত দিন ?

—দশ বছর। বাবা মারা যাবার পর থেকে। বাড়ি পেলাম, গাড়ী পেলাম, নগদ টাকা পেলাম। আর কি চাই ?

—আপনার মা ?

—অনেক আগে মারা গেছেন। দুটো বোন ছিল, তাদের বিয়ে হয়ে গেছে।

—তার পর ?

বিনোদ হাসতে গিয়ে নেশার ঝোঁকে কেঁদে ফেলে, তার পর আর কি, এই যা দেখছেন, মাতাল।

—আপনার মাথার ওপর আর কেউ ছিল না ?

—আছেন জ্যাঠামশাই আর জ্যাঠাই-মা। তাঁদের সম্পত্তি আমিই পাব।

—বলেন কি ?

বিনোদ হো-হো করে হাসে, আশ্চর্য হচ্ছেন! কেন, ভগবানের স্বভাবইতো এই, তেলামাথায় তেল ঢালা। যার টাকা আছে তারই টাকা হয়, ভোগ করার লোক নেই। যার দরকার নেই, তারই গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলে হয়—

প্রভাত বাধা নিয়ে বলে, আপনার বাবা কি অনেক টাকা রেখে গিয়েছিলেন ?

—তা কম নয়। নিজে রোজগার করেছেন, আবার দু-দাদুর সম্পত্তি পেয়েছিলেন, সে-ও অনেক—

—বিয়ে করেননি কেন ?

বিনোদ কি যেন ভেবে নিয়ে বলে, করেছিলাম।

—তিনি ?

—নেই।

—মারা গেছেন ?

বিনোদ এ কথার উত্তর দেয় না। পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরায়, বেলারাণী যে ফিলম্ তুলছে তার অর্ধেক টাকা আমার।

—আপনি তো মনই দেন না এ ব্যাপারে।

—ও নষ্ট হবে, আমি ঠিক করে রেখেছি।

—তবে এতে নামলেন কেন ?

বিনোদ হাসে, বেলার জন্যে।

প্রভাত বিস্মিত হয়, আপনি সত্যি আশ্চর্য লোক !

—আশ্চর্য লোক কিছু নয় প্রভাতবাবু, স্রেফ জ্ঞানপাপী। একটু থেমে বলে, আপনি তো লেখক, আমার লেখার ইচ্ছে আছে—

—আপনি লেখেন নাকি ?

—লিখি না, তবে লিখবো। একখানা বই।

—কি বিষয় ?

বিনোদ আবার হাসে, সে এখন বলব না, তবে দেখবেন, 'দেবদাসে'র চাইতেও ভাল বই হবে।

—আপনার বুঝি 'দেবদাস' খুব ভাল লাগে ?

—'দেবদাস' আমার বাইবেল। একটু থেমে প্রভাতকে প্রশ্ন করে, আপনি ভগবান বিশ্বাস করেন ?

—নিশ্চয়।

—প্রার্থনা করেন ?

—করি।

—তাহলে আমার জন্যে একটি প্রার্থনা করবেন ?

—কি ?

—যেন আমার 'থাইসিস্' হয়।

প্রভাত দেখে, বিনোদেয় চোখের কোণে জল চক্-চক্ করছে।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে বিনোদ প্রভাতকে বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে চলে যায়।

প্রায় এক সপ্তাহ বাদে কেষ্ট অনন্ত-কেবিনে এলে, আশুদা জড়িয়ে ধরে বললেন, আর তোমাকে ছাড়া হচ্ছে না। আশুদার দোকানের কথা বুঝি আজ-কাল মনে থাকে না?

কেষ্ট হেসে উত্তর দেয়, সব চেয়ে বেশি মনে থাকে আশুদা, কিন্তু সময় যে পাই না।

—কি এমন রাজকার্য করছ শুনি?

—সে অনেক ব্যাপার। চলুন, আপনার সঙ্গে পরামর্শ করি।

দু'জনে একান্তে বসে চা খেতে খেতে যে আলোচনা করল, তা হোল কেষ্টর বাড়ি ভাগ করা নিয়ে। বলরামের উকীল কেষ্টর সঙ্গে দেখা করে তার দাদার মনোভাব জানিয়ে গেছে। অগত্যা কেষ্টকেও তৎপর হতে হয়। আশুদাকে বলে, আমায় একজন উকীল ঠিক করে দিন, যে সব বুঝে নিতে পারবে।

আশুদা বলেন, সে আর এমন কি? আমার বড শালার ছেলে বেশ ভাল উকীল, বল তো তাকেই ঠিক করে দি।

—আপনি যা ভাল বুঝবেন। সব দায়িত্ব আপনার।

—এত দিনে তাহলে বাড়ি ভাগ সত্যি সত্যি হচ্ছে?

—তা ছাড়া উপায় কি?

—আমি বলি কেষ্ট, একলা তুমি থাকতে পারবে না।

—দোকলা পাব কোথায়?

—বিয়ে কর।

—কাকে?

—কাকে, তা আমি কি করে বলব? যাকে তোমার পছন্দ।

—পছন্দ এখনও কাউকে করি নি।

আশুদা গলা নামিয়ে বলেন, কেন, গৌরী ?

কেষ্ট আড়চোখে আশুদার মুখটা দেখে নেয়, তার কথা আপনি কি করে জানলেন ?

আশুদা একগাল হেসে উত্তর দেন, আমি সব খবরই রাখি ভায়া।

কেষ্টর ইচ্ছে ছিল, এ বিষয়ে আশুদার সঙ্গে আর একটু কথা বলে, কিন্তু প্রভাত এসে পড়ায় সে এ প্রসঙ্গ পাল্টাতে বাধ্য হয়। প্রভাত কেষ্টর মাথায় চাঁটি মেরে বলে, তুই কি হয়েছিস বল্‌তো ? তারপর একটা খবর পর্যন্ত দিলি না।

—খবর থাকলে তো ?

—'রিয়েলী' তুই একটা যা-তা—

আশুদা ইত্যবসরে উঠে পড়েন খদ্দেরদের তদারক করতে।

প্রভাত নিজে থেকেই জিজ্ঞেস করে, জায়গাটা কি রকম লাগছে ?

—ভালই, কোন গোলমাল নেই।

—যা হোক, সংসারী হয়ে পড়লি তো ?

—যেটুকু না হলে নয়।

—পিনাকীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে ?

—হয়েছে, সে রকম কিছু নয়।

—চিন্নুর সঙ্গে ?

—কে ?

—পিনাকীর—

—ও হ্যাঁ, গৌরীর সঙ্গে হয়েছে।

—মেয়েটা সত্যি ভাল। ওই হতভাগাটার পাল্লায় পড়ে এতটুকু শান্তি পেল না। তার পর, কি করবি ঠিক করলি ?

—কিসের কি ?

—গৌরীর ?

—দাদা তো বাড়ি ভাগের ব্যবস্থা করছে। আমিও আশুদাকে উকীল ঠিক করতে বলেছি, ঝামেলা চুকলেই—

—হ্যাঁ, বেশি দেরি করিস না।

একমুখ পান খেয়ে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে শ্যামল আসে, আশুদার সামনে দাঁড়িয়ে বলে, শীগ্‌গিরি ডিম রুটি দিতে বলুন, তাড়া আছে।

—তোমার কেষ্টদা এসেছে যে—

—কই ? শ্যামল পেছন ফিরে কেষ্টর দিকে তাকায। হেসে এগিয়ে যেতে যেতে বলে, আচ্ছা লোক আপনি কেষ্টদা, একটা কথারও ঠিক রাখেন না।

—বড্ড ঝামেলার মধ্যে ছিলাম।

—আমাকে একটা খবর দিলেও তো পারতেন। আর প্রভাতদাও হয়েছেন আপনার জুড়ি, সেদিন বললেন যে স্টুডিও দেখাতে নিয়ে যাবেন, তার কি হ'ল ?

প্রভাত উত্তর দেয়, এখনও পুরো কাজ শুরু হয়নি, হলে বলব'খন।

—আপনি আর বলেছেন।

—মাসখানেক বাদে খবর নিও।

প্রভাত উঠে গেলে কেষ্ট শ্যামলকে জিজ্ঞেস করে, তোমার কাছে আমার কত টাকা আছে ?

—প্রায় তিরিশ টাকা।

—আজকে দিতে পারবে ?

—সঙ্গে তো বেশি নেই, পাঁচ টাকা আছে।

—তাই দাও, বাকীটা আশুদার কাছে রেখে যেও। আমি নিয়ে নেব।

শ্যামল সম্মতি জানিয়ে পাঁচটা টাকা কেষ্টর হাতে দেয়। কেষ্ট আবার জিজ্ঞেস করে, সিনেমার টিকিট কিছু বিক্রি করলে না কি?

—না, সময় পাইনি।

—আজ-কাল কি করছ?

—অনেক ব্যাপার আছে, পরে বলব!

বলেই খাওয়া শেষ করে শ্যামল উঠে পড়ে। কেষ্ট বসে বসে সিগারেট ধরায়।

নতুন বাসায় এসে গৌরীর ভাল লাগে। এখানকার বিলিব্যবস্থা, পরিষ্কার ঘর, রান্নার সরঞ্জাম, যা কেষ্ট কিনে এনেছে, সবই তার মনের মত! মাঝে-মাঝে যদিও বস্তীর কথা ভেবে অস্বস্তি বোধ করে কিন্তু পরক্ষণেই কেষ্টর উদারতা ও মহত্ত্ব সে-কথা ভুলিয়ে দেয়। রাত্রে কেষ্ট কোনদিনই এখানে থাকে না, নিজের বাড়ি ফিরে যায়। প্রয়োজনমতো সকালে কি দুপুরে আসে। কেষ্ট না খেলে গৌরী খেতে চায় না বলে দুবেলাই তাকে গৌরীর কাছে খেতে হয়।

গৌরী বলে, বাড়িতে কে আপনার খাবার নিয়ে বসে আছে?

—কেউ নেই।

—তবে?

—আমারও তো কাজ-কর্ম আছে, সময়ের ঠিক থাকে না। দেরি হলে পাছে তুমি না খাও, এই ভয়ে অনেক সময় কাজ ফেলে আসতে হয়।

—এলেনই বা। গৌরী মুখ নীচু করে বলে, একলা আমি কিছুতেই খাব না—

অগত্যা কেষ্টকে সময় করে রোজই আসতে হয়। এ আসার মধ্যে কর্তব্যবোধের চেয়ে আনন্দ ছিল অনেক বেশি। তাই সব কিছু ফেলে রেখে ঠিক সময়ে এসে গৌরীর দরজায় ধাক্কা দিত।

এখানে আসার পর যার সঙ্গে গৌরীর খুব আলাপ হয়েছে সে হোল চিন্ময়ী, সবাই ডাকে চিনু বলে। মেয়েটির রঙ ময়লা, কিন্তু মুখশ্রী ভাল। একটু বেশি গায়ে-পড়া। নিজে থেকেই এসে গৌরীর সঙ্গে আলাপ করে, আপনারা বুঝি আজ এলেন ?

—হ্যাঁ।

—আপনার নাম ?

—গৌরী।

—আমার নাম চিনু, সামনের ঘরে থাকি।

গৌরী মাদুর পেতে বসতে দেয়, বসুন।

চিনু বসে পড়ে, আমাকে আর অত খাতির করতে হবে না। একবার বসলে আর উঠতেই চাইব না। নিজের রসিকতায় হেসে ওঠে মেয়েটি। চারিদিক তাকিয়ে বলে, এঘরে আমাদের এক বন্ধুরা ছিল, কিছুদিন আগে চলে গেছে।

গৌরী বিশেষ কৌতূহল দেখায় না, তাই বুঝি ?

চিনু বলে যায়, কি বরাত মেয়েটার, এক মাস ছিল এখানে অতীন বাবুর সঙ্গে। বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেল, তাই তো চলে গেছে।

—বিয়ের পর চলে গেলেন কেন ? এ তো বেশ ভাল ঘর।

—কেন ?

গৌরীর প্রশ্নে চিনু বিস্মিত হয়, বিয়ে করে এখানে কেউ থাকে না কি ?

—আপনারা ?

—আমাদের মত যাদের মাথার সিঁদুরই সর্বস্ব, তারাই থাকে।

চিনুর কোন কথাটাই গৌরীর কাছে পরিষ্কার হয় না। ঠিক এই সময় পিনাকী অন্য ঘর থেকে ডাক দেওয়ায় চিনু উঠে পড়ে, যাই ভাই, এসেছে, এক মিনিট দেরি হলেই রসাতল করবেন।

এর পর ক'দিনের মধ্যেই চিনুর সঙ্গে গৌরীর বেশ আলাপ হয়ে যায়। আপনি-তুমির দূরত্ব কাটিয়ে তারা 'তুই তুই' করতে শুরু করে। চিনু বলে, যাই বলিস, তোর কেষ্টদা লোক ভাল, মুখ খারাপ তো করে না। আমার কর্তাটির কাছে একদিন তুই থাকতে পারিস তো কি বলেছি!

—খুব বকেন বুঝি?

—কি না করেন, তবু মুখ বুঁজে পড়ে থাকতে হয়। কি আর উপায় বল?

গৌরী রান্না করছিল। চিনু জিজ্ঞেস করে, মাছের ঝাল করছিস বুঝি?

—হ্যাঁ, কেষ্টদা খুব ভালোবাসেন।

—হ্যাঁ রে, তোর কেষ্টদা কি করেন? সারা দুপুরই তো তোর কাছে দেখি।

গৌরী অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দেয়, জানি না তো।

—এ আবার কি ন্যাকা কথা, যার সঙ্গে আছিস, সে কি করে জানিস না?

—ওঁদের অবস্থা বেশ ভাল, দোতলা বাড়ি আছে।

—উনিই বলেছেন বুঝি, তুই জানলি কি করে?

—আমি ওঁদের বাড়িতে একদিন ছিলাম যে!

—তাই নাকি, তোকে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন? একটু থেমে বলে, না, তোর কেষ্টদা সত্যিই ভাল লোক।

গৌরী কাজ করতে করতেই উত্তর দেয়, আমি তো বলি দেবতা।

কত দিন কত সময় এ ভাবে দু'জনের মধ্যে আলোচনা হয়। কেষ্টর প্রতি গৌরীর এই গভীর বিশ্বাস চিনুকে মুগ্ধ করে। অপর পক্ষে চিনুর বিবিধ প্রশ্ন গৌরীকে কৌতূহলী করে তোলে। তাই কেষ্টকে খেতে বসিয়ে একদিন সে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করে, আপনি কি কাজ করেন?

এ প্রশ্নে কেষ্ট বিস্মিত হয়। বলে, এ কথা কেন জানতে চাইছ গৌরী?

—অনেকে জিজ্ঞেস করে, আমি কিছুই বলতে পারি না।

কেষ্ট হাসে, ও এই কথা, আচ্ছা পরে বলব'খন।

গৌরীর অকারণ জিদ চেপে যায়, না, আজই বলুন।

—আজ থাক গৌরী, বলছি তো।

—বলুন না?

অগত্যা কেষ্ট বলতে বাধ্য হয়, ব্যবসা করি।

সেদিন মিথ্যে কথা বলে গৌরীকে শান্ত করেছিল বটে কিন্তু মনে মনে সে এই ভেবে শঙ্কিত হয় যে, একবার যখন গৌরীর মনে কৌতূহলের বীজ উপ্ত হয়েছে তখন সব কিছু না জানা অবধি তা কিছুতেই শান্ত হবে না। তাই প্রথম সুযোগ পেয়েই গৌরীকে সে বোঝাতে চেয়েছিল, গৌরী, তোমায় অনেকগুলো কথা বলার আছে যা এখনও বলা হয়নি।

—কি বলুন?

—মানে, জানি না তুমি কি ভাবে নেবে।

গৌরী চুপ করে থেকে কেষ্টকে কথা বলবার সুযোগ দেয়।

—আমি ছোটবেলা থেকেই অনেক রকম ভাবি, আজও। দেখ, মানুষ মাত্রেই বুদ্ধি দিয়ে কাজ হাসিল করে। এত রকম যে জিনিসপত্র ব্যবহার করছ সবই মানুষ বুদ্ধির সাহায্যে তৈরি করেছে। বুদ্ধি যার নেই সে বাঁচতে পারে না। রাস্তার যত বড় বড় বাড়ি দেখ, গাড়ী দেখ, এ সব কাদের? যাদের খুব বুদ্ধি। যারা বোকা লোকদের ঠকিয়ে টাকা রোজগার করে, তাদের।

গৌরী অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, সে কি বলছেন, লোককে ঠকালে তো তার শাস্তি হবে?

—হয় না, সেইটেই তো সবচেয়ে মজার ব্যাপার। যার যত টাকা তার তত খাতির। যখন একবার টাকা হয়ে যায় তখন কেউ ভাবে না, কি করে এত টাকা হল। সব চোর!

—চোর!

কেষ্ট ম্লান হাসে, জানি গৌরী, এভাবে ভাবতে গিয়ে তোমার খারাপ লাগবে, কিন্তু এ সব সত্যি কথা। গয়লারা দুধে জল মেশায় বলে তোমরা বক, কিন্তু ভেজাল ছাড়া কোন জিনিষ কি বাজারে পাও?

—যেটা খারাপ, কিনব না। দেখে কিনব।

—কি করে দেখে নেবে? বন্ধ টিনের মধ্যে ভেজাল মাল, ধরবার কি উপায় আছে? যারা ঠকায়, যারা চোর, তাদেরই টাকা, তাদেরই খাতির।

গৌরী নিচু গলায় বলে, তাহলে আমাদের টাকা চাই না।

—বাঁচবে কি করে?

—ভগবান বাঁচাবেন!

—সে হলে খুব ভাল হত। কিন্তু তোমার ভগবান যে একেবারে হাবাকালা। কিছু দেখতে শুনতে পায় না।

গৌরী শিউরে ওঠে, ছি, ছি, অমন করে বলবেন না।

কেষ্ট এবার রেগে যায়, ভগবান বাঁচালো তোমার ভাইকে, তোমাকে?

—ভাই-এর মারা যাবার ছিল তাই গেছে। কিন্তু আমাকে তো তিনি বঁচিয়েছেন, তা নাহলে আপনাকে পেলাম কি করে?

এর পর আর কথা চলে না। কেষ্ট চুপ করে যায়, কিন্তু মনে শান্তি পায় না। গৌরীকে বোঝাতে না পারলে দু'জনের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যাবে। গৌরীও বোঝে, কেষ্ট ঠিক আগের মত সহজ হতে পারছে না। সব সময় কি যেন চিন্তা করে।

একদিন আগের মত বেড়াতে বেরিয়ে গড়ের মাঠে বসে, গৌরী ঐ কথাই জিজ্ঞেস করে, আপনার কি হয়েছে কেষ্টদা?

—কিছু না তো ?

—কি ভাবছেন এতো ?

—ও কিছু না।

—আমাকে বলবেন না ? গৌরীর অভিমান হয়।

কেষ্ট হেসে উত্তর দেয়, রেগে গেলে কেন, বলে লাভ নেই জেনেই বলছি না।

—কি ?

—ভাবছি, তোমার মত যদি সব জিনিসে বিশ্বাস রাখতে পারতাম। যেমন তুমি ভগবানে বিশ্বাস করো, আমাকে বিশ্বাস করো, সবাইকে বিশ্বাস কর।

—আপনি কাউকে বিশ্বাস করেন না ?

—না !

—আমাকে ?

কেষ্টকে আবার হার মানতে হয়, তোমার কথা আলাদা।

এইটুকুতেই গৌরী খুশি হয়, আর কাউকে বিশ্বাস করেন না ?

কেষ্ট গৌরীর মুখের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে উত্তর দেয়, কেন এমন হয়েছে জানো ? ছোটবেলা থেকে কেউ আমায় বিশ্বাস করতো না। আমার জন্মের সঙ্গে মা মারা গেলেন। আমার নাম হল অপয়া ছেলে। বড় হতে লাগলাম, কারুর ভালোবাসা পেলাম না। একলা মানুষ হ'লাম। ভাবতাম খুব বেশি। লেখাপড়াতেও সুবিধে করতে পারলাম না, আর কেউ তা নিয়ে মাথাও ঘামায়নি।

গৌরী গলায় দরদ দিয়ে বলে, আপনার বাবা, তিনি ভালোবাসতেন না?

—বোধ হয় না। একটা অ্যাক্সিডেণ্টে বাবার পা ভেঙ্গে যাওয়ায় কাজ ছেড়ে দিতে হয়, সেও নাকি আমার দোষ, আমি অপয়া।

—তারপর ?

—দাদা আমার চেয়ে অনেক বড়, চাকরি করতো বাবার অফিসে। সে-ই সংসার চালাতে লাগলো। কিন্তু আমি দাদাকে দু'চক্ষে দেখতে পারতাম না।

—কেন?

—ভীষণ বদরাগী লোক। একটু ভুলচুক হলেই আমাকে মারতো। কেউ বাঁচাতে আসতো না। কেষ্ট একদৃষ্টে দূরে তাকিয়ে থেকে বলে যায়, আত্মীয়-স্বজন যারা আসত, দাদার কাছেই আসত। আমি যে বাড়িতে আছি কেউ একবারও ভাবতো না। মামার বাড়ি থেকে লোক এসে দাদাকে নিয়ে যেত, আমি থাকতাম একা। বাবা শেষের দিকে পঙ্গু হয়ে পড়েছিলেন, আমাকেই দেখাশোনা করতে হ'ত।

গৌরী কেষ্টকে থামিয়ে দেয়, চলুন, রাত হ'ল।

কেষ্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ায়, চল।

চলতে চলতে কেষ্ট আবার ম্লান হেসে বলে, বাবা যদি হঠাৎ মারা না যেতেন, বাড়ির অংশ আমি পেতাম না। উইল করলে সবই দাদাকে দিয়ে যেতেন।

—বৌদি আপনার হয়ে কিছু বলতেন না?

—আমার হয়ে বলবে? আমাকে বোধ হয় বাড়ির চাকরের চেয়ে বেশি উঁচুতে কিছু ভাবতো না। স্বার্থপর, তবে ওরও দোষ নেই, যেমন সবাই করেছে। অথচ আশ্চর্য হচ্ছে, ওদের মেয়েটা আমাকে ছাড়া এক মিনিট থাকতে পারত না। বাপ-মার কাছে কত বকুনি খেয়েছে, মার খেয়েছে, তবু আমার কাছে ছুটে পালিয়ে আসে। এখন শুনছি দাদা আমার ওপর রেগে শ্যামার বিয়ের ঠিক করেছেন এক দোজবরের সঙ্গে।

গৌরী চমকে ওঠে, সে কি, ওইটুকু মেয়ে!

—কে বুঝবে সে-কথা। এক স্কুলমাস্টার। দুটো ছেলে রেখে বউ মারা গেছে, তাদের জন্যেই শ্যামাকে বিয়ে করছে।

আজ এই প্রথম কেষ্ট গৌরীর সঙ্গে নিজের জীবনের কথা খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করে। গৌরীর সমস্ত সহানুভূতি কেষ্টর জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠে, সে চায় কেষ্টর মন থেকে এত দিনের পুঞ্জীভূত বেদনার ভার লাঘব করে দিতে!

তাই পরদিন চিনুর ঘরে গিয়ে সে বলেছিল, সত্যি চিনু, কেষ্টদার তুলনা হয় না।

—কেন, আবার কি হল?

—ছোটবেলা থেকে যে কি কষ্ট পেয়েছেন, শুনলে তুই অবাক হয়ে যাবি।

চিনুকে কথা বলার সময় না দিয়ে গৌরী গতকাল কেষ্টর মুখে যা যা শুনেছিল, বর্ণনা করে যায়। কথা শুনতে শুনতে চিনুর চোখে জল ভরে আসে।

আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে বলে, তুই কখনও ওনার মনে কষ্ট দিস না। গৌরী লজ্জা পেযে ঘুরে দাঁড়ায়। চিনুর ঘরে সে বেশি আসেনি, চতুর্দিকে ছড়ানো ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে।

চিনু বলে, ছবি দেখবি, বোস্ না। বড়-ছোট নানা আকৃতির ছবি চিনু গৌরীর সামনে সাজিয়ে দেয়। কত রকম দৃশ্য, কত মেয়ের ছবি।

গৌরী প্রশ্ন করে, এসব কাদের ছবি?

—যাদের মুখ ছবিতে ভাল ওঠে।

—কি হয়?

—বিক্রি।

—কোথায়?

—পত্রিকায়, মলাটে ছাপায়, কখনও ভেতরে। এই দেখ না—

চিনু কতকগুলো পুরোন পত্রিকা বার করে আনে। গৌরী দেখে

সব পত্রিকাগুলোর মলাটে চিনুর ছবি। অনেক রকম ভঙ্গীতে। গৌরী অবাক হয়, এ যে সব তোর ছবি রে?

—আগে আমার ছবিই বেশি তুলত।

চিনুর কথার গৌরীর কেমন খট্‌কা লাগে। জিজ্ঞেস করে, আজকাল তোলে না?

—কম।

—কেন?

—আমার চেয়ে অনেক সুন্দরীরা ছবি তুলতে ছুটে আসে বলে।

—তোর খারাপ লাগে না?

চিনু দীর্ঘশ্বাস ফেলে, না।

ঠিক বুঝতে না পেরে গৌরী চিনুর দিকে তাকায়। চিনু মুখ নীচু করে বলে, আর ছবির মোহ নেই।

—কিসের মোহ আছে শুনি?

—জীবনের।

—মানে!

—ঘর, সংসার। কিছুই হ'ল না।

বিস্মিতা গৌরী প্রশ্ন করে, এ তো বেশ ভাল ঘর, নিজের বাড়ি না হলে বুঝি মন ওঠে না?

—তা বলিনি রে গৌরী, ছেলেপিলে না হলে, সমাজ না থাকলে মেয়েদের জীবনে কোন সুখ নেই।

—ছেলেপিলের কথা জানি না, কিন্তু সমাজ চাই না আমি। বিশ্রী লোক তারা।

চিনু ম্লান হাসে, এখন তাই ভাবছিস, পরে বুঝবি। যদি নিজের ভাল চাস কেষ্টদাকে বুঝিয়ে তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেল, নইলে আমার দশা হবে।

—কেন, তোর বিয়ে হয়নি ?

—পুরুষদের তুই চিনিস না। বের করে আনবার সময় বিয়ে করব, হ্যান করব, ত্যান করব, নানারকম বলে। পরে সব ভুলে যায়।

গৌরী অবাক হয়ে চিনুর সী থির সিঁদুরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—সিঁদুর দেখছিস ? ও আমাদের পরতে হয়। মিথ্যে বউ সেজে বসে না থাকলে বাইরেও বেরুন যায় না। চিনু আর কথা বলতে পারে না, চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে আসে। গৌরীও সে কান্নায় যোগ দেয়। সে চিনুকে জড়িয়ে ধরে মৃদুস্বরে বলে, আমি জানতাম না কিন্তু, তাই একথা তুলে তোকে কষ্ট দিলাম।

চিনু ধরাগলায় বলে, আমি বলছি গৌরী, বিয়ে করে ফেল। তোর কেষ্টদা ভাল লোক, বোধহয় রাজী হবে। নইলে পরে সারাজীবন জ্বলে-পুড়ে মরবি।

সারাদিন গৌরী এই কথা নিয়ে ভেবেছে। কেষ্টর কাছে এ প্রসঙ্গ পাড়তে গিয়েও লজ্জায় পারেনি। কথায় কথায় বলে, চিনু মেয়েটা খুব ভাল।

কেষ্ট শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানছিল। জিজ্ঞেস করে, কে চিনু, ঐ পিনাকীর বউ ?

—হ্যাঁ। পরে নীচু গলায় বলে, জানেন কেষ্টদা, ওদের বিয়ে হয়নি।

—জানি।

—কি করে জানলেন ?

—যাদের বিয়ে হয়নি, তারাই এ বাড়িতে থাকে।

—চিনু তো বিয়ে করতে চায়, ঐ ভদ্রলোকই তো রাজী হচ্ছেন না।

—পরে দুঃখ পাবে।

—সত্যি কেষ্টদা, চিনু চায় ছেলেপিলে, ঘরসংসার।

—সব মেয়েই তাই চায়।

গৌরী সহজ গলায় হেসে বলে, কই, আমি তো চাইনি?

—চাইবে।

—কবে?

—আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশু।

—তখন কি হবে?

—বিয়ে।

গৌরী লজ্জায় আরক্ত হয়ে ওঠে। কেষ্ট বলে, বিয়ের জন্যেই তো তৈরি হচ্ছি গৌরী! ভেবেছিলাম দু'-এক মাসের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে। বাড়ি ভাগ করা, আলাদা থাকার বিলিব্যবস্থা করা, কিন্তু দেখছি আরও কিছু দিন সময় লাগবে।

গৌরী চুপ করে থাকে, একটু পরে বলে, আমার জন্যে আপনার অনেক কষ্ট হল, না কেষ্টদা?

কেষ্ট হাসে, খুব কথা বলতে শিখেছ যে, কে মাস্টার, চিনু নাকি?

গৌরী হেসে উঠে দাঁড়ায়, চিনু আপনার খুব ভক্ত।

—অন্ধ ভক্ত, সে তো আমায় দেখেনি।

—ওকে ডেকে আনব, বেচারী সব সময় একলা থাকে।

—হবে'খন।

গৌরী আবদার ধরে, না, ডেকে আনি, দেখুন না, খুব ভাল মেয়ে।

কেষ্টর ভাল লাগে গৌরীর এই ছেলেমানুষী। হেসে সম্মতি জানায়।

গৌরী ছুটে গিয়ে চিনুকে ধরে আনে। চিনু সবে মাত্র গা ধুয়ে কাপড় ছাড়ছিল। গৌরী কোন ওজর-আপত্তি না শুনে টানতে টানতে তাকে কেষ্টর সামনে হাজির করে বলে, এই যে কেষ্টদা, চিনু।

চিনু গৌরীকে কপট রাগের সঙ্গে বলে, তোর জ্বালায় এখানে থাকা যাবে না দেখছি। এ রকম টানাটানি করলে মানুষ বাঁচে!

—বাঃ, কেষ্টদার সঙ্গে আলাপ করবি না?

কেষ্ট হেসে বলে, তোমার কেষ্টদা এমন একটা কেউ-কেটা নয় যে সবাইকে এসে আলাপ করতে হবে।

গৌরী ততক্ষণে চিনুকে জোর করে মাহুরে বসিয়ে দিয়েছে। চিনু আবহাওযাকে পরিচিত করে নেওযার জন্যে কেষ্টকে প্রশ্ন করে, আপনার সঙ্গে প্রভাতবাবুর খুব আলাপ আছে, না ?

—হ্যাঁ, ও আমার অনেক দিনের বন্ধু।

—আপনি ওঁর লেখা খুব পড়েন বুঝি ?

—একটাও পড়িনি। বই পড়া আমার অভ্যেস নেই।

—উনি কিন্তু আপনার কথা খুব বলেন।

—আমিও ওর কথা খুব বলি।

গৌরী বাধা দিয়ে বলে, কই না তো ! আপনি তো প্রভাতবাবুর কথা আমায় তেমন কিছু বলেন নি ?

—বলার সময় হয়নি।

ধীরে ধীরে এদের গল্পের আসর জমে ওঠে। কেষ্ট দোকান থেকে গরম তেলেভাজা কিনে আনে, চিনু ঘর থেকে মুড়ি আর আচার নিয়ে আসে। সন্ধ্যেবেলাটা তিন জনেরই আনন্দে কেটে যায়।

শ্যামলের বাড়িতে থাকতে আর এক মিনিট ভাল লাগে না, বটুবাবুর জ্বালায় সে অস্থির। ভদ্রলোক সারাক্ষণ বক্‌বক্‌ করেন। বিশেষ করে শ্যামলকে ঠুক্‌তে পারলে, তিনি বোধহয় অপরিসীম আনন্দ পান। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই শ্যামলকে তুলে দেন, এই শ্যামল, ওঠ্। অনেক বেলা হয়ে গেছে।

শ্যামল সাড়া দিতে চায় না। গায়ের কাপড়টা আরও জড়িয়ে শুয়ে পড়ে। কিন্তু বটুবাবু হার মানার পাত্র নন। রীতিমত চেঁচাতে শুরু করেন, ছোট ছেলে, এত ঘুম কেন, আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না।

সকাল সকাল উঠে মুখ-হাত-পা ধুয়ে কোথায় পড়তে বসবে, তা নয়, বেলা ন'টা পর্যন্ত ঘুম। জ্বালাতন বাবা, তেমনি জগৎটা একটা কথাও যদি ছেলেটাকে বলে!

এর মধ্যে ঘুমানো অসম্ভব। বিরক্ত হয়ে শ্যামল উঠে মুখ ধুতে চলে যায়।

এ তো রোজই লেগে আছে। তাছাড়া দেখা হলেই পড়ার কথা।

—কি পড়ছিস দেখাস না কেন? এককালে আমি ভাল ছাত্র ছিলাম।

শ্যামল মৃদুস্বরে উত্তর দেয়, আপনি কেন কষ্ট করবেন, কোচিং ক্লাসে আমি সব পড়ে নিই।

—আহা, বেশি পড়লে তো দোষ নেই, ভালই হবে।

আবার কোন দিন অন্য দিক দিয়ে ঠোকেন, মাথায় অত বড় বড় চুল কেন, খোঁপা বাঁধবি নাকি?

বাইরের লোকের সামনে, সকলে হেসে ওঠে। শ্যামল উত্তর দেয়, চুল কাটার সময় পাইনি।

—বাড়িসুদ্ধ সবাই চুল কাটছে আর তোমার সময় হয় না? হরো নাপিতকে ডাকলেই তো হয়—

—আমি নাপিতের কাছে কাটি না।

—তাই তো, চুলের বাহার নষ্ট হয়ে যাবে, কি বল্? শ্যামল বিরক্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

তারপর এই তো সেদিন রাধা, ওর চেয়ে ন'বছরের ছোট মামাত বোনটা বলছিল, শ্যামলদা, তুমি সিগারেট খাও?

—কে বললে—

—মামা বলছিল।

—বটু মামা, কা'কে বলছিল?

—বাবাকে। তোমার জামা-কাপড়ে সিগারেটের গন্ধ, পকেটে দেশলাই থাকে।

রাগে শ্যামল দাঁতে দাঁত ঘষে, বটুবাবু যে রোজ তার জামা-কাপড় ঘেঁটে দেখেন এ বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। সেদিনই রাধার হাতে অনেকগুলো লজেন্স দিয়ে বলে, রাধা খুব ভালো মেয়ে। বটু মামা আমার নামে কি বলে, আমায় সব বলে দিস। তোকে আরও লজেন্স দেব।

আজ সকালে আর-এক ব্যাপার নিয়ে বটুবাবুর সঙ্গে তার খটাখটি লাগলো। নাওয়া সেরে হাতে বই নিয়ে শ্যামল অন্য দিনের চেয়ে সকাল সকালই বার হচ্ছিল। বটুবাবু ডাকলেন, এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছিস?

—স্কুলে।

—এখনও তো সাড়ে ন'টা বাজেনি।

—একটু দরকার আছে।

—কোথায়?

শ্যামলের আর ধৈর্য থাকে না। ফস করে বলে ফেলে, সে খোঁজে আপনার দরকার কি?

বটুবাবু জবাব শুনে রেগে অস্থির, কি, আমার কথাটার উত্তর দেবে না। এমন লাটসাহেব তুমি?

—তা অত বাজে বকছেন কেন, কি দরকার তাই বলুন না?

বটুবাবু চিৎকার শুরু করে দেন, এ বাড়িতে আমি আর এক মিনিট থাকবো না। যে বাড়ির ছেলেরা গুরুজনদের সম্মান রেখে কথা বলতে জানে না, সেখানে আমি—

রান্নাঘর থেকে পিসিমা, ওপর থেকে জগৎবাবু সকলেই ছুটে আসেন। জগৎবাবু যদিও বোঝেন বটুবাবু অনেক বাড়িয়ে বলছেন

তবু বলতে হল, শ্যামল, বড়দের সঙ্গে কখনও অমন ভাবে কথা বলবে না! মাপ চাও।

শ্যামলের আত্মসম্মানে লাগে। সত্যিই তো ওর কোন দোষ নেই। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে যে তাকে সর্বক্ষণ বিরক্ত করে তার কাছে মাপ চাইতে হবে কেন? চোখ ফেটে তার জল বেরিয়ে আসে। জগৎবাবু আর পিসিমাকে উদ্দেশ্য করে বলে, আমি তোমাদের কাছে একশো বার মাপ চাইছি যদি কিছু অন্যায় করে থাকি, কিন্তু বটুমামার কাছে নয়।

এই বলেই সে বাড়ি থেকে হন হন করে বেরিয়ে গেল, একবারও পেছন দিকে না ফিরে।

বটুবাবু ফোড়ন কাটেন, দেখলে ছেলের মেজাজ, তোমাদের গ্রাহ্য করে, ভাবো?

জগৎবাবু বটুবাবুকে বোঝাতে চেষ্টা করেন, ছোট ছেলে, ওর কথা কি অত মনে করলে চলে? তুমি বরং আমার কাছেই শোও। বটুবাবু মাথা নাড়েন, না, ঐ ঘরেই থাকবো। ও যে কত বড় শয়তান, তা প্রমাণ করে তবে আমার শান্তি।

সকালবেলাই এই অপ্রীতিকর ঘটনায় শ্যামলের মন ভারী হয়ে ওঠে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে অন্য দিনের মত বিদ্যাভবনের কাছাকাছি এক জানাশোনা মনোহারীর দোকানে বইগুলো রেখে দেয়, আবার বাড়ি ফেরার পথে নিয়ে যাবে বলে। আজ তার দেবেনদার কাছে যেতে আর ইচ্ছে করে না। অনেক দিন বাদে মদনের কথা মনে পড়ে যায়।

বাড়িতে মদন ছিল না। সেখান থেকে বেরিয়ে শ্যামল আড্ডা-সঙ্ঘের পাথরের ওপর চুপচাপ বসে পড়ে। কাজের দিন, স্কুল-কলেজ আর অফিস যাবার তাড়ায় সবাই ব্যস্ত, তাই আড্ডা-সঙ্ঘের আসর

একেবারে ফাঁকা। মদনের বন্ধু বিপিন সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। শ্যামলকে দেখে জিজ্ঞেস করে, মদনকে খুঁজছ ?

—হ্যাঁ।

—মন্টুদার বাড়িতে আছে।

—তুমি তো ওদিকে যাচ্ছ, ওকে ডেকে দাও না।

খানিক বাদে মদন এল। শ্যামলের কাছে বসে প্রশ্ন করে, হঠাৎ কি মনে করে ?

—এমনি।

—এমনি তো আর তুই আমার কাছে আসিস না ?

—বাড়িতে আর ভাল লাগছে না।

—কি হয়েছে ?

—ঝগড়া-ঝাটি। বটু হতভাগা ! ও শালা আর যাবে না।

—বটুমামা ! তা তোর পেছনে লেগেছে কেন ?

—কে জানে ! মামা পিসিমা আমায় ভালোবাসে। ও সহ্য করতে পারে না। শ্যামল মদনকে অনেকগুলো ঘটনা বলে, সম্প্রতি বটুবাবুর সঙ্গে যা ঘটেছে সব।

শুনে মদন বলে, বটুমামা কিন্তু তোকে মুস্কিলে ফেলতে পারে।

—আমিও ছেড়ে কথা কইব না, ওর ওস্তাদী বার করব।

—কি করবি ?

—সে দেখিস—

শ্যামল যদিও দম্ভ করে বললে বটুবাবুর ওপর প্রতিশোধ নেবে, কিন্তু মনে মনে সে এখনও কিছু ঠিক করতে পারেনি। তবু মদনের সঙ্গে আলাপ করে তার মন অনেক হাল্কা হয়। কথায় কথায় মন্টুদার কথা ওঠে। মদন বলে, মন্টুদার জন্যে সত্যিই কষ্ট হয়। খালি দুঃখের গান করছে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

—নন্দিতা কি বলে?

—সে আর বলবে কি করে, দেখ না, বাড়ির জানালা, দরজা সব বন্ধ, বেরুবারও হুকুম নেই।

—তা হলে?

—তা হলে আর কি। শুধু স্কুলে যায় আর আসে, মন্টুদার সে সময় অফিস। চিঠিপত্রও লিখতে পারে না। মন্টুদা আজ-কাল আড্ডা-সভ্যেও আসে না।

—ট্র্যাজেডি।

—তুই একটা কাজ করবি?

—কি?

—মন্টুদার একটা চিঠি নন্দিতাকে দিতে পারবি?

—এ আর এমন কি! সুযোগ থাকলে নিশ্চয়ই।

—নন্দিতা যখন ইস্কুলে যায়। ঠিক সোয়া দশটার সময় ও বাড়ি থেকে বেরোয়। সঙ্গে কিন্তু লোক থাকে।

—দেখি কি করতে পারি। চিঠিটা দে, আজই দিয়ে দিই। আবার কবে আসব—

মদন শ্যামলকে টেনে তোলে, চল মন্টুদার কাছে, বেচারী খুব খুশি হবে।

পথে যেতে যেতে শ্যামল বলে, মন্টুদাকে বলে আমায় টাকা পাইয়ে দিস কিন্তু।

—নিশ্চয়ই।

—মেয়েটাকে ভাল করে দেখিয়ে দিবি। আমি ঠিক চিনি না।

মন্টুদা কথা শুনে গলে পড়েন, এ যদি পার শ্যামল, আমি তোমার কেনা চাকর হয়ে থাকব। শ্যামল ও মদন যুগপৎ বলে ওঠে, ছি ছি, ও কি বলছেন মন্টুদা!

মন্টুদার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে শ্যামল আর মদন হাজির হল নন্দিতার স্কুলের সামনে। শ্যামল জিজ্ঞেস করে, এই নাকি, এখানে তো আমি প্রায়ই আসি।

—মেয়েদের ইস্কুলে?

—দূর গাধা। স্কুলের সামনে বইএর দোকান দেখছিস না? নতুন পুরোন দু'রকম বই-ই বিক্রি করে। আমার খদ্দের।

—ওখানে কি করবি?

—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

—মানে?

—পোস্ট অফিস। দোকানের ওই ছোকরাটার সঙ্গে আমার খুব ভাব আছে। মন্টুদার চিঠিগুলো রেখে যাব, নন্দিতা নিয়ে যাবে। উত্তর হয় ডাকে ছাড়বে, নয় এখানে দিয়ে যাবে। ওকে কিছু পয়সা দিলেই হবে।

মদন উৎসাহিত হয়, বেশ বুদ্ধি করেছিস্। ব্যবস্থা করে ফেল, নন্দিতার স্কুলে আসার সময় হল।

দোকানের মালিকের বয়স কম। শ্যামল সব কিছু বুঝিয়ে বলে, মনে রাখবেন স্যার, নাম নন্দিতা।

ভদ্রলোক হাসেন, এসব মিষ্টি নাম কি আর ভোলা যায়?

—একটা বইয়ের ভিতর করে দেবেন। অন্য কারুর হাতে যেন না পড়ে, তাহলেই কাণ্ড বাধবে।

—সে বিষয় নিশ্চিন্ত থাকুন, এ রকম অনেক করেছি।

টেবিলের ওপর কয়েকখানা দোকানের নাম-লেখা রুটিন পড়ে ছিল। শ্যামল ক'খানা তুলে নেয়। চিঠি-পিছু আট আনা পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করে শ্যামল বেরিয়ে আসে।

মদন জিজ্ঞেস করে, হাতে ওগুলো কি রে?

রুটিনের কাগজ, ঐ দোকানের বিজ্ঞাপন।

—কি করবি ?

—বিলি করবো। তোর কাছে পেন্সিল আছে ?

মদন কলম বার করে দেয়। রুটিনের জন্যে লাইনকাটা কাগজে যেখানটায় দোকানের নাম লেখা আছে তার কাছে তীর চিহ্ন দিয়ে শ্যামল লেখে, এখানে মন্টুদার চিঠি আছে, আপনার নাম বললেই দিয়ে দেবে।

মদন ঠেলা মারে, ঐ যে নন্দিতা আসছে।

চারটি মেয়ে একসঙ্গে আসছিল। সঙ্গের লোকটি বোধ হয় মোড় পর্যন্ত এসে চলে গেছে। শ্যামল জিজ্ঞেস করে, কোনটা ?

—একেবারে ডানদিকে, ঐ যে চুলখোলা, গোলাপী শাড়ী-পরা—

—ঠিক আছে, দাঁড়া আমি আসছি।

মদন ফুটপাথে উঠে দাঁড়ায়। শ্যামল সোজা মেয়েদের দিকে এগিয়ে যায়।

—রুটিন পেপার, ফ্রী রুটিন পেপার, বলে শ্যামল একরকম জোর করেই তাদের হাতে কাগজ ধরিয়ে দেয়।

মেয়েরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে, বাবা, বাবা। এদের জ্বালায় অস্থির।

শ্যামল আসল কাগজটি নন্দিতার দিকে এগিয়ে লেখা কথাগুলোর দিকে আঙুল রেখে বলে, এই যে—

নন্দিতা দাঁড়িয়ে লেখাটা পড়ে, সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে শ্যামলের দিকে তাকিয়ে নীরবে ধন্যবাদ জানায়। অন্য মেয়ে তিনটি এগিয়ে গিয়েছিল। তারা পিছন ফিরে তাকাতেই নন্দিতা রুটিনটা খাতার তলায় নিয়ে দ্রুত-পায়ে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

মেয়েরা চলে গেলে শ্যামল মদনের কাছে ফিরে মুরুব্বি চালে বলে, কাজ হাসিল।

—সত্যি! লেখাটা ও পড়েছে?

শ্যামল হাসে, চোখে চোখে যে কথা হয়ে গেল।

শ্যামলের অনুমান যে মিথ্যে নয় তা তখনই বোঝা গেল। মদন বলে, ঐ দেখ, নন্দিতা দোকানে ঢুকছে।

—চালাক আছে, অন্য মেয়েদের স্কুলে ছেড়ে এসেছে।

নন্দিতা দোকান থেকে চলে যেতেই শ্যামল গিয়ে হাজির হয়। দোকানদার হেসে বলে, চিঠিটা নিয়ে গেছে।

—দেখলাম, এসে কি বললে?

—কি আর বলবে, উঃ আঃ করতে লাগল, আমি নাম জিজ্ঞেস করলাম।

—বই-এর মধ্যে করে দিয়েছেন তো?

—নিশ্চয়, মেঘদূতের কাব্য।

শ্যামল হেসে ফেলে, আপনি সত্যিই কবি।

ভদ্রলোক অমায়িক হাসেন, ব্যবসাদারও। বই-এর দাম তিন টাকাও ঐ সঙ্গে দিয়ে দেবেন।

শ্যামল আর মদন মনুদার সঙ্গে গিয়ে দেখা করে। মনুদা আনন্দে বিগলিত হয়ে আর সেদিন অফিস গেলেন না। সিনেমায় আর রেস্টু-রেণ্টে তাদের আমোদে কাটল।

প্রভাত অরুণাদের বাড়ির ছেলের মতই হয়ে গেছে। অরুণার বাবা রমেশ দত্ত পাটের দালালী করে অনেক টাকা করেছেন। তার উপর শেয়ার-বাজারেও যাতায়াত ছিল। ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন থাকায় বাড়ি-গাড়ী সবই করেছেন। প্রভাতকে তিনি আন্তরিক স্নেহ করেন। অরুণার মা মোটা-সোটা ভাল মানুষ, সারাক্ষণ ঠাকুর-দেবতা নিয়েই থাকেন। প্রভাত তাঁরও মন জয় করেছে, সময় সময় ধর্মবিষয়ে আলোচনা করেন।

তিনি কত সময় অরুণাকে বলেন, দেখে শেখ প্রভাতকে। এম-এ পাস, বই লিখেছে কত, কিন্তু কি ঠাকুর-দেবতায় বিশ্বাস।

অরুণা ঠাট্টা করে বলে, ও-সব লোক-দেখানো!

—তোরা লোক দেখিয়েই ভক্তি কর না।

অরুণা প্রভাতকে বলে, মার তো আপনার সব-কিছু ভাল লাগে।

—তাই তো দেখছি।

—হবে না কেন? মা যা বলেন আপনি তাইতেই সায় দেন।

প্রভাত হাসে, আমি যে সকলের সঙ্গে ভালো করে মিশতে চাই, একলা থাকি—

অরুণা নরম গলায় জিজ্ঞেস করে, আপনার বাড়ির সবাই—

—এলাহাবাদে।

—আপনি যান না?

—কখনো-সখনো। ওইখানেই আমাদের বাড়ি।

অরুণা পাকামি করে, আপনি এখনও বিয়ে করেন নি কেন?

প্রভাত হেসে উত্তর দেয়, কেউ করেনি বলে।

—মা কিছু বলেন না? -

— দাদাদের বিয়ে দিয়ে এত ঝামেলায় আছেন যে আমার কথা আর ভাবেন না।

অরুণা চটে যায়, আপনার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না, সব বানিয়ে বানিয়ে বলছেন।

প্রভাত হেসে ফেলে, তুমি ঠিক ধরেছ, আশ্চর্য বুদ্ধি খুলছে দিন দিন! আমি একটা গল্পের প্লট বলছিলাম—

অরুণার মুখ লাল হয়ে ওঠে, যান, আর আপনার সঙ্গে কথা বলব না।

—আহা, রাগ করছো কেন, দাঁড়াও, এবার সত্যি কথা বলছি।

—না আমি শুনব না, কিছুতেই না। বলে কানে আঙ্গুল দিয়ে অরুণা বসে থাকে।

প্রভাত কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। টেবিল থেকে একটা কাগজ নিয়ে লিখতে বসে। অরুণার জানতে ইচ্ছে করে প্রভাত কি লিখছে, কিন্তু মান খুইয়ে জিজ্ঞেস করতে পারে না। প্রভাতই তার কাছে কাগজটা এগিয়ে দেয়। অরুণা দেখে বড় বড় করে লেখা রয়েছে, "কে বকেছে, কে মেরেছে, কে দিয়েছে গাল?" একবার বলতো খুকী, তাকে আমি খুব বকে দেব।

অরুণা হেসে গড়িয়ে পড়ে। বাবা, আপনার সঙ্গে কেউ পারবে না, ভাগ্যি বিয়ে হয়নি, বউকে জ্বালিয়ে মারতেন তাহলে।

এই ধরনের হাল্কা হাসি-ঠাট্টার মধ্যে অরুণা জিজ্ঞেস করে বসে, আচ্ছা বলুন তো, আমি কি রকম মেয়ে?

—খু—উ—ব ভাল।

—সত্যি বলুন না?

—বলছি তো, ভীষণ—ভীষণ ভালো।

অরুণা তবু প্যান প্যান করে, না, আপনি নিশ্চয় ঠাট্টা করছেন।

—মোটেই না।

—কলেজের মেয়েরা কিন্তু আমায় বলে পাকা।

প্রভাত ফোড়ন কাটে, একটু বেশি।

—তবে যে বলছিলেন আমি ভালো মেয়ে?

—বাঃ, পাকা কি খারাপ? পাকা আম বুঝি ভালো হয় না?

অরুণা আবার হেসে ফেলে, আপনি বিচ্ছিরি লোক। রাগাও যায় না, যা বোকা-বোকা কথা বলেন।

অরুণার বাবা এসে ঘরে ঢোকেন, কি রে খুকী, আবার কি আবদার হচ্ছে?

প্রভাত উঠে দাঁড়ায়, না, জিজ্ঞেস করছিল, আম পাকা খেতে ভাল, না কাঁচা—

রমেশবাবু হা-হা করে হাসেন, এ আবার জিজ্ঞেস করতে হয় নাকি? পাকা আম সব সময় ভালো। আমাদের ছোটবেলায় কি আমই না খেয়েছি, সে সব কথা মনে হলে এখনও জিবে জল আসে।

অরুণা হাসি চাপতে চাপতে উঠে যায়। প্রভাত রমেশবাবুর সঙ্গে গভীর মনোযোগের সঙ্গে আম-তত্ত্ব আলোচনা করতে থাকে। হঠাৎ রমেশবাবু জিজ্ঞেস করেন, বই লিখে তোমার ভালো রোজগার হয়?

—বিশেষ আর কি, চলে যায়।

—তবে এম-এ পাস করে শুধু ঐ নিযে পড়ে আছো কেন? চাকরী করলে তো পারো?

—দিচ্ছে কে বলুন?

—দিলে করবে?

—যদি কেরানীগিরি না হয়।

রমেশবাবু খুশি হয়ে বললেন, কেরানী হতে তোমায় বলবো কেন? কাল আমার অফিসে এস, ক্যানিং স্ট্রীটে।

—আপনার অফিসে, কখন?

—সকালের দিকেই এস। আমারই জানাশোনা ফারমে একজন বিশ্বাসী লোক খুঁজছে। অন্তত আড়াই শ' থেকে তিন শ' টাকা মাইনে আরম্ভ। আমি বলে দিলে তোমার হযে যাবে।

কৃতজ্ঞতায় প্রভাতের চোখ সজল হযে ওঠে, তাহলে সত্যিই বড় উপকার হয়। একটা বাঁধাধরা রোজগার থাকলে ভাবনা থাকে না।

—সে তো বটেই। তাছাড়া তুমি লেখক, নাম হলে বই থেকেও টাকা পাবে।

—বেশি টাকা আমি চাই না, তবে মা'র শেষ জীবনটা যদি সুখে রাখতে পারি।

রমেশবাবু প্রভাতের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবেন।

অরুণার বাবার সুপারিশে তিন শো টাকা মাইনের চাকরী পেয়ে অবধি প্রভাতের জীবন অনেকটা বদলে গেছে। আর সে সময়-অসময় আশুদার দোকানে গিয়ে আড্ডা মারতে পারে না। আশুদা বলেন, খুব ভালো কথা প্রভাত, তোমাদের উন্নতি দেখলে বড় আনন্দ হয়। দেখো, কেষ্টর জন্যেও যদি কিছু ব্যবস্থা করতে পার।

আশুদা যে কেষ্টর জন্যে সব সময় চিন্তা করেন তা প্রভাতের অজানা ছিল না। বলে, কেষ্টটা যে আমার চেয়েও পাগল আশুদা, ম্যাট্রিকটা পর্যন্ত পাস করলো না।

—তা আর জানিনে! এত বুদ্ধি, কিন্তু বড় গোঁয়ার-গোবিন্দ। আবার তেমনি একরোখা। ওর মনটা বোঝা শক্ত। আমার কাছে আসা তো প্রায় ছেড়েই দিয়েছে, দেখো, তুমি আবার ফাঁকি দিও না।

প্রভাত হাসে, কি যে বলেন, সকালের চা এখানে না খেলে আমার লেখাই বার হয় না।

চাকরী নিয়ে আর-এক মুস্কিল হল প্রভাতের। ঠিকমত সে বেলারাণীর কাছে হাজিরা দিতে পারে না। আজ রবিবার, তাই সাত দিন পরে বেলারাণীর বাড়ি এলো। বেলারাণীও ছাড়ার পাত্রী নয়। জিজ্ঞেস করে, কি, পথ ভুলে নাকি?

—না, কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

—কি এমন কাজ শুনি, কুমারী ছাত্রী পড়ানো?

—কি যে বলেন।

বেলারাণীর জিদ্ চেপে যায়, সত্যি বলুন না মেয়েদের কি পড়ান?

—কেন, বই-এ যা লেখা থাকে।

—কি জানি, আমার মনে হয় আপনার বয়সী মাস্টারের সঙ্গে ছাত্রীবা প্রেম করে, পড়ে না এক পাতাও।

—এ আপনি কি বলছেন?

—সত্যি করে বলুন তো অরুণাকে আপনি ভালবাসেন কি না?

প্রভাত দৃঢ় অথচ সংযত স্বরে উত্তব দেয়, বাসি।

—তবে? এতক্ষণ যে অস্বীকার করছিলেন?

—এ কথা তো জিজ্ঞেস করেন নি।

বেলারাণীর মাথায যেন আজ ভূত চেপেছে, অরুণার বয়স কত?

—আঠারো-উনিশ।

—কি আছে তার?

প্রভাত সে-কথাব উত্তর না দিয়ে বলে, আজ বোধ হয় আপনার মন ঠিক নেই। আমি বরং অন্য দিন আসব।

বেলারাণী চেঁচিয়ে ওঠে, না, আমার সব কথার জবাব দিয়ে যান।

—বলুন।

—অরুণার চেহারা ভালো?

—মাঝামাঝি।

—আপনাকে ভালবাসে?

—জানি না।

—আপনি মনে করেন অরুণার বাবা আপনার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন?

না।

—তাহলে অরুণার পেছনে দৌড়চ্ছেন কেন?

—দৌড়ইনি তো।

—দিন নেই রাত নেই, ওর কাছেই তো পড়ে থাকেন।

প্রভাত বিস্মিত হয়, এ কথা কে বললে ?

—আমি জানি।

—ওটা সত্যি নয়। আমি একটা চাকরী পেয়েছি—

—চাকরী ? কোথায় ?

—বড় অফিসে। ভালো মাইনে দেয়, অরুণার বাবা রমেশবাবুই করে দিয়েছেন।

—ও, বেলারাণী গম্ভীর হয়ে যায়। তাহলে লেখা-টেখা ছেড়ে দেবেন ?

—কেন, চাকরী করলে কি লেখা যায় না ?

—আমাদের গল্পের যেগুলো বদলাতে বলেছিলাম—

—বদলে এনেছি, দেখবেন ? প্রভাত পকেট থেকে খাতা বার করে দেয়।

—এখন সময় হবে না, আমি দেখে রাখব পরে।

—আজ তাহলে আসি। প্রভাত উঠে দাঁড়ায়।

—বসুন না, খেয়ে যাবেন।

—আজ আমার একটু তাড়া আছে।

বেলারাণী বিরক্তি চেপে বলে, কবে আসবেন ?

—আজ হবে না, বলেন তো কাল আসতে পারি।

—বেশ, তাই আসবেন। বেলারাণী পেছন ফিরে দাঁড়ায়।

বেলারাণীর ব্যবহারে যদিও প্রভাত খুব বেশি রকম অবাক হয়েছিল কিন্তু এর কারণ সে বুঝতে পারে নি। সারাদিন বেলারাণীর কথাগুলোই মনে মনে মনস্তত্ত্বের কষ্টিপাথরে ঘষে বিচার করার চেষ্টা করেছে, তবু যুক্তি-সঙ্গত কারণ খুঁজে পায়নি। বিকেলবেলা প্রভাত অনন্ত-কেবিনে যাবে বলে দরজায় তালা দিচ্ছিল, নিজের নাম শুনে ফিরে দেখে বিনোদ। বড় গাড়ীতে বসে আছে।

প্রভাত হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে, কি সৌভাগ্য আপনি নিজে ?

—বিনয় করবেন না, বিশেষ দরকার আছে, চলুন।

প্রভাত গাড়ীতে উঠে জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাবেন ?

—চলুন, লেকে যাই।

গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে বিনোদ প্রশ্ন করে, এ ক'দিন আসেন নি কেন ?

—কাজ ছিল।

—বেলা রোজ আপনার খোঁজ করে।

প্রভাত অপ্রতিভ কণ্ঠে বলে, কাল ঠিক যাব।

—তা নয়। বেলার মত মেয়ে যার হাসির দাম একশ' টাকা, সে আপনার খোঁজ করছে—

—আপনি আমার বিষয় কি বললেন ?

—আপনার ছাত্রীর কথা বললাম, বোধ হয় পড়াতে ব্যস্ত আছেন।

প্রভাত এতক্ষণে বুঝতে পারে, কেন আজ বেলারাণী বার বার অরুণার কথা বলে তাকে আঘাত করার চেষ্টা করেছে। এ ঈর্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়। তবু প্রভাতের খট্‌কা লাগে, অরুণাকে বেলারাণীর ঈর্ষার কি থাকতে পারে! বেলারাণী রূপবতী, স্বনামধন্যা এবং ঐশ্বর্যবতী, অরুণা তো তার কাছে অতি সাধারণ।

গাড়ী এসে লেকের ধারে থামে, যে দিকটা অপেক্ষাকৃত নির্জন। প্রভাত নামতে যাচ্ছিল, বিনোদ তাকে সিগারেট এগিয়ে দেয়। প্রভাত কিছু না বলে সিগারেট নেয়। বিনোদ স্টিয়ারিং-এ ভর দেওয়া হাতের ওপর মাথা রেখে আরাম করে বসে। হঠাৎ বিনোদ জলের দিকে তাকিয়ে একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলে, প্রভাত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়।

—এখানে বেলাকে নিয়ে কতদিন এসেছি।

প্রভাত জিজ্ঞেস করে, আজ-কাল আর আসেন না ?

—না। আমার সঙ্গে বেরুতে ওর ভাল লাগে না।

—কেন?

বিনোদ ম্লান হাসে, আমাকে যে পুরোপুরি জেনে ফেলেছে, আর তো দাম নেই।

প্রভাত চুপ করে থাকে।

—জীবনে সুখ নেই প্রভাতবাবু, বড ফাঁকা লাগে। লোকে ভাবে আমার সব আছে, গাড়ী, বাড়ি, টাকা। কিন্তু তারা জানে না আমার কিছু নেই।

প্রভাত আস্তে আস্তে বলে, আপনি বড্ড সেন্টিমেণ্টাল—

—সে যাই বলুন। আমার মত জীবন অতি-বড শত্রুরও যেন না হয়!

—কিন্তু আমার কাছে কি দরকার বললেন না তো?

বিনোদ ম্লান হেসে প্রভাতের দিকে তাকায়, দবকার কথা বলার।

—কথা?

—হ্যাঁ। বিশ্বাস করুন প্রভাতবাবু, প্রাণ খুলে কথা বলারও আমার একটা লোক নেই।

বিনোদ কত কি বলে যায়। প্রভাতের সব চেয়ে বড় গুণ অন্যের কথা সে মন দিয়ে শুনতে পারে। নিজের কথা বলতে সকলেই চায়, কথা শোনার লোকই কম। তাই বোধ হয় প্রভাতের আদর অনেকের কাছে।

বাড়ি ফেরার সময় বিনোদ প্রশ্ন করে, আপনার লেখা কোন নাটক আছে?

—কেন বলুন তো?

—আমার বাড়িতে পাড়ার একটা ক্লাব আছে। মাঝে মাঝে তারা থিয়েটার করে। নতুন নাটক খুঁজছে, আছে না কি?

প্রভাত উৎসাহিত হয়, নিশ্চয় দেবো, নাটকটা ধারাবাহিক ভাবে ছায়ামঞ্চে বেরিয়েছিল।

—ক'টি মেয়ে-চরিত্র ?

—চারটি।

বিনোদ বলে, দু'টি মেয়ে আমাদের জানা আছে।

—অ্যামেচার ?

—হ্যাঁ, আমেচারই। তবে টাকা নেয়, চল্লিশ কিংবা পঞ্চাশ যে রকম খাটনী।

—সে রকম মেয়ে আমিও দিতে পারি। চিন্ময়ী, আমার এক বন্ধুর স্ত্রী। অ্যামেচারে বেশ ভাল অভিনয় করে। অবস্থা বিশেষ ভাল নয়, তাই টাকা নেয়।

বিনোদ খুশি হয়ে বলে, তাহলে আজই নাটকটা দেবেন। যত শীঘ্র হয় আবার রিহার্সেল শুরু করতে হবে কিনা ?

মানুষ যে পথে নিজের জীবনকে চালাবার চেষ্টা করে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা হয়ে ওঠে না। কেষ্ট এতদিন ভেবেছিল গৌরীকে বুঝিয়ে সে নিজের মত করে গড়ে তুলবে, ক্রমে সে-আশা সুদূরপরাহত বলে মনে হতে লাগল। গৌরীর মনে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে তাকে অস্বীকার করার ক্ষমতা কেষ্টর না থাকলেও স্বীকার করে নিতেও সে পারে না, দিনের পর দিন দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়েছে।

কেষ্ট বলে রোজগার আমাদের করতেই হবে যদি সংসার পাততে চাও। টাকা না হলে চলবে কি করে ?

গৌরী সরোষে উত্তর দেয়, তাই বলে মিথ্যে কথা বলে—

—সত্যি-মিথ্যে তুমি কি বোঝ, সারা দুনিয়াটাই মিথ্যে। আজকের

দিনে মাস্টার মিথ্যে, ছাত্র মিথ্যে, কেরানী মিথ্যে, ব্যবসাদার মিথ্যে। কে মিথ্যে নয়?

গৌরীর চোখে জল এসে যায়, কেষ্টদা, আপনার পায়ে পড়ি, আমার এতদিনের বিশ্বাস ভেঙ্গে দেবেন না।

কেষ্ট বিরক্তির স্বরে বলে, একঘেয়ে কান্না থামাও। চোখে ঠুলি বেঁধে অন্ধ হয়ে থাকতে চাও থাকো, কিন্তু চোখ খুললেই দেখতে পাবে মানুষের সত্যিকারের চেহারা। কী বীভৎস, কী কুৎসিত! ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠিরের জন্যে কোন জায়গা নেই এখানে, যা তোমার ন্যায্য পাওনা, তা নিতে গেলেও ঘুষ দিতে হয়—

গৌরী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, কোন কথাই তার কানে যায় না। ধরাগলায় বলে, হোক না সবাই খারাপ, আমরা কেন হব?

কেষ্ট জ্বলে ওঠে, চোরের রাজত্বে বাস করতে হলে নিজে চোর হতে হবে—

—যদি না হই—

—মরবে। সবাই তোমার ওপর দিয়ে মাড়িয়ে চলে যাবে।

—আর আমি পারছি না।

কেষ্ট ধমকে ওঠে, পারতে হবে।

গৌরী কাপড়ে চোখ মুছে বলে, বলুন কি করবো?

কেষ্ট গৌরীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু ভেবে নেয়। তারপর সহজ গলায় বলে, মুখ ধুয়ে, সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে এস।

গৌরী উঠে পড়ে। যন্ত্রচালিতের মত ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। চিনুকে বাইরে ডেকে বলে, আমার মাথায় সিঁদুর পরিয়ে দে।

চিনু গৌরীর ফোলা ফোলা চোখ দেখে আশ্চর্য হয়, কি হয়েছে গৌরী?

কান্নায় গৌরীর গলা ধরে আসে, এখন বলতে পারছি না, সিঁদুর পরিয়ে দে।

ঘরে পিনাকী না থাকলে চিনু জোর করে গৌরীকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে সব কথা শুনে নিত। উপায় না থাকায় তাড়াতাড়ি সিঁদুর এনে গৌরীর মাথায় দেয়, এ নকল সিঁদুর যেন সত্যি হয়।

বলতে গিয়ে চিনুরও চোখ ছলছল করে ওঠে।

কেষ্ট গৌরীর জন্মে অপেক্ষা করছিল। ফিরে আসতেই বলে, বাঃ, এই তো বেশ বৌ-বৌ দেখাচ্ছে, চুলটা খুলে ফেল। যা শাড়ী পরে আছো, তাইতেই চলবে।

আধ ঘণ্টার ভেতরে তারা তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লো বালিগঞ্জের উদ্দেশে। কেষ্ট আগেই সব কথা গৌরীকে বলেছিল, কেমন করে ছেলেটিকে চাপা দিয়ে গাড়ী চলে যায়। কি ভাবে সে দু'বার টাকা নিয়ে এসেছে এবং এবার গৌরীকে নিয়ে সে শেষবারের মত টাকা সংগ্রহ করতে যাচ্ছে।

ট্রাম থেকে নেমে তারা রিক্সা করে বাড়ির সামনে এসে হাজির হ'ল। ভয়ে, ঘেন্নায় বার বার গৌরীর চোখ জলে ভরে যায়। কেষ্টর সেদিকে নজর নেই, প্ল্যানটা ঠিক করে নিচ্ছে।

কর্তা-গিন্নী বেড়াতে গিয়েছিলেন, ফিরেই ঘরে এদের দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কোন কথার আগেই গৌরী কেঁদে ফেলে।

ভদ্রমহিলা কেষ্টকে বলেন, আপনার স্ত্রী বুঝি—এরই ভাই ?

কেষ্ট নীরবে সম্মতি জানায়।

ছেলেটি যে মারা গেছে, তা বুঝতে এদের এতটুকু কষ্ট হয় না। বিশেষ করে গৌরীর চেহারা দেখে, রুক্ষ চুল, চোখ কান্নায় ভরা। কর্তা মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, কবে ?

কেষ্ট শান্ত স্বরে উত্তর দেয়, চার দিন আগে।

—ডাক্তাররা কিছু করতে পারলে না ?

—না

—আহা! আপনার স্ত্রীকে দেখে বড় কষ্ট হচ্ছে। কি করে ওঁকে বোঝাই—

—ও যদি বা বুঝবে, এর মা। মানে আমার শাশুড়ী?

তরুণী গিন্নী-মা বলেন, মোটর চালানো আমি ছেড়ে দিয়েছি, এত বড় অন্যায় আমি করেছি—

গৌরী কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ বলে ওঠে, আপনার কি দোষ, সবই নিয়তি।

গৌরীকে কথা বলতে দেখে ভদ্রমহিলা সত্যি খুশি হন। আপনাদের যা ক্ষতি করেছি, তা তো মেটাতে পারবো না। তবে আমাদের ক্ষমতায় যা কুলোয়, সবই করবো।

কান্নাকাটি চললো অনেকক্ষণ। কর্তা বিচক্ষণ লোক। এক সময় কেষ্টর হাতে পাঁচশো টাকার নোটের খামটা ধরিয়ে দেন। কেষ্ট নিরাসক্ত ভাবে নোটগুলি গৌরীর আঁচলে বেঁধে দেয়।

তারা যখন বাইরে এসে রিক্সায় পাশাপাশি বসে, তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। গৌরী কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কেষ্ট চুপ করেই বসে থাকে। কিছু দূর আসার পর যে মিষ্টির দোকানের সামনে ছেলেটি চাপা পড়েছিল, সেখানে কেষ্ট রিক্সা থামাতে বলে। মিষ্টিওয়ালাকে জিজ্ঞেস করতে হয় না। নিজে থেকেই বলে, নমস্কার বাবু। ছোকরা ভাল আছে, ক'দিন থেকে কাজে লেগেছে। ইঙ্গিতে দেখিয়ে দেয়।

মোটা সোটা ছেলেটি সন্দেশ বিক্রি করতে ব্যস্ত।

গৌরীর কাছ থেকে পাঁচটা টাকা নিয়ে কেষ্ট মিষ্টিওয়ালার হাতে দেয়।

মিষ্টিওয়ালা নিতে চায় না—না-না, আর কেন দেবেন?

—ছেলেটিকে জামা কিনে দেবেন।

—আপনার দয়ার শরীর, বাবু।

আর কথা না বলে কেষ্ট রিক্সায় উঠে বসে। গৌরী জিজ্ঞেস করে, ছেলেটির কি হয়েছিল?

—ও-ই গাড়ী চাপা পড়েছিল।

রিক্সা তখন চল্‌তে শুরু করেছে, গৌরী মুখ বাড়িয়ে ছেলেটাকে দেখে, কপালে হাত ঠেকায়। কি যেন প্রার্থনা করে।

সেই দিন থেকে গৌরী অনেকখানি বদলে গেল। আর আগের মত ছেলেমানুষিতে তার মন ভরে ওঠে না। সব কিছুই করতে হয় বলে করে। কেষ্টর কোন কথাই সে অমান্য করে না, কিন্তু তাতে প্রাণ নাই। সংসার-অভিজ্ঞ কেষ্ট বোঝে আস্তে আস্তে সয়ে যাবে, এ নিয়ে ঝগড়া করে লাভ নেই। তাই বেশির ভাগ সময় বাইরে বাইরে ঘোরে।

আজকাল গৌরীর নিজেকে নিঃস্ব মনে হয়। এতদিন মানুষের ওপর যে তার খুব বেশি আস্থা ছিল তা নয়, কিন্তু কেষ্টর উপর বিশ্বাস ছিল খুব বেশি। সেই বিশ্বাসের শেকড় কেষ্ট নিজে হাতে উপড়ে ফেলে দিলে। আর সে কিসের ভরসায় বেঁচে থাকবে। তার জীবনের দাঁড়ি-পাল্লার একদিকে ছিল আত্মীয়স্বজন সকলে, আর-একদিকে ছিল একা কেষ্টদা। সেই কেষ্টদাকেই সে বেছে নিয়েছিল আর কিছুর জন্যে নয়, কেষ্টদা প্রকৃত মানুষ বলে।

কেষ্টর নিজের কথাগুলোই ঘুরে ফিরে গৌরীর মনে পড়ে। চোখ খুলে দেখ, দেখবে মানুষের সত্যি চেহারা, কী বীভৎস, কী কুৎসিত। আজ গৌরীর কাছে কেষ্টও যে তাই—সে-ও যে বীভৎস, সে ও যে কুৎসিত। সেই প্রথম দিন যে কেষ্টদা শাড়ী কিনে দিয়েছিল, দোকানে খাইয়েছিল, সে-কথা মনে করে গৌরী কত দিন মিষ্টি স্বপ্ন দেখেছে। আজ যখনই মনে হয় সে সবই লোক-ঠকানো টাকায় তার মন বিষিয়ে ওঠে। তার ভাইও পুড়েছে ঐ টাকায়। গৌরীর চোখে জল ভরে আসে।

আজ বার বার তার রাজেনের কথা মনে পড়ে। রাজেন তাকে সত্যিই ভালবেসেছিল, গাঁ থেকে কলকাতা আসা অবধি সব সময় সে কাছে কাছে থেকেছে। ভাইয়ের অসুখের সময় টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারেনি বলে গৌরী তার প্রতি বিমুখ হযেছিল। টাকার জন্যেই কেষ্টর কাছে আসতে হয়েছিল। এখন বোঝে, রাজেন টাকা রোজগার করতে পারেনি ভালমানুষ বলে। রাজেনকে তার এতদিন মনেই পড়েনি। একথা ভেবে নিজেকে সে ধিক্কার দেয। গৌরী দীর্ঘশ্বাস ফেলে, এখন আর ফেরবার পথ নেই।

এই নতুন জীবনের আস্বাদ না পেলেই বোধ হয় ভালো হত, গৌরী ভাবে। বস্তী থেকে চলে এসে এখানে সংসার পাতার পর থেকেই তার জীবনের তেষ্টা বেড়ে গেছে। এত সুখ এত আনন্দের কোন খবরই সে জানত না। দিনের পর দিন নতুন নতুন স্বপ্নের জাল বুনেছে অথচ একদিনে সব ছিঁড়ে গেল। চিনুর সঙ্গে বসে বসে যুক্তি করেছে বিয়ের পর কেমন করে ঘরকন্না করবে। বাড়ি ভাগ হয়ে গেলে কেষ্টর নিজের জায়গায় সে গৃহিণী হয়ে ঢুকবে। তারপর ছেলেপুলে, ভাবতেই গৌরীর মুখ লজ্জায় লাল হযে ওঠে।

চিনু বলত, দেখিস, তখন আমায চিনতে পারবি না।

গৌরী কপট রাগের সঙ্গে উত্তর দিযেছে, কি যে বলিস, আমি তো একটা ভিকিরী—

—হবি তো রাজরাণী—

এ সবই তো মিথ্যে হয়ে গেল। গৌরী মনে মনে ঠিক করে একথা সে কাউকে বলতে পারবে না, চিনুকেও নয়। এতখানি হার সে কি করে স্বীকার করবে?

চিনু এসে জিজ্ঞেস করবে, কি হয়েছে বল।

—না, কিছু না।

—সত্যি কথা বল না—

গৌরী বিরক্ত হয়, বলছি তো কিছু হয় নি।

—তবে কাঁদছিলি কেন?

—শরীর খারাপ।

চিনু কিছুতেই গৌরীর পেট থেকে কথা বার করতে না পেরে ধরে নেয় কেষ্টর সঙ্গে কোন রকম ঝগড়া হয়েছে।

কলকাতার লোক পাগল হয়ে উঠেছে। আজ বাস বন্ধ, কাল ট্রাম বন্ধ, পরদিন সাধারণ ধর্মঘট। তারপর সরকারের একশ' চুয়াল্লিশ ধারা জারি, আইন-অমান্য আন্দোলন, টিয়ার গ্যাস, লাঠি চার্জ, জেল। পরদিন কাগজে হতাহতের সংখ্যা।

এ ধরনের খবরে কোন বৈচিত্র্য নেই, লেগেই আছে। আজ কাল আর কেউ কারণ জিজ্ঞেস করে না। ছাত্র, শিক্ষক, কর্মী, শ্রমিক কিংবা ব্যবসাদার, কারুর না কারুর অভিযোগের সুযোগ নিয়ে শহরে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি।

দেবেনদার বাড়িতে আজ সবাই জমা হয়েছে। দেবেনদা ইজিচেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায়। তাঁর চোখ-মুখ উত্তেজিত, জোর গলায় বলে চলেন, এ সাধারণ ধর্মঘট সফল করা চাই-ই। যাতে একটাও দোকান না খোলে ট্রাম বাস না চলে। দেশের লোক বুঝুক অন্যায় চিরকাল বেঁচে থাকতে পারে না। ন্যায়কে আমরা ফিরিয়ে আনব। যে মহৎ আদর্শের জন্য হাজার হাজার ভারতবাসী স্বাধীনতা-সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল সেই আদর্শকে আবার মানুষের চোখের সামনে তুলে ধরতে হবে—

দেবেনদা আরও হয়ত বলতেন, কালী থামিয়ে দেয়, অত কথার কি আছে দেবেনবাবু, আপনি হুকুম করুন, আমরা তামিল করব।

—সেই কথাই তো বলছি।

—বেশি কথায় কাজ হয় না।

কালীর দলবল চেঁচিয়ে ওঠে, আমরা কাজ চাই।

দেবেনদা আশ্বাস দেন, কাজ তো তোমরাই করবে। তোমরা নবীন, তোমরাই তো আমাদের ভরসা—

কালী জবাব দেয়, আপনি কিছু ভাববেন না। আমি সব ঠিক করে রেখেছি। কাল দেখবেন কলকাতা শহর ঘুমুচ্ছে। যে পাড়ায় যে দল আছে সকলের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে, সবাই মহড়া রাখবে।

গরম গরম আলাপ আলোচনার পর কালী দলবল নিয়ে চলে গেল। চুনীলাল কিন্তু তখনও বসে ছিল। একটু বাদে মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করে, দেবেনদা এটা কি ঠিক হ'ল ?

—কি ?

—এই কালীর হাতে সব ছেড়ে দেওয়া—

—ও যে কথা শুনতে চায় না।

চুনীলাল বিরক্ত হয়, তাহলে ওকে ত্যাগ করুন।

দেবেনদা হাসেন, ত্যাগ করা সোজা, কিন্তু কালীর মত কাজের লোক ক'টা পাবে ?

—তা হতে পারে, কিন্তু আপনার আদর্শের সঙ্গে যার মিল নেই, তাকে নিয়ে কি করে কাজ করবেন ?

দেবেনদা চুপ করে থাকেন। চুনীলাল দেবেনদাকে সত্যিই শ্রদ্ধা করে, তাঁকে অযথা আঘাত দিতে সে মোটেই চায় না। কিন্তু কালীর ব্যবহারে তার খটকা লাগে, ভাবে এর মধ্যে নিশ্চয় কোথাও গলদ আছে !

—তুমি অত ভেবো না, চুনীলাল। কালী আমার আদর্শ ঠিক বুঝতে পারবে। আজ না হয় দু'দিন পরে। তুমি দেখো, সে নিশ্চয় এমন কিছু করবে না যাতে আমার আদর্শ নীচু হয়, আমাদের মাথা হেঁট হয়।

পরদিন সাধারণ ধর্মঘট হয়েছে পুরোমাত্রায়। এতখানি সফল হবে কালী নিজেও ভাবেনি। সকালের দিকে ট্রাম-বাস বেরিয়েছিল বটে, তবে দু'-তিনটে পোড়াতেই বন্ধ হয়ে গেছে। দু'-একটা দোকান লুঠ করতেই সব দুড়-দাড় বন্ধ করে দিয়েছে। দুপুরের দিকে সত্যিই কলকাতা শহর ঘুমিয়ে পড়ে।

চুনীলালের সঙ্গে শ্যামলের দেখা হয়েছিল, বড় রাস্তার ওপর সে তখন অন্যদের সঙ্গে ট্রাম পোড়াতে ব্যস্ত। চুনীলাল জিজ্ঞেস করে, এ কি করছো শ্যামল ?

—দেখতেই তো পাচ্ছো—

—দেখছি তো ঠিক, পাগলামী করছ, এ তো আমাদের আদর্শ নয় ?

—আদর্শ-ফাদর্শ জানি না, কালীদা যা বলেছে তাই করছি।

চুনীলালের চোখের সামনে ট্রামটা দাউ-দাউ করে জ্বলে ওঠে।

সেই আগুনের মধ্যে চুনীলাল যেন দেখতে পেল দেবেনদার আদর্শ পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

শ্যামলরা হি-হি করে হাসে, হাততালি দিয়ে লাফায়। পুলিসের গাড়ী দেখলে ভোঁ-ভাঁ পালিয়ে যায়।

শ্যামলের সঙ্গে আর-একবার কথা হয়েছিল চুনীলালের। দুপুরের পর। শ্যামলই জিজ্ঞেস করে, কি চুনী, তুমি কিছু করছো না ?

—কি করবো ?

—শুধু বক্তৃতা, কি বল ? ওতে তো আর কোন ভয় নেই।

চুনীলাল ম্লান হাসে, শ্যামল, ট্রামগুলো যে পোড়ালে, জেনো ওগুলো দেশেরই জিনিস, ক্ষতিই হ'ল, লাভ হ'ল না।

—লাভ নেই কি বলছো, প্রচুর লাভ হয়েছে।

—কি রকম ?

শ্যামল গলা খাটো করে বলে, আজ সকালে একটা মনোহারীর দোকান লুঠ করেছি, কিছুতেই দোকান বন্ধ করছিল না। ব্যস, দিয়েছি ব্যাটার দফা সেরে। আমি নিজেই কত টাকার মাল সরিয়েছি জানো ?

—কত ?

—টাকা পঞ্চাশ।

—তাই নাকি ?

—ও তো কিছু না। কালীদা, মাইরি প্রাতঃস্মরণীয় লোক, একটা স্যাক্‌রার দোকান।

—বল কি, সত্যি ?

শ্যামল খেঁকিয়ে ওঠে, আমি কি মিথ্যে বলছি ? স্যাকরার দোকানটা অবিশ্যি বন্ধই ছিল, কালীদা নিজেই গোলমাল বাধিয়ে দরজা ভেঙ্গে লুঠ করেছে। সব রকম যন্ত্র ওর সঙ্গে আছে কি না—

চুনীলাল বিস্মিত হয়। এত কথা সে জানতো না। শ্যামল আবার বলে, তুমি একটা মেয়েছেলে, কিছু করতে পারলে না—

—কি আর পারলাম !

পকেট থেকে এক প্যাকেট দামী সিগারেট বার করে শ্যামল চুনীলালের হাতে দেয়, এই নাও, একটা বিড়ি-সিগারেটের দোকানও লুঠ করেছি। মাসখানেক সিগারেট না কিনে চলে যাবে। শ্যামল আত্ম-প্রসাদের হাসি হাসে।

সারাদিন চুনীলাল এতটুকু শান্তি পায় না। তিন বার সে দেবেনদার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ফিরে এসেছে, উনি বাসায় ছিলেন না। সব কথা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করার জন্যে চুনীলাল ছটফট করেছে। শেষে সন্ধ্যের পর দেখা হ'ল। দেবেনদা উত্তেজিত হয়ে পায়চারী করছেন, কালী নিজের বাহাদুরীর কথা বলে যাচ্ছে, যা বলেছিলাম হ'ল কি না।

একটা ট্রাম বাস চলে নি, স্কুল, কলেজ, অফিস, দোকানপত্র মায় বাজার পর্যন্ত—

দেবেনদা বলে ওঠেন, বাহাদুর কালী। আমি দেখতে পাচ্ছি, দেশে জাগরণ আসছে। কত সহজে লোকে এই সব আন্দোলনে আজ সাড়া দিচ্ছে—

চুনীলাল চেঁচিয়ে বাধা দেয়, দেশের লোক তো সাড়া দেয় নি—

দেবেনদা বিস্মিত হন, কি বলছো চুনীলাল, আজকের ধর্মঘট সার্থক হয়নি ?

—না।

—কেন ?

—দোকান বন্ধ হয়েছে লুঠ করেছেন বলে। লোকে স্কুল কলেজ যায়নি মার খাবার ভয়ে। ট্রাম-বাস চলেনি, আপনারা পুড়িয়েছেন বলে।

উত্তেজনায় চুনীলালের গলা কাঁপছিল। চেঁচাতে গিয়ে চোখে জল এসে যায়, এই আপনার আদর্শ দেবেনদা, গুণ্ডামী—

—চুনীলাল ! দেবেনদা ধমকে ওঠেন। চুনীলাল চোখ নামিয়ে নেয়।

দেবেনদা বলেন, সব কাজেরই ভাল-মন্দ দুটো দিক আছে, শুধু মন্দটা দেখলেই তো হবে না।

—এর মধ্যে কি ভাল আছে আমি তো বুঝতে পারছি না। দোকান লুঠ করে, নিরীহ জনসাধারণকে মারের ভয় দেখিয়ে যদি দেশের উন্নতি করবেন ভেবে থাকেন, তা ভুল, ভয়ঙ্কর ভুল।

—তোমার কাছে আমায় রাজনীতি শিখতে হবে ?

চুনীলাল জোর গলায় বলে, মোটেই না। আমি যা বলছি তা আপনারই কাছে শেখা। সেই দেবেনদার কাছে শেখা যে দেবেনদা দেশকে ভালবাসতো। যে আজ রাজনীতির নামে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করছে, তার কাছে নয়।

দেবেনদার কান লাল হয়ে ওঠে, কি বাজে বকছ—

—আপনি আমায় ভালবাসতেন আমি স্পষ্ট কথা বলি বলে—

কালী ফোড়ন কাটে, কিন্তু তখন বাজে বকৃতে না—

চুনীলাল উত্তেজিত হয়ে ওঠে, দেবেনদা বিশ্বাস করুন আপনি গুণ্ডাদের হাতে পড়েছেন, তারা শিখণ্ডীর মত আপনাকে—

কথা শেষ হতে পারলো না, কালী বিদ্যুদ্বেগে চুনীলালের সামনে এসে দাঁড়ায়, কে গুণ্ডা ?

চুনীলাল আরও চেঁচায়, কে গুণ্ডা বুঝতে পারছো না ?

সঙ্গে সঙ্গে কালী সজোরে চড় মারে চুনীলালের গালে, বেশি ফড় ফড় করলে জানে মেরে দেব। ভাগ—

কালীর রক্তবর্ণ চোখ দেখে কেউ আর চুনীলালকে সাহায্য করতে ভরসা পায় না। চুনীলাল মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। একবার দেবেনদার দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করে সেখান থেকে বেরিয়ে যায়। লজ্জায়, অপমানে সমস্ত শরীর তার জ্বলছে। বিশেষ করে কষ্ট পায় এই ভেবে যে দেবেনদা, কি শ্যামল, কেউ তাকে সাহায্য করতেও এলো না, মুখেও একটা সহানুভূতির কথা পর্যন্ত বললে না।

চুনীলাল সেই ধরনের ছেলে যারা অন্যায়কে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না। কালীর আড্ডা থেকে বেরিয়ে বাড়ি না ফিরে সোজা গেল মদনের কাছে। মদন চুনীলালের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়। জিজ্ঞেস করে, কি ব্যাপার চুনী, এত গম্ভীর কেন ?

চুনীলালের মুখ-চোখ তখনও লাল হয়ে আছে। ধীর স্বরে বলে, শ্যামলকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

—কোথা থেকে ?

—গুণ্ডার আড্ডা থেকে।

মদন চঠকে ওঠে, সে কি ?

চুনীলাল একে একে দেবেনদা, কালী সকলের কথা বলে। মদন বিস্মিত হয়, সে কি, সেই দেবেনদা—

—হ্যাঁ, সেই দেবেনদা। যাঁকে আমি এত শ্রদ্ধা করতাম। যাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম, তোদের কাছে যাঁর কথা এত বলতাম, সেই দেবেনদা—

—গুণ্ডা ?

—তা ছাড়া আর কি! কতকগুলো অশিক্ষিত লোক সমাজের যারা কোন উপকার করতে পারবে না, তারাই ওকে সামনে রেখে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করছে—

—শ্যামলও তাদের দলে—

—তাই ত দেখছি। কালী যখন আমায় মারলে ও একবার এগিয়ে এল না—

মদন একটু ভেবে নিয়ে বলে, এখন কি করা যায় ?

—শ্যামলকে বোঝাতে হবে। তাকে ফিরিয়ে আনা আমাদের কর্তব্য। বিশেষ করে আমার, কারণ আমিই তাকে নিয়ে গিয়েছিলাম।

—বেশ, আমি শ্যামলকে নিয়ে কাল তোর বাড়ি যাব।

পরদিন কথামত মদন শ্যামলকে নিয়ে গেল চুনীলালের বাড়ি। চুনীলাল তাদেরই জন্যে অপেক্ষা করছিল। প্রথমেই জিজ্ঞেস করলে, শ্যামল, কেন তুমি আমার হয়ে কথা বললে না ?

শ্যামল উত্তর দেয়, আমি কি বলব, কালীদা, দেবেনদার সঙ্গে তুমি ঝগড়া করেছ—

—ঝগড়া করিনি, ঠিক কথা বলেছি।

—ঠিক-বেঠিক আমি অত বুঝি না, ওরকম ভাবে কথা বলা তোমার উচিত হয়নি।

চুনীলাল রেগে যায়, তাই বলে ন্যায়-অন্যায় দেখবে না, কেউ ভুল করলে তাকে শোধরাবে না?

—কালীদা কোন দিন কাজে ভুল করে না—

—দুত্তোর কালীদা! দেবেনদার মত একটা অত বড় মানুষ।

শ্যামল তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে, দেবেনদাকে কি এত বড় ভাবো আমি বুঝি না। ও-তো তোমার মত একটা মেয়েছেলে, শুধু লম্বা-চওড়া কথা, কাজের বেলা লবডঙ্কা—

—তোমার মতে কি কাজ মানে লুঠ করা, গুণ্ডামী করা?

—সে তুমি যাই বল, কিছু করতে হবে তো? শুধু লেকচার মেরে কি হবে? দেবেনদা এক জন্ম আগে কি করেছেন সেই গল্প করতেই ব্যস্ত, জেল খেটেছেন, হ্যান্ করেছেন, ত্যান করেছেন, যত সব নিকুচি করেছে।

চুনীলালের আর ধৈর্য থাকে না, তবে তোমার গুরু কে, কালী গুণ্ডা?

—খবর্দার কালীদার নামে যা-তা বলবে না।

শ্যামল মদনকে বলে, কেন আমাকে এখানে ডেকে আনলি?

চুনীলাল উত্তর দেয়, আমি ডাকতে বলেছিলাম।

—কেন?

—তোমাকে দলছাড়া করবার জন্যে।

শ্যামল বিদ্রূপ করে হাসে।

—তুমি যখন আমার কথা শুনলে না, ভেবো না আমি তোমায় ছেড়ে দেব।

শ্যামল আর কথা না বাড়িয়ে হন হন করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। মদন কিছু বুঝতে না পেরে চুনীলালের মুখের দিকে তাকায়।

চুনীলাল মৃদুস্বরে বলে, ছেলেটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে।

অরুণার সিনেমায় যেতে ইচ্ছে হলেই বাবাকে এসে ধরে। রমেশবাবু সব সময় বলেন, কি ভালো ছবি হচ্ছে বল। অরুণা হয়ত বলে, বাপি, নতুন হিন্দী বই এসেছে।

—খবর্দার নয়, হিন্দী বই দেখলে আমার মাথা ধরে যায়।

যদি বলে বাংলা বইএ যাবে? খুব ট্র্যাজিক বই এসেছে।

—পাগল না কি, পয়সা দিয়ে টিকিট করে কাঁদতে যাব?

—তাহলে যাবে কোথায়?

—ইংরিজী ছবি।

—তোমার তো ওই মেট্রো, নয় লাইটহাউস।

—নিশ্চয়, পয়সাই যদি দেবো, ঠাণ্ডা ঘরে বসব।

আজ কিন্তু অরুণা নিজে থেকেই মেট্রোর টিকিট করার জন্যে বাবাকে ধরেছে। রমেশবাবু কপট বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করেন, ব্যাপার কি, তুই বলছিস মেট্রোয় যাবি, ওখানে হিন্দী ছবি দেখাচ্ছে নাকি?

—না বাপি, শেক্সপীয়ারের একটা নাটক। ভীষণ ভাল—

—সর্বনাশ! ওর তো কিছুই বোঝা যাবে না—

—না বাপি, খুব ভাল। প্রভাতদার কাছে আমি সব গল্পটা শুনেছি।

—বেশ, তাহলে প্রভাতেরও একটা টিকিট কাটো, ও আমাকে বুঝিয়ে দেবে।

প্রভাতকে নীচে বসিয়ে রেখে অরুণা রমেশবাবুর অনুমতি নিতে ওপরে এসেছিল। মত পেয়ে, মার কাছ থেকে একটা দশ টাকার নোট চেয়ে নিয়ে প্রভাতকে দেয়।

—বাবা বললেন চারখানা টিকিট কেটে আনতে।

—চারখানা কেন?

—বাবা মা হু'জনে, আমি আর আপনি।

—আমি গিয়ে কি করব?

—বাবাকে বুঝিয়ে দেবেন।

প্রভাত হাসে, উনি বোধ হয় ঠাট্টা করেছেন। তুমি তাই সত্যি ভেবে নিলে?

—ঠাট্টা-ফাট্টা জানি না, আপনাকে যেতেই হবে।

—কালকেই দেখেছি যে।

—দেখলেন কেন?

—বিনোদ ধরে নিয়ে গেল, ও যা খামখেয়ালী।

—বিনোদ, বেলারাণী। এদের ছাড়া আপনার মন ওঠে না।

প্রভাত থামিয়ে দেয়, ঝগড়া করতে হবে না, আমি যাবো, হোল তো?

ইণ্টারভ্যালে অরুণার নির্দেশমত প্রভাত হল থেকে বেরিয়েছিল হুটো চকোলেট আনতে। দোতলার বারান্দায় অনেকেই আইসক্রীম বা পানীয় নিয়ে বসে আছে। বেশির ভাগই বিদেশী। কোণের দিকে হাল্কা নীল রঙের শাড়ী পরে যে মেয়েটি বসেছিল তাকে দেখেই প্রভাত ইতস্তত করে। কিন্তু বেলারাণী তখনি হাতছানি দিয়ে ডাকে, অগত্যা প্রভাতকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই দিকে এগিয়ে যেতে হয়। বেলারাণী যে পুরুষটির সঙ্গে বসে আইসক্রীম খাচ্ছিল, সে প্রভাতের পরিচিত না হলেও অচেনা নয়। অনেক ছবিতে অভিনয় করতে তাকে দেখেছে। বেলারাণী জিজ্ঞেস করে, কি খাবেন বলুন?

—কিছু না।

—তা কি হয়, অন্তত একটা কোকাকোলা। বেলারাণী সঙ্গে সঙ্গে বেয়ারাকে অর্ডার দেয়। ভদ্রলোকটিকে বলে, এর সঙ্গে আলাপ নেই বোধ হয়? লেখক প্রভাত গুহ আর ইনি অভিনেতা পার্থসারথি।

প্রভাত ও পার্থসারথি উভয়ে নমস্কার-বিনিময় করে। বেলারাণী জিজ্ঞেস করে, আজ আবার কার সঙ্গে এলেন ?

প্রভাত না বোঝার ভান করে তাকায়।

—কালই তো বিনোদের সঙ্গে এসেছিলেন শুনলাম।

—অরুণারা—

বেলারাণী হাসে, অরুণারা মানে ?

—মানে ওর মা-বাবা।

—তাই নাকি ? সবাই মিলে। বাঃ শুভদিনটি কবে ?

প্রভাত ওঠবার চেষ্টা করে, কেন মিথ্যে ঠাট্টা করছেন ?

—বসুন না, দরকার আছে।

শো শুরু হবার ঘণ্টা পড়ে। পার্থসারথি এতক্ষণে কথা বলে, চল বেলা, ওঠা যাক। ওয়ার্নিং দিয়েছে—

—তুমি বসগে যাও পার্থ, আমি প্রভাতবাবুর সঙ্গে দু-একটা কথা বলে যাচ্ছি।

প্রভাত তাড়াতাড়ি বলে, আমিও উঠবো।

—অত তাড়া কিসের, কাল তো দেখেছেন।

বেলারাণীর সঙ্গে প্রভাত কিছুতেই পেরে ওঠে না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ও বসে পড়ে। পার্থ উঠে যেতেই বেলারাণী মন্তব্য করে, উঃ, এর জ্বালায় অস্থির ! পাগল করে মারে !

—আপনি দেখছি কারুর ওপর খুশি নন !

—কি করে খুশি হব বলুন ? ঠিক বিনোদের জুড়ি ! আপনিই বলুন, বিনোদের মত লোককে সঙ্গী করা যায় ?

প্রভাত মৃদুস্বরে বলে, বিনোদবাবু তো খারাপ লোক নন !

—খারাপ লোক তো বলিনি, সঙ্গী হিসেবে ভাল নয়। সব সময় কি নাটুকেপনা ভাল লাগে ?

প্রভাত কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। বেলারাণী কথার সুর পাল্টায়, হ্যাঁ, আমাদের এ দিকের সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। সামনের মাস থেকে ছবি তোলা শুরু হবে।

—খুব ভাল কথা, কাল আপনার বাড়ি গিয়ে আলোচনা করব। চলুন, বই আরম্ভ হয়ে গেছে—

বেলারাণী আলতো করে প্রভাতের হাতের উপর চাপ দেয়, আজ আমার বাড়ি পর্যন্ত গাড়ীতে গেলে ভাল হত, পার্থর হাত থেকে বাঁচতাম।

প্রভাত কথা বলতে গিয়ে চুপ করে যায়, দেখে, একদৃষ্টে বেলারাণী তার দিকে তাকিয়ে আছে।

—প্রভাত, আমার এই একটি অনুরোধ রাখবে না?

প্রভাতের অস্বীকার করার আর শক্তি থাকে না। মাথা নীচু করে বলে, আচ্ছা, যাবো

—চল, ভেতরে যাওয়া যাক্।

—শো ভেঙ্গে গেলে আমি এখানে অপেক্ষা করবো।

অন্ধকার হলে ঢুকে দু'জনে দুদিকে চলে যায়, নিজেদের সীটের দিকে। এতক্ষণে প্রভাতের মনে ভয় ঢোকে, তাই তো কি বলবে সে, অরুণার চকোলেটও আনা হয় নি, তার ওপর এত দেরি।

সীটে এসে বসতেই রমেশবাবু জিজ্ঞেস করেন, অরুণার চকোলেট আনতে নিউ-মার্কেট চলে গিয়েছিলে না কি?

প্রভাত ছবির দিকে তাকিয়ে উত্তর দেয়, না, একজনের সঙ্গে কথা বলতে দেরি হয়ে গেল।

অরুণা চুপি চুপি জিজ্ঞেস করে, চকোলেট পান নি?

—না।

—কার সঙ্গে কথা বলছিলেন?

প্রভাত এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে, ঐ ছবি তোলার ব্যাপারে।

তারপর আর এ প্রশ্ন ওঠে না। ছবি দেখতে সকলে ব্যস্ত। কিন্তু মুস্কিল হল শেষ হয়ে যাবার পর!

প্রভাতকে বলতেই হয়, আমি আর আপনাদের সঙ্গে ফিরব না, এক জায়গায় যেতে হবে।

অরুণার মা বললেন, তাই নাকি, আমি ঠিক করেছিলাম আজ আমাদের বাড়িতেই খেয়ে যাবে।

—রোজই তো খাচ্ছি মাসীমা! আজকে একটা বিশেষ দরকার আছে।

কথা বলতে বলতে তারা হলের বাইরে আসে। অরুণা বলে প্রভাতদা, দু'-একটা জায়গা বুঝতে পারি নি, কালকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

—বেশ তো!

সিঁড়ির কাছাকাছি আসতেই বেলারাণীর ডাক শোনা যায়, প্রভাত-বাবু, আমরা এখানে!

প্রভাতকে ইঙ্গিতে জানাতে হয় আসছে বলে। অরুণা এতক্ষণ বেলারাণীকেই লক্ষ্য করছিল, মেক্ আপ করা মুখ, ফাঁপানো চুল আর তার চটুল চাহনী। ভারী গলায় জিজ্ঞেস করে, উনি কে?

—বেলারাণী।

—ও, ওরই সঙ্গে বুঝি ইন্টারভ্যালে কথা হচ্ছিল?

প্রভাত মিথ্যে বলতে পারে না, বলে, হ্যাঁ।

আর কোন কথা না বলে অরুণা দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে রমেশ-বাবুদের সঙ্গে যোগ দেয়।

প্রভাত আসতেই বেলারাণী বলে, সত্যি, অরুণাকে ভারী মিষ্টি দেখতে, কি সুন্দর চুল, ফরসা রঙ্—

প্রভাত সে-কথার উত্তর না দিয়ে বলে, চলুন, নামা যাক্।

পার্থসারথি যে প্রভাতের আসাটা মোটেই পছন্দ করেনি তা কাউকে বলে দিতে হয় না। জিজ্ঞেস করে—আপনি যে বললেন আজ কাজ আছে?

প্রভাত বলে, ছিল, তবে বেলা দেবী বলছেন বইটার দু'-এক জায়গায় ডায়ালগ চেঞ্জ করতে হবে, তাই।

—তাহলে আমি বরং এখান থেকেই বিদায় নিই।

বেলারাণী সহজ গলায় বলে, আচ্ছা, কাল তো সেটে দেখা হবেই।

কথা বলতে বলতে তারা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসে। বেলারাণীর ড্রাইভার সিনেমার সামনেই গাড়ী এনে রেখেছিল। পার্থর কাছে বিদায় নিয়ে বেলারাণী আর প্রভাত পেছনের সীটে উঠে বসে।

গাড়ী চলতে শুরু করে। বেলারাণী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, উঃ, এত সহজে যে পার্থর হাত থেকে নিস্তার পাব ভাবিনি।

—তবে আর কি, আমার এখন ছুটি।

—তাড়া কিসের?

প্রভাত হাসে, পার্থর হাত থেকে যখন রেহাই পেয়েছেন, আমার প্রয়োজনও ফুরিয়েছে।

—না প্রভাত, তোমাকে অনেকগুলো কথা বলার আছে। আজ আমায় খানিকটা সময় দাও। বেলারাণী প্রভাতের ডান হাতটা নিজের কোলের উপব টেনে নেয়, জানি তুমি অবাক হচ্ছো, ভাবছো, এও আমার একটা ঢং, কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি তোমায় সত্যিকারের বন্ধু হিসেবে পেতে চাই।

—সে তো আমার সৌভাগ্য!

—দোহাই তোমার, বই-এর ভাষায় কথা বোলো না। আজ তোমায় অনেকগুলো কথা না বলে শান্তি পাচ্ছি না।

—বলুন।

—গাড়ীতে নয়, বাড়িতে!

বাড়িতে পৌঁছে বেলারাণী ড্রাইভারকে নির্দেশ দেয়, প্রভাতবাবুকে বাড়ি ছাড়তে হবে, ঠিক থেকো!

কত দিন কতবার প্রভাত বেলারাণীর বাড়ি এসেছে, কিন্তু আজ সব কিছু অন্য রকম মনে হয়।

—নীচে নয়, ওপরে চল।

বেলারাণী প্রভাতকে নিয়ে ওপরে উঠে আসে। নীচের চেয়ে ওপরতালা অনেক ভালো করে সাজানো। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বৈঠকখানা, দেশী আসবাবপত্রে ভর্তি, শৌখীন ফরাস তাকিয়ার সুবন্দোবস্ত।

—বস, আমি আসছি।

প্রভাত ফরাসের ওপর গিয়ে বসে, কেমন আড়ষ্ট হয়ে যায়। চেয়ারে বসলেই ভাল হ'ত, প্রভাত ভাবে।

বেলারাণী খুব তাড়াতাড়ি কাপড় বদলে ফিরে আসে। গোলাপী রঙের সাধারণ তাঁতের শাড়ীতে ওকে যেন আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। জিজ্ঞেস করে, আজ এখানে খেয়ে যাবে তো?

—না, একটু অসুবিধে আছে।

—তাহলে জোর করব না, কিছু পান করবে?

—ঠাণ্ডা জল।

বেলারাণী হাসে, তা বলিনি, কোন ড্রিঙ্কস?

—না।

—পান করো না?

—পয়সা কোথায়? ও-সব দামী অভ্যেস্ করতে অনেক টাকার দরকার।

—আমি কিন্তু আজ একটু শেরী খাব, তোমার আপত্তি নেই তো?

—মোটেই না।

পান করতে করতে বেলারাণী বলে, একদিন আমার জীবনের কথা শুনতে চেয়েছিলে মনে আছে, সেদিন বলিনি কিন্তু আজ বলব।

—বেশ তো, বলুন।

—আমার বাবা কে জানিনা। আমার মা থিয়েটারে পার্ট করতেন, নাম ছিল না। তাই শহরের কুখ্যাত নোংরা পল্লীতে আমাদের বাসা ছিল। মা আমাকে খুব যত্নে মানুষ করে। যাতে আমায় দেখতে ভাল হয়, সেদিকে তার সব সময় নজর ছিল। কারণ মা'র নিজের চেহারা ভাল ছিল না। সেই জন্যেই থিয়েটারে নাম করতে পারেনি।

প্রভাত জিজ্ঞেস করে, আপনার মা'র নাম?

—তা জেনে লাভ নেই। মা আমাকে নাচ শেখালেন, গান শেখালেন, যাতে আমি থিয়েটারে কাজ পাই। মা'র চেষ্টায় বারো তের বছরে কাজ পেলাম থিয়েটারে।

—কি পার্ট করতেন?

—সাজাহানে দারার মেয়ে। চন্দ্রগুপ্তে চাণক্যের মেয়ে, এই ধরনের ছোটখাট পার্ট আর প্রায় সব নাটকে নাচতাম, সখী সেজে।

—তারপর?

—এমনি ভাবে তিন চার বৎসর চলল। এর মধ্যে বহু লোকের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। আমার বয়স কম ছিলো, তাই শো'এর পর অনেকে দেখা করতে চাইত, কেউ কেউ বাসায় আসত। রোজগার বেড়ে গেল।

প্রভাত বিস্মিত হয়, মাত্র পনের ষোল বছর বয়স থেকে? আপনার খারাপ লাগতো না?

বেলারাণীর বেশ নেশা হয়েছে। হেসে বলে, খারাপ লাগবে কেন? সেখানে তো বেশি লোক এলে আমাদের গর্ব হত।

—মা বারণ করতেন না ?

—মেয়ের সাফল্যে কি মা দুঃখ পান ?

প্রভাত চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করে, তারপর ?

—মা মারা গেলেন।

—তখন আপনার বয়স কত ?

—সতের কি আঠারো। একজন পয়সাওয়ালা ভদ্রলোক মা'র কাছে আসতেন। মা মারা গেলে আমার কাছে আসতে শুরু করলেন। কিছুদিন বাদে আমাকে তাঁর রক্ষিতা করে নিলেন।

প্রভাত সিগারেট ধরায়, সে-ভাবে কত দিন ?

—চার বছর। পরে জানলাম ভদ্রলোক সিনেমা লাইনের অনেককে চেনেন, উনিই আমায় ফিলমে নামার সুযোগ করে দিলেন। বরাত ভালো, প্রথম বইতে অভিনয় করেই নাম হয়ে গেল। এত দিন আমার নাম ছিল বুঁচকি, ফিলমে ঢুকে নাম হল বেলারাণী।

—কত বছর আগে প্রথম ছবিতে নামলেন ?

—সাত বছর, চাঁদের দেশে।

—সাত বছরের মধ্যে খুব নাম করেছেন !

বেলারাণী আত্মপ্রসাদের হাসি হাসে, তা হয়েছে ! ফিল্মে ঢোকার দু'বছর বাদে যখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখলাম, তখন থেকে সে ভদ্রলোকের রক্ষিতা হয়ে না থেকে এই বাড়ি ভাড়া করে চলে এলাম।

বেলারাণী তাকিয়ার উপর গা এলিয়ে দেয়, টাকা হল। মাস্টার রেখে লেখাপড়া শিখলাম, যাতে কথাবার্তা বলতে পারি।

—ইংরিজীও তো বেশ ভাল শিখেছেন !

—কাজ চালিয়ে নিতে পারি।

—এর পর কি করবেন ?

বেলারাণী দীর্ঘশ্বাস ফেলে, এমনি করেই মরে যাব একদিন।

প্রভাত চমকে ওঠে, সে আবার কি কথা ?

—সত্যি প্রভাত আর আমার বাঁচার শখ নেই।

প্রভাত বোঝে, নেশার ঝোঁকেই চোখ জলে ভরে আসছে। তবু সান্ত্বনা দিয়ে বলে, কেন এ রকম ভাবছেন ?

—আমি যে মানুষের নোংরা দিকটা দেখেছি, পুরুষ মানুষ দেখলে আমার ঘেন্না করে। বেলারাণী জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে, কত রকম দেখলাম, বড় বড় পণ্ডিত লোক, সমাজের হোমরা-চোমরা নীতিবাগীশ। একজন বাড়িতে বৌকে বলে এলো অফিসের কাজে বাইরে যাচ্ছে, হাতে সুটকেস নিয়ে আমার কাছে এসে হাজির। বুড়ো প্রৌঢ় জোয়ান, সব সমান।

প্রভাত হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, বিয়ে করলেন না কেন ?

—কাকে করবো ?

—তার মানে ?

—একটা মানুষ যে চোখে পড়ল না! সত্যি প্রভাত, তোমায় আমার ভাল লাগে তুমি সত্যিকারের মানুষ। যাকে ভালোবাসো তাকে ছাড়া অন্য রকম ভাবতে পারো না। হয়তো অরুণার উপর আমার হিংসা হয়, কিন্তু তবু তোমার উপর শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। একটু থেমে বলে, তোমার কাছে দুটো অনুরোধ আছে আমার, রাখবে ?

—বলুন।

—মাঝে মাঝে আমার কাছে এস, বড় একা আমি।

—আসবো।

—আর, বেলারাণীর কথা যেন আটকে যায়, আর শুধু আজকের দিনটিতে আমার কাছে এস –

বেলারাণী কথা শেষ করতে পারে না, সকরুণ মোহময় চোখে প্রভাতকে আহ্বান করে।

প্রভাত উঠে দাঁড়ায়, এখন আমি চলি, বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হবে।

বেলারাণী তখনও সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকে, এসো, লক্ষ্মীটি।

প্রভাত ঘেমে ওঠে, মানুষের মন বড় দুর্বল, তাকে নিয়ে খেলা করবেন না। হয়তো কি করে বসবো, তখন আর আস্থা থাকবে না আমার ওপর। চলি।

প্রভাত বেলারাণীর দিকে ফিরে না তাকিয়ে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়। গাড়ী দাঁড়িয়েছিল। প্রভাতকে আসতে দেখে ড্রাইভার দরজা খুলে দেয়। প্রভাত নিঃশব্দে গাড়িতে উঠে বসে।

কেষ্ট আবার তার কাজের জীবন ফিরে পেয়েছে। কোন দিন গৌরীকে নিয়ে কোন দিন বা না নিয়ে বার হয় প্রয়োজন মত। পুরানো মোটা খাতাটা বাড়ি থেকে-বেহালার বাসাতেই এনে রেখেছে। খাতার এক এক পাতায় এক এক জনের নাম-ঠিকানা বর্ণনা লেখা আছে। কি বলে, কবে, কার কাছ থেকে সে কত টাকা নিয়ে এসেছে সব কিছু। পরের বার গিয়ে যাতে না ভুল কথা বলে ফেলে।

যেদিন গৌরী সঙ্গে থাকে না, কেষ্ট অফিসগুলোয় যায়। ক্লাইভ স্ট্রীটের চারটে বড় বড় বিলিতি সওদাগরী অফিসের কর্মচারীদের কাছে সে হাবা কালা বলে পরিচিত। বড়বাবুর কাছে গিয়ে ছাপা কাগজ বার করে দেয়, যাতে লেখা আছে, "এই ভদ্রলোক হাবা, কালা, দরিদ্র, আমাদের বিশেষ পরিচিত। সাহায্য করলে সত্যিই এক ভীষণ অভাব-গ্রস্ত পরিবারকে সাহায্য করা হবে। নীচে অনেকের নাম সই করা।" বড়বাবুকে প্রথম দিন বোঝাতে কেষ্টর খুবই অসুছিধে হয়েছিল। হাত পা নেড়ে বোঝাতে হয়েছে, বার বার চিঠি সার্টিফিকেট খুলে দেখাতে হয়েছে। কিন্তু এখন আর সে অসুবিধে নেই। বড়বাবু সই করে চার

আনা কি আট আনা দিলেই অন্য কর্মচারীদের কাছে যায়। এক টেবিল থেকে আর এক টেবিল ঘুরে যখন বেরিয়ে আসে, পকেটে তার অনেক টাকার খুচরো জমা হয়। বড়বাবুকে ধন্যবাদ জানিয়ে আসতে ভোলে না। কত দিন বড়বাবুকে বলতে শুনেছে, লোকটা ভাল। ন'মাসে ছ'মাসে একবার আসে, বেশি জ্বালাতন করে না।

কেষ্ট এমনও কয়েক জন দয়ালু ভদ্রলোককে জানে যারা সত্যিকারের দুঃখের কথা শুনলে সাহায্য না করে পারে না। উস্কোখুস্কো চুল, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি আর ছেঁড়া জামা-কাপড় পরে কেষ্ট তাদেরই মত একজনের সঙ্গে দেখা করে বলে, দয়া করে আপনার টেলিফোনটা একবার ব্যবহার করতে দেবেন ?

—করুন।

কেষ্ট দাঁড়িয়ে থেকেই নম্বর চায়। ভদ্রলোক বসতে বলেন। কেষ্টর সেদিকে খেয়াল নেই, সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে সে যেন টেলিফোন করছে, হ্যালো, হ্যাঁ, অমলা-সুতোর কল, শুনুন, আমি মনোহর দাস কথা বলছি, আপনাদের পাশের ঘরে আমি থাকি। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার ছেলে, কেমন আছে ? একটু দয়া করে খবর নিয়ে বললে ভাল হয়। কিছুক্ষণ কেষ্ট চুপ করে থাকে। ও-পাশের কথা শুনে যেন বলে, হ্যাঁ বলুন, একশ' চার ডিগ্রী ? আমায় খুঁজছে, বলুন, আমি যাচ্ছি এক্ষুনি।

টেলিফোন কেটে দিয়ে কেষ্ট ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে। চোখে জল ভরে আসে, এক গ্লাস জল খাওয়াবেন ? ভদ্রলোক বেয়ারাকে জল আনতে বলে নিজে থেকেই প্রশ্ন করেন, কি হয়েছে ?

—ছেলেটার জ্বর। ক'দিনই একশ চার-পাঁচ ডিগ্রী উঠছে। আজ একেবারে নেতিয়ে পড়েছে—

—ডাক্তার দেখিয়েছিলেন ?

—হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম। গরীবদের ওরা দেখে না। বলে কেবিনে রাখুন, সে সামর্থ্য কোথায়? পাড়াতেও একজন ডাক্তারকে দেখিয়েছি, উনি বলেন একজন স্পেশালিস্ট-এর কাছে নিয়ে যেতে, ষোল টাকা ভিজিট, কোথায় পাব অত টাকা?

বেয়ারা জল নিয়ে আসে। ভদ্রলোক বলেন, জল খান।

কেষ্ট ঢক-ঢক করে সব জলটা খেয়ে ফেলে। উঠে দাঁড়িয়ে বলে, যাই, সে বাড়িতে একলা পড়ে আছে।

—একলা কেন, ছেলের মা?

কেষ্টর চোখ সজল হয়ে ওঠে, সে তো দু'বছর হল টিবি-তে—একটু থেমে বলে, ছেলেটা গেলে জানি না কি নিয়ে বাঁচবো!

ভদ্রলোকের মনটা কেমন করে ওঠে; নিজের ছেলেটিও ক'দিন থেকে জ্বরে ভুগছে। তার কথা মনে পড়তেই বলেন, আমি আপনার ডাক্তারের ভিজিট দিচ্ছি, এই নিন ষোল টাকা।

কেষ্ট কেঁদে ফেলে, আপনি আমায় বাঁচালেন, এ কথা আমি কখনও ভুলব না স্যার।

ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বলেন, দেরি করবেন না, শীগগিরি ডাক্তারের ব্যবস্থা করুন।

কেষ্ট নমস্কার করে বেরিয়ে আসে।

অনেক রকম পদ্ধতি কেষ্টর জানা আছে। তার জন্যে ব্যাগ-ভর্তি নানারকম উপকরণ, যা তার প্রায়ই কাজে লাগে। তারই মধ্যে থেকে একদিন একটা ছবি বার করে গৌরী জিজ্ঞেস করছিলো, এটা কার ছবি?

—ও এক বড়লোকের বউ-এর। কাঁধ দিতে গিয়েছিলাম, শ্মশানে তোলা ছবি।

গৌরী তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, বেশ দেখতে বৌটি, একমাথা সিঁদুর। কি হয়েছিল?

—জানি না।

—বয়স কত ?

—তা-ও জানি না।

গৌরী আজকাল আর কেষ্টর কথা বিশ্বাস করে না। ভাবে, হয়ত কেষ্ট সবই জানে, বলতে চাইছে না। কেষ্ট কিন্তু সত্যিই জানতো না, কাঁধ দেওয়ার জন্যে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, অত খোঁজে ওর দরকার কি ? যার বৌ, তিনি খুব ঘটা করে পুড়িয়েছিলেন। অনেক ছবি তোলা হয় শ্মশানঘাটে। একটা ছবিতে কেষ্ট মাথার কাছে দাঁড়িয়ে। উঠেছিল ভাল। শ্রাদ্ধের দিন খেতে গিয়ে ওই ছবিটা চেয়ে রেখেছিল।

গৌরী হঠাৎ বলে, এমন লক্ষ্মী-প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে ভদ্রলোক বোধ হয়—

—কিছুই না। পরের বছরই আবার বিয়ে করেছিলেন।

কেষ্ট অবশ্য ছবিটা কাছে রেখেছে অন্য কারণে। এই ছবি দেখিয়ে অনেক টাকা রোজগার করেছে। একদফা স্ত্রীর অসুখ বলে টাকা এনেছে, তারপর স্ত্রী মারা গেছে বলে এই ছবি দেখিয়ে।

কেষ্ট এসে আশুদার চায়ের দোকানে ঢোকে। আজকাল আবার আগের মত কেষ্ট প্রায়ই এখানে আসে, চায়ের কাপ নিয়ে খবরের কাগজের পাতা ওল্টায়। পুজো এসে গেছে পাড়ার ছেলেরা বারোয়ারীর ব্যবস্থা করতে উঠে-পড়ে লেগেছে। সত্যেন বলে, আমাদের পুজো সব চেয়ে ভাল হওয়া চাই, প্রতিমা হবে একেবারে হালফ্যাসানের।

—কি রকম ?

—যাকে বলে ‘আলট্রামডার্ন’। ফিল্ম-স্টারের মত চেহারা হবে—

—বলিস কি, বুড়োরা চেঁচামেচি করবে যে—

—দূর দূর, মুখে বলবে। খুশি হবে ওরাই সবচেয়ে বেশি।

ভোঁতন কথার মোড় ঘোরায়, মনে নেই আগের বছর বালীগঞ্জের সেই ঠাকুরটা? মা-দুর্গা থেকে ছেলে পিলে সকলের মাথায় গান্ধীটুপি।

—মাইরী, কি অরিজিন্যালিটি বলতো! কাগজেও ছেপেছিল সে ছবিটা—

—আগের বার তো আমরা মাইকে গানই দিইনি। —এবার আর বলতে হবে না। যত হিট সঙ আছে একের পর এক। কানে তালা লাগিয়ে দেব।

কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, চাঁদা কেমন উঠেছে?

—বিশেষ নয়।

—কেন?

—এখনও জোর-জবরদস্তি শুরু হয়নি আর কি!

—চাঁদা আদায়ে জোর দাও, দেখ যদি একটা একজিবিসান্ করতে পার।

—সে কি আর হবে?

—চেষ্টা করতে দোষ কি। অন্তত খানকয়েক দোকানও যদি বসাতে পারা যায় উৎরে যাবে।

আশুদা উৎসাহ দেন, এ যুক্তি মন্দ নয়, আমি একটা 'কাফে' খুলবো।

কেষ্ট বলে, আমি মনোহারীর দোকান দিতে রাজী আছি। লজেন্স, চকোলেট আর খুচরো-খাচরা যা পাওয়া যায়।

সবাই এ প্রস্তাবে রাজী হয়, তাই হোক, এক্‌জিবিসান—

সকলে চলে গেলে আশুদা কেষ্টকে বলেন, তুমি এত দিন ছিলে না, আমাদের আড্ডাও জম্‌তো না।

কেষ্ট হাসে, এবার থেকে ঠিক সময়-মত পাবেন।

—দাদার খবর কি?

—পাঁচিল উঠতে যা দেরি। এখন আলাদা বন্দোবস্ত এক রকম হয়ে গেছে।

আশুদা গলা নামিয়ে বলেন, আর গৌরী, তাকেও এ বাড়িতে নিয়ে আসছো তো?

—প্রভাত বলেছে? মাসখানেকের মধ্যে নয়। তার আগে বিয়েও তো করতে হবে।

আশুবাবু বিড়-বিড় করেন, ছুটো মন্তর পড়লেই কি বিয়ে হয়, আসল হল মনের মিল।

কেষ্ট বেরুবার জন্যে উঠে দাঁড়ায়, তা সত্যি।

আশুদা জিজ্ঞেস করেন, শ্যামার নাকি বিয়ে শুনছি?

—শুনছি তাই।

—পাত্রটি কে?

—প্রায় চল্লিশ বছরের দোজবরে, ছু'-ছেলের বাপ।

—আহা, তোমার দাদা যে কি? বাপ হয়ে নিজের মেয়েকে—

কেষ্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে, এ শুধু আমাকে কষ্ট দেবার জন্যে। শ্যামাকে আমি ভালবাসি কি না, তাই—

—যাই হোক, গৌরীকে একদিন নিয়ে এস।

আসবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে কেষ্ট কেবিন থেকে বেরিয়ে যায়।

কেষ্ট গৌরীকে বলে, মাথার সিঁদূর তুলে ফেলে আজকে কুমারী সেজে এসো।

আগে গৌরী তর্ক করতো, এখন আর করে না, নির্দেশ-মত কাজ করে।

কেষ্ট গৌরীকে নিয়ে মস্ত বড় একটা বাড়িতে এসে ঢোকে।

গৌরীকে বারান্দায় অপেক্ষা করতে বলে সামনের বড় ঘরে ঢুকে যায়। গৃহস্বামী বাড়িতে ছিলেন না। তাঁর ছেলে বসে ছিল। কেষ্ট আলাপ করে বলে, আপনাকে বলেছিলাম আমার বোনের কথা—

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেন, যার বিয়ের চেষ্টা করছিলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সব পাকাপাকি। বোনকেও নিয়ে এসেছি।

—কৈ দেখি।

কেষ্ট গৌরীকে ভেতরে নিয়ে আসে। গৌরী মাথায় অনেক চেষ্টা করে বড় খোঁপা করেছে, কপালে ছোট টিপ, পরনে সবুজ-রঙের শাড়ী। গড় হয়ে গৌরী প্রণাম করে। ভদ্রলোক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন, বাঃ, খাসা মেয়ে। ছেলেটি কি করে?

—রেল কোম্পানীর গার্ড।

—টাকাকড়ি চায় নাকি?

—না, সেদিক দিয়ে ভালো। যা মেয়ের কিছু গয়না-কাপড় তাই দিতেই পারছি না, বাবা নেই। আমার একটি বোন, ইচ্ছে তো করেই—

—তা তো বটেই। তা কিছু টাকা সংগ্রহ হয়েছে?

—প্রতিশ্রুতি পেয়েছি। অ্যাটর্ণী বাবু এক শ' টাকা দিয়েছে—কেষ্ট কাগজ বার করে দেখায়।

ভদ্রলোক বাধা দেন, ঠিক আছে, ও-সব দেখাবার দরকার নেই, বাবা তোমায় কত টাকা দেবেন বলেছিলেন?

—বলেছিলেন, বিয়ের ঠিক হলে এসো, টাকা পঞ্চাশেক দিয়ে দেব।

—বেশ, আমি দিতে বলে দিচ্ছি। সরকারকে ডেকে বলেন, এই ভদ্রলোককে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দিন। কন্যাদায়ের সাহায্য বলে লিখে রাখবেন।

সরকারবাবু কেষ্টকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে যান, সই করাতে।

গৌরী চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। এমন সময় চোখ তুলতেই দেখে, ভদ্রলোক তার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছেন। চোখাচোখি হতেই জিজ্ঞেস করেন, কি নাম তোমার ?

—গৌরী।

—বাঃ বেশ নাম। দাদার নাম কি ?

—কেষ্ট।

—বাঃ, ভাই-বোন দু'জনেরই দেবতার নাম। দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বস না ঐখানে।

ভদ্রলোক আঙুল দিয়ে ফরাসপাতা চৌকীটা দেখান। গৌরী উত্তর না দিয়ে দাঁড়িয়েই থাকে। চোখ মাটির দিকে থাকলেও বুঝতে পারে ভদ্রলোক একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছেন।

কেষ্ট কিছুক্ষণ বাদেই টাকা নিয়ে ফিরে আসে। দু'জনে ভদ্রলোককে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়ে।

গৌরী মন্তব্য করে, ভদ্রলোক কি অসভ্য, সারাক্ষণ চোখ দিয়ে গিলে খাচ্ছিলেন।

নির্বিকার কেষ্ট উত্তর দেয়, এ রকম একটু-আধটু সহ্য করতে হয় বৈ কি, পঞ্চাশ টাকা তো কম নয় ?

গৌরী দীর্ঘশ্বাস ফেলে, টাকাটাই কি সব ?

—এক রকম তা বলতে।

যদিও এ ধরনের লোক ঠকাতে গৌরীর আর মনে লাগে না, কিন্তু তার খারাপ লাগে অন্যের বিশ্বাসের ওপর আঘাত করতে। সেদিনও যখন কেষ্ট তাকে স্ত্রী সাজিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ভবানীপুরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে, গৌরীর যথেষ্ট আপত্তি ছিল। সে ভালো করেই জানত, কেষ্ট এক বৃদ্ধের দুর্বলতার সুযোগ নিতে চলেছে !

দুপুরবেলা রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছে। চাকরেরা দরজার কাছে বসে তাস

খেলায় ব্যস্ত। কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, কর্তাবাবু বাড়ি আছেন? একজন উত্তর দেয়, ঘুমুচ্ছেন।

—আমাদের যে বিশেষ দরকার।

—আপনার নাম কি বলবো?

কেষ্ট একটা মাটির গণেশ বার করে তার হাতে দিয়ে বলে, এইটে দেখালেই হবে। বলো, কুমোররা এসেছে।

একটু বাদেই ওপরে ডাক পড়লো। গৃহস্বামী বৃদ্ধ ভদ্রলোক। ইজি চেয়ারে বসে হাতে মাটির গণেশটি নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিলেন। ওদের দেখে একমুখ হেসে তারিফ করে বলেন, বাঃ, এতো সুন্দর হয়েছে।

কেষ্ট আর গৌরী দু'জনে প্রণাম করে। কেষ্ট বলে, আপনার দয়ায়।

—কারুর জন্যেই কিছু হয় না। নিজেদের ইচ্ছে নিজেদের চেষ্টা থাকলে তবেই তো দাঁড়ান যায়। ভিক্ষে করে বাঁচা যায় না।

—আপনি প্রথমে টাকা দিয়েছিলেন, তবেই তো ব্যবসা করতে পারলাম।

—এখন কেমন রোজগার হচ্ছে?

—যা বিক্রি হচ্ছে তাই দিয়ে সংসারও করছি আবার নতুন মাল-মশলাও কিনছি। চলে যাচ্ছে একরকম।

বৃদ্ধ আনন্দে অধীর হয়ে পড়েন, আমার যে কি ভালো লাগছে। দু'টিতে মিলে এসে প্রথম দিনই যখন সাহায্য চাইলে, তখনই বুঝেছিলাম তোমাদের কাজ করার ক্ষমতা আছে, মন আছে। তাই ত বললাম মাটির পুতুলের ব্যবসা করতে। গাঁয়ে যে কাজ করতে, এখন পাকিস্তান হবার পর শহরে এলেও সে-কাজ কেন চলবে না, দেখলে তো?

কেষ্ট বিনয়ে ভেঙ্গে পড়ে, আপনার সাহায্য না পেলে কোথায় খড়কুটোর মত ভেসে যেতাম!

—আমি খুব খুশি হয়েছি। এখন কি করতে চাও?

—সামনে পুজো আসছে। এই সময় যদি কিছু বেশি মাল তৈরি করতে পারি, তাহলে অনেক টাকা লাভ হয়।

—এ তো খুব ভালো কথা। কত টাকা লাগবে?

কেষ্ট ভেবে নিয়ে বলে, শ'খানেক। রঙ মাটি সবই বেশি করে কিনতে হবে। পুজোর বিক্রির পর আমি টাকা ফেরত দিতে পারব।

বৃদ্ধ একটি মেয়েকে বলেন, যাও তো দাদু, একটু জলখাবার দিতে বল মাকে।

জল-মিষ্টি খাওয়া হলে ক্যাশ-বাক্স খুলে বৃদ্ধ পঞ্চাশ টাকা গৌরীর হাতে দেন, নাও না এখন পঞ্চাশ টাকা। সামনের মাসে আরও পঞ্চাশ টাকা নিয়ে যেও। মন দিয়ে কাজ কর, দেখবে কারুর উপর নির্ভর করতে হবে না।

গৌরী ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে, তার চোখে জল এসে যায়। রাস্তা থেকে আট আনার গণেশ কিনে বৃদ্ধের সঙ্গে এভাবে প্রতারণা করতে গৌরীর মোটেই ভাল লাগে না। অথচ কেষ্টকে বলে কোন ফল হয় না।

—অত দেখলে চলে না, এ আমার ব্যবসা।

—ব্যবসা আপনি করুন না, আমাকে টানছেন কেন?

—ক্ষতি কি?

এ কথার আর কি উত্তর দেবে গৌরী? সে কেষ্টর মুখের দিকে তাকায়, ভাবে, মনটা যে তার সঙ্কুচিত হয়ে আসছে।

শ্যামলকে নিরস্ত করতে না পেরে চুনীলাল মদনের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে গেল শ্যামলের মামার সঙ্গে দেখা করতে। জগৎবাবু তখন সবে অফিস থেকে ফিরে বাইরের ঘরে বসেছেন; বটুবাবুও তক্তাপোশের

ওপর খবরের কাগজ নিয়ে একমনে পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপন দেখছেন, এমন সময় চুনীলাল ঘরে ঢোকে।

জগৎবাবু জিজ্ঞেস করেন, কাকে চাই ?

—জগৎবাবু আছেন ?

—আমিই।

চুনীলাল নমস্কার করে আস্তে আস্তে বলে, আপনার সঙ্গে দরকারী কথা আছে।

—বল।

চুনীলাল বটুমামার দিকে তাকায়। জগৎবাবু বুঝতে পেরে বলেন, উনি আমার আত্মীয়। ওঁর সামনে বলতে পার।

—শ্যামলের বিষয় দু'-একটা কথা আছে।

বটুমামা ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন, শ্যামলের বিষয় ! কি ব্যাপার ? বসো না, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?

চুনীলাল আস্তে আস্তে শ্যামলের সব কথা খুলে বলে।

জগৎবাবুর চোখ কপালে উঠে যায়, বলো কি, শ্যামল বছরখানেক স্কুলে যায় না ?

—না।

—পলিটিকস করছে ?

—পলিটিকসের নামে গুণ্ডামী।

—না না, এ বিশ্বাস করা যায় না।

বটুমামা সুযোগ খুঁজছিলেন। মাথা নেড়ে বললেন, জানতাম। তোমায় কত বার বলেছি জগৎ, একটা বিচ্ছু শয়তান ঐ শ্যামল।

জগৎবাবু বলেন, ও যে বল্‌তো কোচিং ক্লাশে যায় ?

—মিথ্যে কথা। স্কুলে ওর নামই নেই।

—কি ভয়ানক ব্যাপার, এ যে বিশ্বাস করা যায় না।

চুনীলাল বলে, সেই জন্যেই সাবধান করতে এলাম। বদ্‌সঙ্গে মিশছে।

—ভালো করেছো, খুব ভালো করেছো। এর যা হোক ব্যবস্থা আমি করবো।

চুনীলাল চলে গেলে জগৎবাবু গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করেন, কি মনে হয় বটু! ছেলেটা কি সত্যি কথা বলে গেল?

—শুধু শুধু মিথ্যে কথা বলবে কেন?

—তাও বটে। যাই হোক, কাল আমি একবার স্কুলে গিয়ে খবর নেব।

বটুমামা তাড়াতাড়ি বলেন, ওর বাক্স-প্যাঁটরা খুলে দেখলে হয়।

—না না, আগে ভাল করে খবর নিই।

পরদিন আর সন্দেহ রইল না যে চুনীলাল সবই ঠিক কথা বলেছে। হেডমাস্টার মশাই বললেন, শ্যামলের নাম তো বহুদিন কাটা গেছে।

জগৎবাবুর মুখ কালো হয়ে যায়, আমি কিছুই জানি না।

—তাই নাকি, তাহলে তো সর্বনেশে কথা!

—শুনছি নাকি রাজনীতি করছে। সে দলটাও গুণ্ডাদের আড্ডা—

—তা তো হবেই, বাঁদরামী করার একটা জায়গা চাইতো।

জগৎবাবু মাথা গরম করে বাড়ি ফিরলেন। বটুমামা সাগ্রহে জিজ্ঞেস করেন, কি হোল?

—ছোকরা যা বলেছে সব সত্যি।

—তাহলে?

—কোথায় ওর বাক্স-প্যাঁটরা, দেখি তার ভেতরে কি আছে।

বটুবাবু শুধু এই কথারই অপেক্ষা করছিলেন। তাড়াতাড়ি তালা ভেঙ্গে জগৎবাবুর সামনে শ্যামলের ট্রাঙ্কটা খুলে ফেললেন। দু'জনের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। বাক্সভর্তি নানারকম জিনিস। হাতঘড়ি,

ফাউণ্টেন পেন, সিগারেটের টিন, ছোটখাট সোনার গয়না! কতকগুলো শৌখীন জিনিস, তাছাড়া নগদ টাকা।

জগৎবাবু গুণে দেখেন, শ'দুয়েক তো বটেই।

বটুমামা প্রথম কথা বলেন, দেখলে তো, ছেলে এক মিনিট বাড়ি থাকে না, এছাড়া কি করবে? পাকা চোর।

জগৎবাবু গুরুগম্ভীর স্বরে বলেন, ভাগ্যে সময় থাকতে সাবধান হতে পেরেছি, কোন দিন আমাদেরই থানায় নিয়ে যেত।

—নিশ্চয়ই, আমার তো অনেক দিন থেকেই সন্দেহ হয়েছে।

—ওর বাবাকে একটা খবর দিতে হয়, এ-সব ছেলেকে বাড়িতে রাখা মুস্কিল। আমি কিছু বলতে চাই না।

বটুবাবু তেতো গলায় বলেন, আমি হলে তো হতভাগাটাকে এখুনি দূর করে দিতাম, তোমার কাছে আস্কারা পেয়েই তো এমনি বদ্ হয়েছে।

জগৎবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, হাজার হোক নিজের ভাগ্নে তো?

জগৎবাবু ঠিকই করে নিয়েছিলেন শ্যামলেয় বাবা না আসা পর্যন্ত এ বিষয় নিয়ে আর কোন উচ্চবাক্য করবেন না। কিন্তু শ্যামল নিজে থেকেই গোল বাধালে। রাত্রি ন'টা নাগাদ কালীর আড্ডা থেকে বাড়ি ফিরে ট্রাঙ্কের তালা ভাঙ্গা দেখে ওর মাথা গরম হয়ে ওঠে। ছোটদের জিজ্ঞেস করে, কে তালা ভেঙ্গেছে রে?

সকলে একসঙ্গে বলে ওঠে, বটুমামা।

আর যায় কোথায়! শ্যামল রাগে কাঁপতে কাঁপতে সোজা বটুমামার সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, কে আমার ট্রাঙ্ক খুলেছে?

বটুবাবু চিবিয়ে উত্তর দেন, তোমার মামা—

শ্যামল চেঁচিয়ে বলে, মিথ্যে কথা, আপনি খুলেছেন।

—তা কি হয়েছে?

—আমাকে না জিজ্ঞেস করে কেন খুলেছেন ?

—তোমার কীর্তি-কলাপ দেখতে—

—আমার সব ব্যাপারে আপনি নাক গলান কেন ?

—চোরের ওপর নজর রাখতে হবে না ?

শ্যামল নিজেকে সামলাতে পারে না। বটুবাবুর ওপর তার চিরকালের রাগ, আজ তারই ঝাল ঝাড়ে। সজোরে ঘুষি চালিয়ে দেয় নাকের ওপরে। সঙ্গে সঙ্গে বটুবাবু বাপ রে, মা রে বলে আর্তনাদ করে ওঠেন, নাক দিয়ে গল গল করে রক্ত পড়তে শুরু করে। বাড়ির সকলে হৈ চৈ করে ছুটে আসে। শ্যামল হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, রাগের মাথায় মারটা এত জোরে হয়ে যাবে, সে ভাবতে পারেনি।

জগৎবাবুর মন মোটেই ভাল ছিল না, তাই আজ একটু বেশি মাত্রায় পান করেছিলেন। শ্যামলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বললেন, বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে।

মামার এ ধরনের গলা শ্যামল কখনও শোনেনি। বটুবাবু হাউমাউ করে কি বলতে যাচ্ছিলেন, জগৎবাবু তাকেও ধমকে থামিয়ে দেন, চুপ কর। জগৎবাবুর থমথমে মুখ দেখে আর কারুর কথা বলার সাহস হয় না। শ্যামল কি করবে বুঝতে না পেরে ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক তাকায়। জগৎবাবু আবার বলেন সেই একই স্বরে, বেরোও, আমার বাড়ি থেকে।

শ্যামল মাথা নীচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। জগৎবাবু চিৎকার করে ওঠেন, তোমার জিনিসপত্র যা আছে সব নিয়ে যাও। চোরাই মাল এখানে থাকবে না।

চাকরকে হুকুম দেন, এখুনি ওর সব জিনিস বার করে দাও।

মিনিট কয়েকের মধ্যে জিনিসপত্র নিয়ে শ্যামল বেরিয়ে আসে। রিক্সায় চেপে এই প্রথম তার চোখে জল আসে। এ কি হোল. মাত্র

কয়েক মিনিটের মধ্যে মামার বাড়ির এত দিনের সম্পর্ক চিরকালের মত ছিঁড়ে গেল? যে মামা কোন দিন তাকে একটা কড়া কথা পর্যন্ত বলেন নি, তিনিই আজ দূর দূর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন! আর পিসীমা, তিনিও কিছু বললেন না। শ্যামল তাঁকে পিসীমা বলে ডাকে, বাড়ির অন্য ছেলেদের মত, যদিও তিনি তার মাসীমা, মার আপন ছোট বোন। বিধবা মানুষ, শ্যামলকে কিছু বলতেন না। তাঁর কথা মনে পড়তেই শ্যামলের চোখ দিয়ে আরও জল বেরিয়ে আসে। শ্যামলের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে বটুমামার ওপর, তিনিই যে মামার কানে লাগিয়ে লাগিয়ে শ্যামলের সম্বন্ধে খারাপ ধারণা করে দিয়েছেন, এ বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ রইল না।

এত রাত্রে কোথায় যাবে ভেবে না পেয়ে স্থির করে, অনন্ত-কেবিনে যদি কেষ্টদা থাকে। মামার বাড়ি থেকে অনন্ত-কেবিনই সবচেয়ে কাছে হয়, পৌঁছতে আধ ঘণ্টাও লাগে না। দোকানে বিশেষ লোক ছিল না। আশুবাবু টাকা পয়সার হিসেব মেলাচ্ছিলেন। শ্যামল কাছে গিয়ে শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করে, কেষ্টদাকে কোথায় পাব বলতে পারেন?

আশুবাবু উত্তর দেন, তা কি করে বলব, বিকেলের দিকে এসেছিল—

—আমার যে খুব দরকার—

—কাল বরং এসো, বলে রাখব।

—না আজই।

আশুবাবু ভাল করে শ্যামলের মুখটা দেখে নেন, কি ব্যাপার বল তো?

—আজকের রাত কাটাবার একটা জায়গা চাই।

—কেন, কি হয়েছে?

শ্যামল বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলে, বাড়িতে ঝগড়া করে চলে এসেছি।

আশুবাবু হাসেন, তাতে কি হয়েছে, এমন ঝগড়াঝাটি সকলেরই হয়। এই বেলা ফিরে যাও, বাড়ির সকলে ভাববেন।

—না, আমি ফিরতে পারব না।

—ছিঃ, অমন করতে নেই।

—আপনি বুঝতে পারবেন না, কেষ্টদা হলে বুঝত। শ্যামল দীর্ঘশ্বাস ফেলে, দেখি কোথায় জায়গা পাই।

আশুবাবু বাধা দিয়ে বলেন, থাকতে চাও, এ রাতটা এখানে থাকতে পার। চাকর দুটো তো থাকেই, টেবিলগুলো টেনে নিয়ে পাখার তলায় বিছানা করে নাও।

শ্যামল সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলেন, বাঁচালেন আশুদা, এত রাত্রে মালপত্তর নিয়ে যে কোথায় যেতাম—

—সে কি, বাক্স-টাক্স নিয়ে এসেছো? আশুদা অবাক হ'ন।

শ্যামল রিক্সাওয়ালাকে ডেকে মাল নামাতে বলে। আশুদা জিজ্ঞেস করেন, খেয়েছো?

—খিদে নেই।

আশুদা হাসেন, রাত্তিরে খিদে পাবে। ছোঁড়া চাকরটাকে ডেকে বলেন, রুটি ডিম যা আছে শ্যামলবাবুকে খাইয়ে দিস, উনি আজ এই ঘরেই থাকবেন। আশুদা ক্যাশবাক্স থেকে টাকা বার করে পকেটে রাখেন, চলি শ্যামল, কাল দেখা হবে।

শ্যামল হাসবার চেষ্টা করে, ভয় নেই আশুদা, আপনার খদ্দের আসবার আগেই আমি যা হোক একটা ব্যবস্থা করে নেব।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে শ্যামল একটা কথাই ভেবেছে যে সে আজ গৃহহারা। মার কথা তার মনে নেই, মারা গেছেন খুব ছোটবেলায়।

বাবার সঙ্গে পরিচয় অল্প, মফঃস্বল থেকে আসেন যান। খুব বেশি তাকে ভালবাসেন বলেও মনে হয় না। শ্যামলের যা কিছু বল ভরসা সবই ছিল মামাব উপর। সত্যিই জগৎবাবু সদাশিব মানুষ, কোন দিন সাতে-পাঁচে থাকতেন না। নিজের ছেলেমেয়ের মতই শ্যামলের জন্যে করেছেন। আজ এই প্রথম শ্যামলের মনে হয় সে বোধ হয় অন্যায় করেছে, নইলে মামা এতখানি চটে গেলেন কেন! কেষ্টদা, মদন, দেবেনদা, কালী, সকলের কথাই একে একে মনে পড়ে, কিন্তু কেষ্টদা ছাড়া কারুর ওপরই তার ভরসা নেই। সম্প্রতি বেশি দেখা-শোনা না হলেও শ্যামলের স্থির বিশ্বাস হয়, সব কথা শুনলে কেষ্টদা তার জন্যে কোন রকম ব্যবস্থা করবেন নিশ্চয়।

পরদিন কেষ্টর সঙ্গে দেখা হতেই শ্যামল একে একে সমস্ত কথা বলে যায়।

—আমি বলছি কেষ্টদা, এ-সব ঐ বটুমামার কাজ। মামার কানে নানা রকম লাগিয়েছে।

কেষ্ট অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করে তুমি কি আর বাড়ি ফিরবে না?

—ফেরবার উপায় নেই কেষ্টদা, মামা তাড়িয়ে দিয়েছেন।

—তোমার বাবাকে একটা চিঠি লেখ।

—কি হবে?

—বাঃ, বাবাকে জানাতে হবে তো!

—বেশ লিখব। এখন থাকব কোথায়?

—আমার কাছে। একটু থেমে কেষ্ট বলে, বল তো তোমার মামার সঙ্গে আমি দেখা করতে পারি।

শ্যামল কি ভাবে, না থাক। শেষকালে আপনাকেও হয়তো যা-তা বলে দেবে।

—তা হলে এখন আমার সঙ্গে চল, তার পর তোমার বাবার চিঠি পেলে যা হোক করা যাবে।

কেষ্ট ট্যাক্সি থেকে মালপত্রসমেত শ্যামলকে বেহালায় নিয়ে যায়। শ্যামল গাড়ীতে জিজ্ঞেস করে, আপনার বাড়িতে যাব, না?

—না। দাদার সঙ্গে গোলমাল চলছে, খাওয়া-দাওয়ার মুস্কিল!

—আমার জন্যে অসুবিধেয় পড়তে হল আপনাকে।

—না, তোমাকে গৌরীর কাছে রেখে দেবো। ও একলা থাকে, তোমাকে পেলে খুশি হবে।

গৌরী কেষ্টর কাছে শ্যামলের কথা শুনেছিল এবং তার ভাইকে পোড়াতে যে শ্যামলও শ্মশানে গিয়েছিল সে-কথা জানত। তাই বেরিয়ে এসে সাদরে অভ্যর্থনা করে, এসো ভাই, আমার কাছে থাকবে।

শ্যামল প্রথম প্রথম সংকোচ কাটিয়ে উঠতে পারে না। বাক্স-বিছানা ঘরের এক কোণে রেখে চুপ করে বসে থাকে। কেষ্ট কাজে বেরুবার সময় গৌরীকে বলে যায়, শ্যামল রইল। বেচারী লজ্জা পাচ্ছে, একটু আলাপ করে নিও।

শ্যামলকে পেয়ে গৌরী সত্যিই খুশি হয়। এত দিন পর্যন্ত কেষ্ট আর চিনু ছাড়া তার কথা বলার লোক ছিল না। তাই ভাই-এর বয়সী এই ছেলেটিকে পেয়ে সহজেই কাছে টেনে নেয়।

—শ্যামল, কি খাবে বল?

—কিছু না।

—কেন, লজ্জা কি আমার কাছে? আমি তোমার কে হই জান?

শ্যামল চোখ নীচু করে বসে থাকে। গৌরীর বেশ মজা লাগে। হেসে বলে, গৌরীদি।

শ্যামল এতক্ষণে হাসে। সহজ হয়ে বলে, এক গ্লাস জল দিন না গৌরীদি।

শুধু জল আসে না, তার সঙ্গে মিষ্টিও। গৌরী সস্নেহ আদরে শ্যামলকে খাওয়ায়। চিনুকে ডেকে এনে আলাপ করিয়ে দেয়, এই দেখ চিনু, একটা ভাই পেয়েছি। শ্যামলকে বলে, এ তোমার আর একটি দিদি, চিনুদি!

শ্যামল মুখ তুলে হাসে।

এদের মধ্যে ভাব জমে উঠল খুব তাড়াতাড়ি। চিনু আর গৌরী দু'জনেই যেন এই ধরনের একটি ছেলের অভাব বোধ করছিল অনেক দিন। আত্মীয়স্বজন ছেড়ে আসা এই দুটি নারীর স্নেহের সবটা দখল করে বসল শ্যামল। এর সঙ্গে বাইরে বেরুলে কেউ কিছু মনে করে না। বিশেষ করে পিনাকী, অন্য কারুর সঙ্গে বেরুলে চিনুকে বড় মার-ধোর করে। দুপুরের দিকে প্রায়ই শ্যামলকে নিয়ে এরা বাজারে যায়, নয়ত কোন দিন এমনিই খানিকটা ঘুরে আসে! শ্যামলেরও এই নতুন পাওয়া দিদি দু'টির সঙ্গ ভালো লাগে। এতদিন সে এরকম ভালবাসা পায়নি। তাকে যে কারুর কাজের জন্যে প্রয়োজন হতে পারে তাও সে জানতে পারে নি।

শ্যামল বলে, গৌরীদি, আপনার কাছে থাকতে আমার খুব ভালো লাগে।

গৌরী হেসে বলে, দিদির কাছে ভাই-এর থাকতে ভাল লাগবে না?

শ্যামলের মনে হয় গৌরীর প্রত্যেকটা কথা কি মিষ্টি, কতখানি দরদ মেশানো।

—এত আদর-যত্ন আমি সত্যি কোন দিন পাই নি।

—মা না থাকলে ঐ রকমই মনে হয় ভাই!

শ্যামল আসার পর গৌরীকে আবার আগের মত হাসিখুশি দেখে

কেষ্টও নিশ্চিন্ত হয়ে তার নিজের কাজে মন দিতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, কেষ্টর সঙ্গে কাজে বেরুতেও এখন গৌরী সহজেই রাজী হয়। বোঝে টাকার দরকার আছে। আজকাল রোজই প্রায় গৌরীর ঘরে খাওয়া-দাওয়া লেগে থাকে। পিনাকী সকালে বেরিয়ে গেলেই চিনু গৌরীর ঘরে চলে আসে, এক সঙ্গে রান্না করে। কেষ্ট কোন দিনই দুপুরের আগে আসে না, তাই সকালের বাজার করে শ্যামল। সবাই হৈ হৈ করে এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করে। কেষ্ট বেশি খরচা হচ্ছে বুঝেও গৌরীকে বারণ করে না। ভাবে, এতে যদি সে আনন্দ পায় তাই ভাল। রান্নায় গৌরীর হাত পাকা, বিশেষ করে মাছের তরকারীতে।

চিনু গৌরীর দেখাদেখি কেষ্টকে কেষ্টদা বলে ডাকে। আজকাল সে-ও নিঃসঙ্কোচে আলাপ করে। খেতে বসে বলে, আপনি খুব কম খান কেষ্টদা !

—তাইতেই ভুঁড়ি হয়ে যাচ্ছে।

—ও আপনার বাতিক, কি এমন মোটা আপনি ?

কেষ্ট হেসে বলে, খাওয়াতে হয় শ্যামলকে খাওযাও, ছোট ছেলে—

শ্যামল কৃত্রিম ভয়ে জোরে মাথা নাড়ে, ওরে বাবা, দিন নেই রাত নেই যা খাওয়া-দাওয়া শুরু হযেছে, পরে মুস্কিলে পড়ব।

গৌরী হাসতে হাসতে আরও খানিকটা ভাত শ্যামলের থালায় ঢেলে দেয।

যেদিন কেষ্ট একলাই কাজে বেরিয়ে যায়, গৌরী চিনুকে বলে, গান কর না চিনু, তোর গলাটা বেশ।

চিনুর ভাল লাগলে গান করে। শ্যামল বাক্সর উপর তবলার তাল ঠোকে।

গৌরী জিজ্ঞেস করে, থিয়েটারে তুই কি পার্ট করিস, ভয় করে না ? বাবা, অত লোকের সামনে ?

—তাতে কি হয়েছে ? একবার পর্দা উঠে গেলে আর কি ?

—আমি কিন্তু ভাবতেই পারি না।

—একবার করে দেখ না—

—কোথায় ?

—কত অফিসের কর্মচারীরা, কত ক্লাবে সব থিয়েটার হয়। সেখানে মেয়েদের পার্ট করবার জন্যে বলে পাঠায়, টাকাও দেয়।

—তোকেও টাকা দেয় ?

—নিশ্চয়, চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা, কখনও তার বেশিও দেয়। তোর চেহারা ভাল, পার্ট করতে পারলে নায়িকা হতে পারবি।

—আমি করতেই পারি না।

—চেষ্টা করলে কেন পারবি না ? যাবি একদিন রিহার্সাল দেখতে ?

গৌরীর কৌতূহল হয়, কবে ?

—শীগ্‌গিরি একটা অ্যামেচার ক্লাবে প্লে হবে, প্রভাতদা বলে পাঠিয়েছে।

—তাই নাকি, কি বই ?

—প্রভাতদারই লেখা একটা নাটক।

—তাহলে নিশ্চয় খুব ভালো হবে ?

গৌরী জিজ্ঞেস করে, কি করে জানলে ?

শ্যামল মুরুব্বি চালে বলে, প্রভাতদার বই যে সিনেমায় উঠছে। আমাকে বলেছে একদিন ছবি তোলা দেখাতে নিয়ে যাবে।

গৌরী আবদারের সুরে বলে, আমরাও যাব, প্রভাতদাকে তুই বলিস তো চিনু !

—তুই-ই বলতে পারিস, চল না আমার সঙ্গে রিহার্সালে—

—কেষ্টদাকে জিজ্ঞেস করবো।

—কেষ্টদা কিছু বলবে না। আমি তোর হয়ে মত চেয়ে নেব।

গৌরী খুশি হয়, হ্যাঁ, সেই ভালো।

এমনি কত রকম গল্প-গুজব করে তিন জনে। হাসি-ঠাট্টার মধ্যে এদের দিন কেটে যায়। চিনু সত্যি গৌরীদের মধ্যে থেকে নতুন প্রাণ পেয়েছে। শ্যামল এ ধরনের সাংসারিক জীবনের স্বাদ আগে পায়নি। গৌরীর মনের কোণে যে বিষাদের মেঘ জমা হয়েছিল তা অনেকখানি হাল্কা হয়ে যায়, তবে কেষ্টর কাছে ঠিক আগের মত ধরা দিতে পারে না।

পিনাকীকে নিয়ে প্রভাত অনন্ত-কেবিনে আসে, বস, চা খা। প্রভাত চা দিতে বলে পিনাকীকে জিজ্ঞেস করে, কি হল, চিনুকে বলেছিলি?

—বলেছি।

—করতে রাজী আছে?

—করবে না কেন? কত টাকা দেবে?

—পঞ্চাশ।

—কিছু টাকা আমায় আগে দিতে হবে।

—সে তুই যা বলবি।

পিনাকী চায়ে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করে, কবে থেকে রিহার্সাল শুরু হচ্ছে?

—পরশু। ওরা মেয়েদের আনবার আর পৌঁছবার জন্যে গাড়ী দেবে। আমি তুলে নিয়ে আসব চিনুকে।

—আচ্ছা, চিনুকে বলে রাখবো।

—তোর কাছে নতুন ছবি কিছু আছে নাকি?

—খান কয়েক পোর্ট্রেট।

—দেখি।

পিনাকী দু'খানা বড় ছবি বার করে দেয়। প্রভাত দেখে সবগুলিই

একটি নতুন মেয়ের বিভিন্ন ভঙ্গি। কয়েকটা বেশ ভাল উঠেছে। ছবির দিকে তাকিয়ে বলে, বাঃ বেশ উঠেছে তো!

—এগুলো নতুন তুলেছি।

—কে রে? প্রভাত প্রশ্ন করে।

—একটা মেয়ে।

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি, মেয়েটা কে, তাই বল না?

—চিত্ররূপা।

—বাবাঃ, নামটিও কবিতা।

—আমিই দিয়েছি।

—তাই নাকি? প্রভাত আড়চোখে পিনাকীর দিকে তাকায়, কি ব্যাপার, চিনু থেকে চিত্ররূপায় নাকি?

—তোর যত বাজে কথা। পিনাকী কথাটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে।

বিনোদের পার্ক সার্কাসের বাড়িতেই নাটকের রিহার্সাল হচ্ছে। বিনোদের বাড়ির কেউ এখানে থাকে না। অপেক্ষাকৃত নির্জন পাড়ায় বাগানের মধ্যে ছোট্ট দোতলা বাড়ি। অতিথি বা আত্মীয় কেউ কলকাতায় এলে ওঠে, নয় তো বেশির ভাগ সময়ই খালি পড়ে থাকে।

নাটকের চরিত্রানুযায়ী অভিনেতা-অভিনেত্রী যোগাড় হয়ে গেছে। সন্ধ্যের পর সপ্তাহে তিন দিন রিহার্সাল হয়। সব রকম খরচই বিনোদ দেয় বলে নায়কের পার্ট সব সময় বিনোদই নেয়। মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্ট চিনুর। বিনোদ রিহার্সালের দিন নিজে গাড়ী করে তুলে নিয়ে আসে আবার শেষ হয়ে গেলে পৌঁছে দেয়।

আজ কেষ্টর অনুমতি নিয়ে চিনু গৌরীকেও নিয়ে এসেছে রিহার্সাল দেখতে। গৌরীর বেশ মজা লাগে। ঘরের এক দিকে সবাই বসে,

ছেলেরা মেয়েরা। অন্য দিকে জায়গা খালি, দৃশ্য অনুযায়ী দু-একটা চেয়ার-টেবিল রাখা।

যাদের ডাক পড়ে তারা উঠে গিয়ে অভিনয়ের মহড়া দেয়। চিনু উঠে যাবার সময় বলে, তুই বস গৌরী, আমি সিন্‌টা করে আসি।

চিনুকে অভিনয় করতে দেখে গৌরীর হাসি পায়। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বসে। বিনোদের তখন পার্ট ছিল না। গৌরীর পাশে এসে বসে। ফিস্‌-ফিস্‌ করে জিজ্ঞেস করে, কি রকম লাগছে আপনার?

গৌরী অন্য দিকে তাকিয়ে বলে, ভালো।

—চিন্ময়ী দেবী বেশ ভালো অভিনয় করেন।

—হ্যাঁ।

—আপনি অভিনয় করেন না?

গৌরী হাসে, না।

—আমাদের সঙ্গে করুন না?

গৌরী লজ্জা পায়, পারবো না।

—চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?

—আপনাদের তো আর পার্ট খালি নেই, সব মেয়েই তো এসে গেছে।

—যিনি সাধনার পার্ট করছেন তাঁর একটু অসুবিধে আছে।

গৌরী হাসে, আচ্ছা বাড়িতে জিজ্ঞেস করবো।

বিনোদের ডাক পড়ে, অভিনয়ের পার্ট করতে উঠে যায়। একটু বাদে চিনু গৌরীর পাশে এসে বসে।

—বাঃ, তুই তো বেশ ভাল করিস!

—এমন আর কি?

—বাবাঃ, অতগুলো কথা কি সুন্দর বলে গেলি!

চিনু কথা ঘুরিয়ে বলে, বিনোদবাবুর সঙ্গে আলাপ হল?

—হ্যাঁ, বেশ ভাল লোক।

—কি বলছিলেন ?

—এখানে পার্ট করার জন্যে।

—তাই নাকি, কোন পার্টটা ?

—সাধনার। ঐ মেয়েটির কি অসুবিধে আছে।

—খুব ভালো হবে। তুই কর না, আমি বাড়িতে শিখিয়ে দেবো।

সেদিন বাড়িতে পৌঁছে দেবার সময় বিনোদ আবার বলে, চিন্ময়ী দেবী, আপনার উপর ভার রইল। সাধনার পার্টটা গৌরী দেবীকে দিয়ে করাতেই হবে।

চিনু দুষ্টুমি করে, আমার কথায় বুঝি রাজী হবে, আপনি বলুন ভালো করে।

—কি করে বলবো বলুন ? গলবস্ত্র হয়ে ?

গৌরী নিজে থেকে উত্তর দেয়, আমি বাড়িতে জিজ্ঞেস করবো।

—বলেন তো আমি গিয়েও বলতে পারি।

—না, তার দরকার নেই। যদি অনুমতি পাই, তাহলে নিজেই চেষ্টা করব পার্ট করতে।

বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে বিনোদ হাত তুলে নমস্কার করে। চিনু আর গৌরীও প্রতি-নমস্কার করে ভেতরে চলে আসে।

কেষ্ট ঘরে গৌরীর জন্যেই অপেক্ষা করছিল। জিজ্ঞেস করে, কি ব্যাপার এত হাসি-খুশি যে ?

—খুব মজা হয় রিহার্সালে।

—তাই নাকি ?

গৌরী শাড়ী বদলে কেষ্টর কাছে এসে বসে। জিজ্ঞেস করে, বিনোদ-বাবুর সঙ্গে তোমার আলাপ আছে ?

কেষ্ট প্রভাতের দেওয়া পত্রিকাটা দেখছিল, সেই দিকে তাকিয়েই বলে, কে বিনোদ?

—প্রভাতবাবুর বন্ধু।

—না বোধ হয়।

—বিনোদবাবুর বাড়িতেই রিহার্সাল হচ্ছে। একটু থেমে বলে, একটা কথা বলবো রাগ করবে না?

—কি?

—আমি থিয়েটারে পার্ট করবো।

—কেষ্ট চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করে, কে আবার মাথায় ঢোকাল?

গৌরী মাথা নীচু করে উত্তর দেয়, চিনু বলছিল। একজন মেয়ে করছে না, তাই।

—তুমি করতে পারবে?

—জানি না। চিনু বলছে বাড়িতে শিখিয়ে দেবে। তুমি যদি রাগ না কর, তাহলে—

—রাগ করার কি আছে, পারলে করবে বৈ কি।

—পঞ্চাশ টাকা দেবে বলেছে।

—এটা তো অ্যামেচার শো, এখানে টাকা দেবে কেন?

—মেয়েদের দেয়।

কেষ্ট গম্ভীর গলায় বলে, ভালো কথা।

গৌরী খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, সত্যি বল, তুমি রাগ করবে না তো?

কেষ্ট হেসে ফেলে, কি মুস্কিল, তুমি আর আমার কোন কথাই বিশ্বাস কর না দেখছি!

কেষ্টর মুখে হাসি দেখে গৌরী ভরসা পায়। বলে, আমি তাহলে চিনুকে বলে আসি, ও খুব খুশি হবে।

চিহ্নকে বলতেই সে ছুটে গৌরীর ঘরে আসে। কেষ্টকে বলে, আপনি মত দিয়েছেন তো? আমি বললাম গৌরীকে, কেষ্টদা মোটেই রাগ করবে না। তবু আপনার মুখ থেকে না শুনে ওর সোয়াস্তি নেই।

গৌরী কুঁজোয় জল ভরে আনতে চলে যায়। কেষ্ট চিহ্নকে বলে, এসব বিষয়ে একেবারে কাঁচা, তুমি দেখিয়ে দিও।

—সে ভার আপনার বলার আগেই নিয়েছি। একটু থেমে বলে, গৌরী আপনাকে খুব ভয় করে।

কেষ্ট হাসে, কেন, আমাকে দেখলে কি ভয় হয়?

—তা নয়। আপনি রাসভারী লোক। না বলে কিছু করতে সাহস পায় না।

—কেন, তুমি কি পিনাকীকে না বলেই কাজ কর?

চিহ্ন আস্তে আস্তে বলে, অনেক সময় করতে হয়।

—সে তো ভালো কথা নয়।

—আপনি যে রকম গৌরীর জন্যে করেন সে তো আমার জন্যে তেমন করে না?

এ প্রশ্নের কেষ্ট আর কি উত্তর দেবে, চুপ করে থাকে। পিনাকীর সঙ্গে যে চিহ্নর খুব বেশি বনিবনা নেই, তা সে গৌরীর কাছে আগেই জেনেছিল।

গৌরী জল নিয়ে ঘরে ঢোকে। কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, শ্যামল কোথায় জানো?

গৌরী মাথা নাড়ে, না, বলেছিল বিকেলের মধ্যে ফিরবে।

শ্যামল এলো আরও এক ঘণ্টা বাদে। তখন রাত সাড়ে ন'টা বেজে গেছে। গৌরী ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে, এত রাত হল যে?

শ্যামল ক্লান্তস্বরে বলে, অনেক দিন বাদে দেবেনদার কাছে গেছলাম। কথা বলতে বলতে দেরি হয়ে গেল।

কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, কে দেবেনদা ?

—নাম শোনেন নি, খুব বড় নেতা।

—কোন পার্টির ?

—তা জানি না। খুব জেল-টেল খেটেছেন। পলিটিক্‌স্ করেন।

—ও সব দলে ভিড়ো না।

—কেন ?

—খুব সুবিধেবাদী না হলে বিশেষ কিছু হয় না। শক্ত লাইন।

শ্যামল আর কথা বাড়ায় না। চেঁচিয়ে বলে, গৌরীদি, খেতে দিন। বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।

কেষ্ট পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে শ্যামলকে দেয়, নাও তোমার চিঠি।

চিঠি পড়ে শ্যামলের মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, কার চিঠি ?

—বাবার।

—কোথা থেকে লিখছেন ?

—মামার বাড়ি থেকে। কাল দেখা করতে চান।

কেষ্ট উৎসাহ দেয়, বেশ তো। সব কথা খুলে বল, উনি নিশ্চয় বুঝবেন।

শ্যামল চিন্তিত মুখে বলে, তাই বলবো।

গৌরী চেঁচিয়ে ডাকে, ভাত বাড়া হয়ে গেছে।

কেষ্ট আর শ্যামল পাশাপাশি খেতে বসে।

পরদিন সকালবেলা শ্যামল বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্যে বাড়ি থেকে বেরুল বটে, কিন্তু ট্রাম চলতে শুরু করতেই নানা রকম ভাবনা এসে তার মাথায় জড়ো হয়। আবার সেই মামার বাড়ি

যেতে কেমন যেন অস্বস্তি লাগে। এই ক'দিন আগে সে সেখান থেকে অপমানে লজ্জায় মাথা হেঁট করে বেরিয়ে এসেছে, কোন্ মুখে আবার সেই বাড়িতে ঢুকবে? চাকর-বাকর, মামাতো ভাইরা। তাদের কথা মনে হতেই শ্যামলের ভীষণ লজ্জা হয়। হয়তো বটুমামা আবার তাকে যা-তা কথা শোনাবেন। কি প্রয়োজন তার সেখানে গিয়ে? বাবার উপর তার কোন আস্থা নেই। ছোটবেলা থেকেই দেখেছে মামার কথায় উনি ওঠেন বসেন। নতুন কিছু তাঁর কাছে আশা করা ভুল। নয়তো আবার সেই মামার বাড়িতেই দেখা করতে বলবেন কেন? শ্যামল তো পরিষ্কার করে সব কথা লিখে দিয়েছিলো।

মামার বাড়ির কাছাকাছি এসে শ্যামল ট্রাম থেকে নেমে পড়ে। সামনের চায়ের দোকানে ঢুকে এক কাপ গরম চা খায়। সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। এতক্ষণে মনে মনে সে স্থির করে ফেলেছে আজ আর মামার বাড়ি যাবে না।

চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে শ্যামল সোজা গেল মদনের আড্ডায়, অনেক দিন বাদে দেখা। মদন উঠে এসে আশ্চর্যের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে, কি খবর তোর, এত দিন আসিস নি কেন?

শ্যামল নীরস গলায় বলে, শুনিসনি?

—কি?

—আমি এখন আর মামার বাড়িতে নেই।

—কেন? কোথায় আছিস?

শ্যামল আস্তে আস্তে সব ঘটনার বর্ণনা করে। মদন শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায়। সহানুভূতির স্বরে বলে, তুই এখন কেষ্টদার কাছে?

—হ্যাঁ, বেহালায়।

—ঠিকানা কি?

শ্যামল ঠিকানা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে বলে, দরকার হলে চিঠিই দিস। গেলে হয়তো দেখা হবে না, কখন বাড়ি থাকি ঠিক তো নেই।

দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলে। মদন বলতে সাহস করে না যে চুনীলালই শ্যামলের মামার কাছে এ সব কথা বলেছে। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, তোর মামা এ সব ব্যাপার জানলেন কি করে?

শ্যামল মুখ বঁ্যাকায়, কে জানে! বোধ হয় স্কুল থেকে লাগিয়েছে—

মদন বোঝে, জগৎবাবু চুনীলালের কথা শ্যামলকে বলেন নি। সহজ ভাবে বলে, কেষ্টদা তাহলে আজকাল বেহালায় থাকে?

—হঁ্যা।

—হঠাৎ?

—সেই যে ছেলেটাকে পোড়াতে শ্মশানে গিয়েছিলাম, তার দিদি এখন কেষ্টদার সঙ্গে থাকে কি না!

—তাই নাকি, কেষ্টদা বিয়ে করেছে?

—হয়নি, হবে। মেয়েটা খুব ভাল, আমায় ভাই-এর মত ভালবাসে।

—আজকাল কি করছিস, দেবেনদার কাছে যাস না?

—যাই মাঝে মাঝে। রাত করে ফিরলে আবার গৌরীদি বসে থাকে।

—এদিকে আর আসিস না?

—মামার বাড়ি থেকে চলে যাবার পর, এই প্রথম।

কথা বলতে বলতে দু'জনে বড় রাস্তায় এসে পড়ে। পাশে সারবন্দী বড় বড় দোকান। মদন হঠাৎ বলে, নন্দিতা—

—কই? শ্যামল ভাল করে দেখে উত্তর দেয়, হঁ্যা, নন্দিতাই।

নন্দিতা তার মার সঙ্গে কাপড়ের দোকানে এসেছিল। কাপড় কিনে দোকান থেকে বেরিয়ে আসে।

—পুজোর বাজার শুরু করে দিয়েছে বোধ হয়।

—তাই হবে।

নন্দিতারা সামনের গাড়ীতে উঠতে যায়। পাশেই মদনরা দাঁড়িয়েছিল, নন্দিতা ওদের দিকে তাকিয়ে হাসে। মদন আশ্চর্য হয়ে যায়, দেখেছিস শ্যামল, আমাদের চিনে গেছে।

—তা চিনবে না! সেই বই-এর দোকানে তো আমার সঙ্গে দু'-তিন দিন দেখা হয়েছে।

—তাই না কি, বলিসনি তো?

—এ আর বলার কি আছে। আমার নাম শ্যামল, তাও জানে।

নন্দিতাদের গাড়ী চলতে শুরু করে। পেছনের কাচ দিয়ে মেয়েটা আর একবার ফিরে তাকায়।

শ্যামল বলে, বোধ হয় মন্টুদাকে খুঁজছে।

মদনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেহালায় ফিরতে গিয়ে শ্যামলের মনে হ'ল তাই তো কেষ্টদাকে কি বলব। গেলেই তো বাবার কথা জিজ্ঞেস করবেন। মনে মনে ভাবে, কেষ্টদার সঙ্গে দেখা না হলেই ভাল হয়। কিন্তু মানুষ যা চায় সব সময় তা হয় না। বাড়ি ফিরেই কেষ্টর সঙ্গে দেখা। শ্যামলকে দেখেই কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, কি হল শ্যামল, বাবা কি বললেন?

শ্যামল চট করে উত্তর দেয়, কি আর বলবেন। সব কথা আমায় জিজ্ঞেস করলেন।

—মামা, বটুমামা এঁরা ছিলেন?

—না।

—তাহলে সব খোলাখুলি কথা হয়েছে।

—হয়েছে, তবে বাবাও কিছু ঠিক করতে পারেন নি। কালকে আবার যাব।

শ্যামল কেষ্টকে এড়িয়ে গৌরীকে জিজ্ঞেস করে, গৌরীদি, খাবার হয়েছে নাকি, আমায় আবার বেরুতে হবে। কেষ্টর আগেই খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। বলে, শ্যামল খেয়ে নাও, আমি চলি।

—কোথায় যাচ্ছেন ?

—পাড়ায়। এবার পুজোয় একজিবিশান করার কথা হয়েছে, তারই ব্যবস্থা করতে।

—আপনি একটা দোকান করবেন বলেছিলেন ?

- হ্যাঁ, ক'দিন মজা করা যাবে।

—আমি বিক্রি করবো কিন্তু।

—নিশ্চয়।

কেষ্ট চলে গেলে গৌরী শ্যামলের ভাত বেড়ে দেয়। শ্যামল জিজ্ঞেস করে, চিনুদি আজ খাবে না ?

—আমরা দু'জনে এক সঙ্গে খাব।

—আমার ফিরতে দেরি হবে।

—কোথায় যাচ্ছ ?

—দেবেনদার কাছেই।

গৌরী নিজের মনে হাসে, চিনু আমার মাস্টার হয়েছে জানো ত ?

—কেন ?

—আমাকে অভিনয় করা শেখাচ্ছে।

—কোন বইয়ে ?

—সেই যে তোমার প্রভাতদার লেখা নাটক।

—খুব ভাল হবে গৌরীদি, আমাকে কিন্তু পাশ দিতে হবে একটা

গৌরী আরও হাসে, দেখি আমায় নেয় কিনা।

শ্যামল খাওয়া শেষ করে হাত ধুতে উঠে যায়।

মদনের কাছে সব কথা শুনে চুনীলাল অবাক হয়ে যায়। সে কি, শ্যামলকে তাড়িয়ে দিয়েছে?

মদন আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে।

—এতখানি হবে আমি আশা করি নি, চুনীলাল ক্ষুব্ধ স্বরে বলে।

—কি করা যায় এখন?

চুনীলাল চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে, যাবো আর-একবার ওর মামার কাছে।

—কি হবে?

—বুঝিয়ে বলব।

—কি আর বোঝাবে। সব কথাই তো সত্যি! শ্যামল স্কুলে যায় না, গুণ্ডাদের দলে মিশছে, সব কথাই তো সত্যি!

চুনীলাল বলে, না, শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমার জন্যে ছেলেটাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে!

মদন বলে, এক কাজ করলে হয়, দেবেনদাকে গিয়ে বললে যদি শ্যামল শোনে।

চুনীলাল একটু ভেবে নিয়ে শেষে বলে, আচ্ছা বিকেলের দিকে বরং দেবেনদার কাছেই যাব।

কালীর আড্ডায় দেবেনদার সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার পর, চুনীলাল এই প্রথম দেবেনদার বাসায় গেল। দেবেনদা একলাই ইজিচেয়ারে বসে বই পড়ছিলেন। চুনীলালকে দেখে একমুখ হেসে অভ্যর্থনা করেন, এসো চুনীলাল! অনেক দিন আসনি।

চুনীলাল স-অভিমানে বলে, আপনিও তো খোঁজ নেননি।

দেবেনদা লজ্জা পান, কাজের ভিড়ে, বুঝছ না?

চুনীলাল আলাপ করিয়ে দেয়, এটি আমার বন্ধু মদন, চেনেন তো ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, শ্যামলের সঙ্গে দু'-তিন দিন এসেছিল।

সাধারণ আলাপের পর, চুনীলাল শ্যামলের কথা পাড়ে। দেবেনদা, একটা দরকারী কথা আছে, কাউকে বলবেন না—

—না। কি কথা ?

—শ্যামল বলেছে কি না জানি না, ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে !

—কেন ?

—স্কুলে যায় না। বাড়িতে মিথ্যে বলে বাইরে ঘুরে বেড়াত।

—আমায় তো এসব বলে নি ?

—আপনি ওকে বুঝিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিন।

দেবেনদা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলেন, বলবো, তবে আমার কথা শুনবে কি না জানি না।

চুনীলাল বলে, সে কি, আপনি বললেও শুনবে না ?

—আজকাল তাই দেখছি। শ্যামল আর দু-একজন আমার চেয়ে কালীর কথাই বেশি শোনে।

চুনীলাল রাগে উত্তেজনায় চেঁচিয়ে ওঠে। এই কথাই আমি সেদিন বলেছিলাম। সেদিন কালী আমায় মারলো, আপনি কিছু বললেন না।

দেবেনদা এ কথার উত্তর দিতে পারেন না। মাথা নীচু করে বসে থাকেন। চুনীলাল বলে যায়, আমি খুব ভাল করে জানতাম, কালীর মতলব ভাল নয়। ওরা কেউ আপনার আদর্শ বোঝে না।

দেবেনদা অসহায় ভাবে প্রশ্ন করেন, কিন্তু উপায় কি ?

—উপায় আমি কি বলবো, আপনাকেই ঠিক করতে হবে।

—আমি তো কিছুই ভেবে পাই না। একমাত্র কালীরাই যা আমার পার্টিকে ভালবাসে। আর কেউ কথা শোনে না।

—কথা শোনবার দরকার কি ?

দেবেনদার চোখে জল আসে, আমার যে অনেক কথা দেশবাসীকে বলার আছে, তা কি বলা হবে না?

—গুণ্ডাদের দিয়ে বলানোর চেয়ে না বলাই ভালো। আপনি বুঝতে পারছেন না যে দেশের জন্যে, দেশবাসীর জন্যে আপনি এতখানি স্বার্থ-ত্যাগ করেছেন! তারা আপনাকে কতখানি ধিক্কার দেবে পরে সুবিধাবাদী ভেবে। সেইজন্যেই তো কালীরা আপনাকে ছাড়তে চায় না।

দেবেনদা দাঁড়িয়ে উঠে পায়চারী করতে থাকেন, যাদের জন্যে প্রাণপাত করে সারাজীবন খাটলাম, তারাই তো আর আমায় চায় না।

চুনীলাল দৃঢ়স্বরে বলে, তাহলে আপনার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আর দেবার মত বোধ হয় আপনার কিছু নেই।

দেবেনদার এ প্রসঙ্গ আর ভালো লাগে না। শান্ত গলায় বলেন, আমায় এখন বেরুতে হবে চুনীলাল!

—আমরাও উঠবো! চুনীলাল উঠে দাঁড়ায়, শ্যামলকে একটু বোঝাবেন।

দেবেনদা হ্যাঁ কি না কিছুই বলেন না, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন।

দেবেনদার বাড়ি থেকে বেরিযে মদনই প্রথম কথা বলে, বাবা, তুমি তুখোড় লেক্‌চার দিতে পার, একেবারে মুখস্থ।

চুনীলালাল একথা কানে না তুলে বলে, দেবেনদার জন্যে সত্যি দুঃখ হয়। কতখানি খাঁটি লোক। শুধু পাওয়ার পলিটিক্‌স্‌ মাথায় ঢুকে দিনে দিনে কোথায় নেমে যাচ্ছে। নিজের স্বার্থ যখন কাজের চেয়ে বড় হয় মানুষের বিচার-বুদ্ধি লোপ পায়।

কথা বলতে বলতে দু'জনে ট্রামে উঠে পড়ে।

সেদিন সিনেমা থেকে প্রভাত বেলারাণীর সঙ্গে চলে গিয়েছিল বলে অরুণা চার-পাঁচদিন রেগে কথা বলেনি। প্রভাত রোজই গেছে, রাগ

ভাঙ্গাবার যত রকম কৌশল জানে সব রকম চেষ্টা করেছে কিন্তু কোনও ফল হয় নি। রোজ প্রভাতকে অরুণার পড়ার ঘরে বসে থাকতে হয়। অরুণা বেশ দেরি করে নামে, একটি কথাও না বলে বইখাতা বার করে বসে। প্রভাত সেদিনের ঘটনা সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই মাথা ধরেছে বলে উঠে চলে যায়। অগত্যা প্রভাতকে শেষ চেষ্টা করতে হয়। সরাসরি অরুণাকে বলে, আমি আর তোমাকে পড়াতে পারব না। রমেশবাবুকে বলে ছুটি চেয়ে নিচ্ছি। যে ছাত্রী কথা বলে না, তাকে কি করে পড়াব?

অরুণা এরও কোন উত্তর দেয় না।

প্রভাত বলে যায়, জীবনে এরকম অবস্থায় আমি কখনও পড়িনি। সেদিন বেলারাণী ধরে নিয়ে গেল ডায়লগ দু'-একটা বদলাবার জন্যে, তার আমি কি করবো? যদি না যাই তো আমার বই নেবে কেন? তুমি কি চাও না আমার বই সিনেমা হয়?

অরুণা এতক্ষণে কথা বলে, তা চাইবো না কেন?

—তাহলে? বেলারাণীর হাতেই তো সব। সে যদি ডাকে আমায় যেতে হবে তো, আমি কি নিজের ইচ্ছেয় গেছি?

—কি রকম ড্যাব-ড্যাব করে আমার দিকে তাকাচ্ছিল।

—কে?

—আপনার বেলারাণী। কি সঙের মত সেজেছিল। ছবিতেই যা ভালো দেখায়।

—সে তো সবাই জানে।

—আপনিই তো বলেন, কি চেহারা, কি সুন্দর কথাবার্তা। একেবারে প্রেমে পড়ে গেছেন।

প্রভাত ধমক দেয়, কি বাজে বক? তোমার কথায় যদি কোন আঁট থাকে।

অরুণা হেসে ফেলে, যেমন মাস্টার তেমনই ছাত্রী হবে তো?

অরুণার মুখে হাসি দেখে প্রভাত আশ্বস্ত হয়, যাক্ তাহলে রাগ গেছে ?

—যদি আপনি মাস্টারী করা না ছাড়েন।

এবার প্রভাতও হাসিতে যোগ দেয়, মাস্টারী ছাড়ার হুকমীতে কাজ হয়েছে বল ?

—তা হবে না, আপনার মত ফাঁকিবাজ মাস্টার মশাই আর কোথায় পাব ?

প্রভাত ভুরু কুঁচকে বলে, তুমি দেখছি আমাকে আর আজকাল একেবারেই মানো না !

—কে বললে ? ভীষণ ভীষণ মানি। সত্যি বলছি, দেখুন না ঠোঁটে আর লিপস্টিক মাখি না।

—সত্যি !

—তা নজর করবেন কেন ? কথা শোনাবার বেলা ওস্তাদ। ঠোঁটে রং মাখা আমি পছন্দ করি না। দেখলাম তো বেলারাণীকে, কি রংই মেখেছে। ওকে তো কিছু বলতে পারেন না।

প্রভাত হাসে, কি মুস্কিল, ছুনিয়াসুদ্ধ মেয়ে আমার পছন্দমত চলবে নাকি, তোমার যা বুদ্ধি !

এ ধরনের হাল্কা কথাবার্তার মধ্যে হঠাৎ অরুণার চোখ সজল হয়ে ওঠে। বলে, প্রভাতদা, বাবার আজকাল কি হয়েছে।

অরুণার চোখে জল দেখে প্রভাত বিচলিত হয়, কি হয়েছে ?

—জানি না। অরুণা একবার চারিদিক দেখে নিয়ে, নীচু গলায় বলে, রাত-দিন চুপ করে বসে ভাবেন, অফিসেও যান না।

—কবে থেকে ?

—দিন ছুই।

—শরীর খারাপ। জ্বর আছে ?

—না

—যদি বল আমি একবার দেখা করতে পারি।

—কারুর সঙ্গে দেখা করেন না। চুপ করে ঘরের মধ্যে বসে থাকেন।

—এত দিন বলনি কেন ?

—মা বারণ করেছিলেন। অরুণা নীচু হয়ে চোখের জল মুছে ফেলে। বাবার কি হয়েছে বলুন না প্রভাতদা !

—না দেখলে কি করে বুঝবো ?

অরুণা ধরাগলায় বলে, আমার কি রকম ভয় করছে।

—ভয়ের কি আছে ? আমি তো রোজই আসছি। যদি সেরকম দরকার হয় ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দিও।

প্রভাত অরুণাকে ভরসা দিয়ে বেরিয়ে আসে বটে কিন্তু তার মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়, সত্যি হঠাৎ কেন রমেশবাবু এমন হয়ে গেলেন ? রমেশবাবুর স্নেহপ্রবণ হাসিভরা মুখটা তার চোখের সামনে ভাসে।

চিন্ময়ীর কাছে অভিনয় করতে শিখে গৌরী একদিনেই বিনোদের ক্লাবে বেশ নাম করে ফেলেছে। অভিনয়ের ধরনটা ওর খুব স্বাভাবিক, মনেই হয় না মুখস্থ বলছে। বিনোদ খুবই প্রশংসা করে—দেখুন তো কি অন্যায়। আপনি এত সুন্দর অভিনয় করেন অথচ কিছুতেই প্রথমে করতে চাইছিলেন না।

গৌরী লজ্জায় লাল হয়ে যায়। বিনয় করে উত্তর দেয়, সত্যি, কিন্তু আমি আগে কখনও করিনি।

বিনোদ ভুরু উঁচু করে বলে, আশ্চর্য, আমি কোন মেয়েকে প্রথম চোটে এত ভালো অভিনয় করতে দেখিনি। ধরুন না এই চিন্ময়ী দেবীর কথা, কত দিন থেকে পার্ট করছেন কিন্তু আপনার মত নয়।

—সে কি বলছেন, আমি তো ওর কাছে শিখেছি।

—তাহলে শুরুমারা বিদ্যে আয়ত্ত করেছেন বলতে হবে।

বিনোদের সঙ্গে গৌরীর কথা বলতে ভালো লাগে। সব সময় কেমন খাতির করে কথা বলে। প্রথম প্রথম আশ্চর্য লাগলেও এখন গৌরীর অভ্যেস হয়ে গেছে।

বিনোদ বলে, গৌরী দেবী, আপনার গলার মত মনটাও মিষ্টি। গৌরী লজ্জা পায়, কি যে বলেন—

—সত্যি বলছি। আপনার এতটুকু অহঙ্কার নেই। আপনি এ লাইনে থাকলে একদিন খুব বড় অভিনেত্রী হতে পারবেন।

—গৌরী অবিশ্বাসের সুরে বলে, এত সহজে কি হয়?

—নিশ্চয় হয়। আপনার প্রতিভা আছে, চেষ্টা করা উচিত।

বিনোদ যে শুধু গৌরীর মন রেখেই কথা বলতো তা নয়, তার মধ্যে অনেকখানি সত্য ছিল। চিনুও কয়েক দিন রিহার্সালের পর বাড়িতে কেষ্টকে বলেছিল, গৌরী কি সুন্দর পার্ট করছে, একদিন চলুন না মহড়া দেখতে।

কেষ্ট ঠাট্টা করে বলে, তোমার তো গৌরীর সব কিছুই ভাল লাগে।

—বেশ তো নিজেই গিয়ে দেখুন না।

—তাহলে পরে ভাল লাগবে না। একেবারে আসল প্লে'র দিন যাব।

—আচ্ছা, সেই ভাল।

রিহার্সালের সময় বিনোদ বেশির ভাগ সময়ই গৌরীর পাশে বসে বক বক করে। টাকা-পয়সাওয়ালা এত বড় একজন লোকের এ ধরনের সহজ মেলামেশায় গৌরী মুগ্ধ হয়। তাই রিহার্সালের দিনগুলির জন্যে অধীর আগ্রহে বসে থাকে। এ সপ্তাহে অনেকের অসুবিধে থাকায় একদিন মাত্র রিহার্সালের দিন স্থির হয়েছে; তাই আজ যখন চিনুর জর

হয়ে গেল, গৌরীর মন খারাপ হয়ে যায় যাওয়া হবে না বলে। কিন্তু চিনু বলে, তুই কেন যাবি না, ওদের মুস্কিল হবে যে!

গৌরী আপত্তি জানায়, না চিনু, আমি একলা যাব না।

চিনু হাসে, তা কখনও হয়, রিহার্সালে তোর কামাই করা উচিত নয়। একে নতুন—

—বিনোদবাবুর সঙ্গে একা—

—তাতে কি হয়েছে, বিনোদবাবু তো খেয়ে ফেলবে না।

—কেষ্টদা যদি কিছু মনে করে?

চিনু বোঝে গৌরীর রিহার্সালে যাবার খুবই ইচ্ছে, শুধু মুখেই যা আপত্তি। হেসে বলে, এত মেয়ে আসছে যাচ্ছে, এতে মনে করার কি আছে।

—তবু আমার ভয় করে।

—কেষ্টদাকে না বললেই হ'ল। আমি তো এর পরের দিন থেকেই আবার যাব।

গৌরী আর আপত্তি করে না। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নেয়।

গৌরীকে একা দেখে বিনোদ জিজ্ঞেস করে, আপনার বান্ধবী যাবেন না?

—না। ওর শরীর খারাপ।

—তাহলে আপনি চলুন।

গৌরী উঠে বসে। গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে বিনোদ বলে, চিন্ময়ী দেবীকে ছেড়ে আপনি আসবেন, আমি ভাবিনি।

—কেন?

—যা বন্ধু-অন্ত প্রাণ!

—কেন আমার বন্ধুকে নিয়ে সব সময় ঠাট্টা করেন বলুন তো?

বিনোদ প্রায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়লের কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, আজ কিন্তু অনেক সময় আছে, একটু বেড়িয়ে যাবেন?

—কোথায় ?

—গঙ্গার ধারে।

গৌরী চট্ করে উত্তর দিতে পারে না। বিনোদ জোর করে, চলুন না, কি হয়েছে ?

বিনোদের পীড়াপীড়িতে ভালো-মন্দ বিবেচনা না করেই গৌরী বলে ফেলে, চলুন।

বিনোদ হাসে, ভয় নেই। আপনার কেষ্টদার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে না।

—আহা, বেড়াতে গেলে কেষ্টদা কি বল্‌বে।

বিনোদ গৌরীর দিকে তাকিয়ে বলে, সত্যি, কেষ্টবাবু ভাগ্যবান। আপনার মত মেয়েকে কত সহজে পেয়েছেন।

গৌরী ম্লান হাসে, আমার সব কথা তো আপনি শোনেন নি। আমার মত মেয়ে পথে-ঘাটে ছড়ানো আছে। কেষ্টদা দয়া না করলে—

বিনোদ গম্ভীর হয়ে বলে, এখানে আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারি না, আপনার সব কথাই আমি জানি।

গৌরী চমকে ওঠে, কি করে ?

বিনোদ অন্যমনস্ক ভাবে বলে যায়, গৌরী দেবী, বস্তী থেকে আপনাকে বার করে আনা কেষ্টবাবুর উচিত হয় নি।

গৌরী বাধা দেয়, হঠাৎ এমন বিশ্রী গোলমাল হ'ল যে—

—জানি, রাজেন আমায় সব বলেছে।

—রাজেনের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে নাকি ?

—নিশ্চয়।

গৌরী তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করে, রাজেন কেমন আছে ?

—ভালো, তবে সে আপনাকে ভুলতে পারে নি।

—আশ্চর্য, সে-কথাও আপনাকে বলেছে ?

—বলেনি। তবে আমি বুঝতে পারি।

গঙ্গার ধারে গাড়ী রেখে দু'জনে নেমে পায়চারী করে। বিনোদ জিজ্ঞেস করে, আপনাদের বিয়ে কবে?

—ওনার দাদার সঙ্গে ঝগড়া চলছে। বাড়ি ভাগ হলে—

—বাড়ি ভাগ তো ওর অনেক দিন হয়ে গেছে।

—সে কি, আমি তো জানি না?

—আমি জানি। ওকে জিজ্ঞেস করবেন।

গৌরীর চোখে জল এসে যায়। মুখ নীচু করে বলে, চলুন, গাড়ীতে ফিরে যাই, আর হাঁটতে পারছি না।

—চলুন।

পার্ক সার্কাসের বাড়িতে এসে বিনোদ আর গৌরী দেখে সবাই তাদের জন্যে বসে আছে। বিনোদ কৈফিয়তের সুরে বলে, কি করবো চিন্ময়ী দেবীর জ্বর। ইনিও কিছুতেই আসবেন না, জোর করে ধরে এনেছি।

রিহার্সাল শুরু হয়। গৌরী আজ কিছুতেই ভালো করে বলতে পারে না, বার বার ভুল করে। বিনোদ ফোড়ন কাটে, আজকে আর মন নেই, বন্ধুর শরীর খারাপ, তার ওপর জোর করে ধরে আনা হয়েছে।

গৌরীর সঙ্গে বিনোদের চোখাচোখি হতেই দু'জনে হেসে ফেলে। রিহার্সালের সময় আজ আর অন্য দিনের মত বিনোদ এসে গৌরীর পাশে বসলো না। একটা ফাজিল ছেলে মন্তব্য করে, বিনোদদা সত্যিই জোর করে গৌরী দেবীকে ধরে এনেছে, তাই আর ভয়ে কাছে ঘেঁষছে না।

রাত্রে বাড়ি ফেরার সময় গাড়ীতে আর দু'জন মেয়ে থাকায় বিনোদ গৌরীর সঙ্গে বিশেষ কথা বলার সুযোগ পায় না। গৌরীকে নামিয়ে বিনোদ বলে, কালও রিহার্সাল আছে, ভুলে যাবেন না।

গৌরী হেসে বলে, না, নমস্কার!

—নমস্কার!

গৌরী বেশ হাল্কা-মনে বাড়িতে ঢোকে। প্রথমেই চিনুর ঘরে যায়। চিনু শুয়ে শুয়ে কি একটা বই পড়ছিল, গৌরীকে দেখে জিজ্ঞেস করলে, কেমন হ'ল?

গৌরী মুখ ব্যাজার করে বললে, ভাল নয়।

—কেন?

—তুই না থাকলে আমি বলতে পারি না।

—পাগলী, তা করলে হয়? পার্ট তো একলাই করতে হবে।

—সবাই তোর কথা জিজ্ঞেস করছিলেন।

—রিহার্সালে না গেলেই খোঁজ পড়ে।

গৌরী চিনুর পাশে বসে মাথায় হাত দেয়, তোর এখনও তো বেশ জ্বর রে, কাল যেতে পারবি?

—বোধ হয় না, গায়েও ব্যথা রয়েছে।

গৌরী উঠে দাঁড়ায়, কাল রিহার্সাল না রাখলেই ভাল হ'ত। যাই দেখি, কেষ্টদা এলো কি না—

—না, এখনও আসেনি।

চিনু কালও রিহার্সালে নাও যেতে পারে এই সম্ভাবনায় গৌরী মনে মনে খুশি হয়। বিনোদবাবুর ব্যবহার তার সত্যিই ভাল লেগেছে। কত নরম, কত সহানুভূতিশীল! হঠাৎ গৌরী ভাবে, বিনোদবাবু কি বিয়ে করেন নি? বিনোদের সব কথা জানবার জন্যে তার মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

গৌরীর সব চিন্তা ছিঁড়ে যায় কেষ্ট ফিরে আসতেই। বিনোদের কথাগুলো ভিড় করে আসে। থাকতে না পেরে গৌরী এক সময় জিজ্ঞেস করে, তোমাদের বাড়ি ভাগ হয়নি?

কেষ্ট গৌরীর মুখ থেকে এ ধরনের প্রশ্নে বিস্মিত হয়, হঠাৎ এ কথা কেন?

—এমনি জিজ্ঞেস করছি।

কেষ্ট তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকায়, কে শিখিয়ে দিয়েছে?

গৌরী হাসবার চেষ্টা করে, কে আবার শেখাবে?

—নিশ্চয় কেউ বুদ্ধি দিয়েছে। কে তা জানি না, তবে ভালো করেনি।

—কেন?

—আজ তুমি বুঝতে পারবে না গৌরী, তবে একদিন আসবে যখন বুঝবে।

এ ধরনের বড বড় কথা কেষ্টর মুখে এত শুনেছে যে গৌরীর আর ধৈর্য থাকে না। রুক্ষ স্বরে বলে, ঘাট হয়েছে আর জিজ্ঞেস করবো না। নাও, মুখ হাত-পা ধুয়ে নাও।

গৌরীর বলার ধরনে কেষ্ট ব্যথিত হয়, কিন্তু প্রকাশ করে না। মুখ-হাত ধুয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, তোমাদের থিয়েটাব কবে?

—পুজোর সময়।

—তাহলে তো মুস্কিল! পুজোর সময় একজিবিশানে একটা দোকান খুলছি, ব্যস্ত থাকবো।

—দোকানে কারা বিক্রি করবে?

—আমি আর শ্যামল।

—আমিও থাকবো।

—সে কি করে হবে?

—কেন?

—পাড়ার মধ্যে কথা উঠবে।

বিনোদের কথাগুলো আবার গৌরীর মনে পড়ে যায়। বলে, তাতে কি হয়েছে, বিয়ে তো হবেই।

—সে যখন হবে।

এ উত্তর গৌরী আশা করেনি। মনে মনে ভাবে বিনোদ হয়তো ঠিকই বলেছে, কেষ্ট বোধ হয় তাকে এখন এড়িয়ে যেতে চায়।

পরদিন বিনোদের গাড়ী অন্য দিনের চেয়ে আধ ঘণ্টা আগেই এলো। গৌরী আর চিনুর ঘরে না গিয়ে সোজা গাড়ীতে উঠে বসে।

বিনোদ জিজ্ঞেস করে, চিন্ময়ীদেবী আজও যাবেন না?

—না, বেশ জ্বর আছে এখনও।

—আমি কি দেখা করে যাবো?

গৌরী নীচু গলায় বলে, না, থাক।

—তথাস্তু। বলে বিনোদ গাড়ীতে স্টার্ট দেয়।

গৌরীর আজ ইচ্ছে ছিল না যে চিনু তাদের সঙ্গে যায়। তাই বলতে গেলে দুপুরের পর একবারও সে চিনুর ঘরে যায় নি। পাছে চিনু বলে বসে, এখন বেশ ভাল আছি, তোর সঙ্গে যাব। গৌরী এক রকম নিঃশব্দেই বেরিয়ে এসেছে। চিনু বোধহয় একটু অবাক হবে, গৌরী ভাবে, তা হোক।

—কি ভাবছো? বিনোদের প্রশ্নে গৌরী চমকে ওঠে, চোখে চোখ রেখে বলে, কিছু না।

—আজ কোন্ দিকে যাবে, বল?

—আপনি বলুন।

—পার্ক সার্কাসের বাড়িতেই যাওয়া যাক। রিহার্সাল শুরু হতে দেরি আছে, ওপরে বসে গল্প করা যাবে বেশ।

এ বাড়িতে রিহার্সালে এসে গৌরী নীচে থেকেই বরাবর চলে গেছে। আজ ওপরে এসে সাজানো সুন্দর ঘর দেখে সে অবাক হয়। বলে, বাঃ, কি চমৎকার সাজানো!

বিনোদ হেসে বলে, এ তো কিছুই নয়। আগে আরও গোছান ছিল, এখন তো ব্যবহারই হয় না।

বিনোদ গৌরীকে ঘরগুলো দেখায়। দুটো শোবার ঘর, সঙ্গে বাথরুম। মাঝখানে খাবার ঘর, পাশে বৈঠকখানা। চার পাশ দিয়ে বারান্দা গেছে। গৌরী সব জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখে। বলে, কি সুন্দর বাড়ি।

বারান্দায় দুটো চেয়ার এনে ওরা বসে। বেয়ারা চা দিয়ে গেল।

গৌরী প্রশ্ন করে, দক্ষিণের শোবার ঘরে যে ভদ্রমহিলার ছবি দেখলাম, উনি কে?

—মা।

—মারা গেছেন?

—দশ বছর। একটু চুপ করে থেকে বিনোদ ধরাগলায় বলে, সেই থেকে আমার এই অবস্থা, গৌরী! মা মারা যাবার পর থেকে চোখে অন্ধকার দেখলাম। উনি যে আমার কি ছিলেন কেউ বুঝবে না।

গৌরী সহানুভূতি প্রকাশ করে, আমি বুঝতে পারি! আপনার কথা থেকে, ব্যবহার থেকে। মায়ের স্নেহ-ভালবাসা না পেলে কারুর মন এত নরম হয় না।

—সত্যি গৌরী, আমি নরম, ফুলের মত নরম। টাকা-সম্পত্তি পেয়েছি অনেক। বাবা, জ্যাঠামশাই-এর, আবার দাদুর। এক পুরুষে উড়ানো যায় না, এত সম্পত্তি। কিন্তু কি হবে? এতটুকু শান্তি পেলাম না। আমি বড় একলা গৌরী!

—আপনি বিয়ে করেন নি?

—করেছিলাম। সে আর এক ট্র্যাজেডী। আমার স্ত্রী রূপসী, শিক্ষিতা, কিন্তু বনলো না।

—কি রকম?

—দু'বছর একসঙ্গে ছিলাম। একদিনের জন্যেও সে আমাকে ভালোবাসে নি।

গৌরী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করে, কেন ?

বিনোদ ম্লান হাসে, মুখে না বললেও আমি জানতাম সে আমায় ঘেন্না করে। কারণ আমার লেখাপড়া হয় নি। সব সময় ভাবতো, আমি বড় লোকের মুখ্যু ছেলে। টাকা-পয়সার খারাপ দিকটাই জানি, ভালর সন্ধান পাইনি। চোখ-মুখে তার অবজ্ঞা ফুটে উঠত, আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারতাম না গৌরী !

—তারপর ?

—ওদের বাপের বাড়ির অবস্থা ভাল ছিল না। কিন্তু লেখাপড়ার দম্ভ ভীষণ। আমি সেখানে গেলেও অস্বস্তি বোধ করতাম। এ সবও হয়ত আমি সহ্য করতাম, কিন্তু যেদিন দেখলাম আমার মাকেও সে ঘেন্না করে—

—তাও কি হয় ?

বিনোদের চোখে জল এসে পড়ে। সামলে নিয়ে বলে, আমার মা ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিধে, ভালমানুষ। লেখাপড়া শেখেন নি, সব সময় পুজো-আচ্ছা নিয়ে থাকতেন। তাঁরই ওপর হল ওর আক্রোশ। উঠ্‌তে বসতে কথা শোনাত। পুজো-আচ্ছাকে কুসংস্কার বলে ঠাট্টা করত। মাকে অসুখী দেখে মনে খুব কষ্ট পেতাম। কোনো এক ষষ্ঠীপুজোর দিন মা ওকে সংযম করতে বলেছিলেন। বিয়ে দু'বছর হলেও আমাদের কোন ছেলেপিলে হয়নি। মা শুভদিন দেখে একটা মানত-করা শেকড় নিয়ে এসেছিলেন। আশ্চর্য, আমার স্ত্রী তাঁর সামনে শেকড়টা ফেলে দিয়ে বললে, এসব আমি বিশ্বাস করি না। মা কাঁদতে লাগলেন। আমার মাথায় আগুন চেপে গেল, মুখে যা এল তাই বললাম। রমলা তার একটি প্রতিবাদ করল না, আস্তে আস্তে ঘর থেকে চলে গেল। ভাবলাম রমলা ওর ভুল বুঝতে পেরেছে, কিন্তু না। সেই দিনই ও বাপের বাড়ি চলে যায়, আর ফেরেনি। আমিও আনতে যাইনি। মা একবার গিয়েছিলেন, সে আসেনি।

গৌরী চুপ করে ততক্ষণ শুনছিল। জিজ্ঞেস করে, এখন তিনি—

—একটা মেয়েদের স্কুলে মাস্টারী করে।

—আপনার সঙ্গে দেখা হয় না?

—না।

—আর বিয়ে করলেন না কেন?

—এর পরও?

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বিনোদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে পড়ে, যাক, ওসব কথা। চল, একবার নীচে যাই, রিহার্সালের সময় হ'ল।

সেইদিনই রিহার্সালের সময় এক ফাঁকে বিনোদ বলে, অনেক আজে-বাজে বকলাম, তোমার হয়ত খারাপ লাগলো। আমার মনটা বেশ হালকা লাগছে।

গৌরী মৃদুস্বরে বলে, আপনি অনেক কষ্ট পেয়েছেন—

বিনোদ গাঢ় স্বরে উত্তর দেয়, তুমি আমায় ঠিক বুঝতে পেরেছো গৌরী, আমি বড় অসহায়।

গৌরী বিনোদের দিকে নরম চোখে তাকায়।

সারা রাত গৌরী বিনোদের কথা ভাবে। বিনোদ বড়লোক। এ ধরনের পয়সাওয়ালা লোকেদের গৌরী চিরকাল দূর থেকেই দেখেছে। এই প্রথম সে একজনের সান্নিধ্য পেল। বিনোদ তাকে মুগ্ধ করেছে, তার ব্যবহারে তার সহানুভূতিশীল মন দিয়ে। এ মনের পরিচয় গৌরী আর কারুর কাছে পায়নি। এমন কি কেষ্টদার কাছেও না। আজ তার মনে হয়, কেষ্টদার মধ্যে যা আছে তা হোল দয়া, অনুকম্পা, কর্তব্যবোধ। যা নেই তা হোল ভালবাসা। বিনোদ কিন্তু সে ভালবাসার সাজি ভরিয়ে ফুল এনেছে। গৌরীকে সে নারার সম্মান দিয়েছে, এর চেয়ে বড় সম্মান গৌরী আশা করেনি। কেষ্টদার কাছে

তার পরিচয় আশ্রিতা হিসেবে, নারী হিসেবে নয়। এ পার্থক্য যে কতখানি তা গৌরী নিজে ছাড়া কার কে বুঝবে? কেষ্ট এতদিন তার জন্যে যা যা করেছে সে-সব কথা ছবির মত চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কেষ্ট না থাকলে বিনোদের সঙ্গে আলাপের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এ কথা মনে হতেই কেষ্টর জন্যে কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে উঠেছে। কিন্তু তা কৃতজ্ঞতাই, আর কিছু নয়।

হঠাৎ গৌরীর মনে হল সে এসব কি ভাবছে, এ যে অন্যায় পাপ, সর্বান্তঃকরণে কেষ্টর কথা ভাববার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। তার এতদিনের অবহেলিত নারীত্ব সংযমের বাধা ভেঙ্গে বিনোদের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে।

গৌরী ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে। ঘরের এক কোণে শ্যামল অকাতরে ঘুমুচ্ছে। গৌরী নিঃশব্দে কুঁজো থেকে জল নিয়ে নিজের চোখে-মুখে ছিটিয়ে দেয়। মনটা অনেক শান্ত হয়ে আসে।

এরই মধ্যে একদিন শ্যামার বিয়ে হয়ে গেল। পাড়ার লোক কেউ জানতো না। তাদের খেয়াল হ'ল শ্যামার চিৎকার করে কান্না শুনে। প্রথমে ভেবেছিল, বলরামের ঘরে বুঝি কোন বিপদ হয়েছে। খবর নিতে এসে দেখে শ্যামার বিয়ে হচ্ছে।

কেষ্টর পক্ষেও সেই একই কথা, বলবাম তাকেও জানায়নি। বাড়ি ভাগ হয়ে গেছে। তাই দাদার অংশে যাবার বা সেখান থেকে কারুর আসার সুযোগ নেই। শ্যামার কান্না শুনে কেষ্ট অবশ্য বুঝেছিল যে জোর করে ওর বিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু সে নিরুপায়। ছাদ থেকে উঁকি মেরে দেখে বর এসেছে, সঙ্গে তিনজন পুরুত একজন বরকর্তা। এছাড়া আর কেউ নেই। বলরামেয় দিকেরও বিশেষ কেউ আসেনি। শুধু শ্যামার মামার বাড়ির একগুষ্টি মেয়ে-বউএসেছে স্ত্রী-আচার করতে।

কেষ্ট তাকিয়ে তাকিয়ে বরকে দেখে। কালো মোটাসোটা দোহারা চেহারা। খোঁচা খোঁচা গোঁফ, মাথায় টাক, বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ তো হবেই, দেখলে আরও বেশি মনে হয়। শ্যামার চেহারা ভালো না হলেও বয়স কম। বয়সের শ্রীটুকু অন্তত আছে। কিন্তু এ ভদ্রলোকের তা-ও নেই।

শ্যামা কেঁদেই যাচ্ছে, তারস্বরে কান্না। বলরাম ধমকাচ্ছে, কান্না কেন, বিয়ের দিনে চোখের জল? শ্যামা উত্তর দেয় না। শাঁখা, শাড়ী আর সিঁদুর দিয়ে শ্যামার বিয়ে হয়ে গেল।

বলরাম কোনদিন ভাবে নি, এই কালো মেয়েটকে এত সহজে পার করতে পারবে। প্রতিবেশীরা—তাদের খবর দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করলে বলে, ভাংচি দেবার লোক ডেকে লাভ কি?

কথা শুনে তারা মুখ ফিরিয়ে চলে যায়।

পরদিন পাড়ার লোক জানালা দিয়ে দেখে রিক্সা করে বর-বউ চলে গেল। শ্যামার কোন দিকে খেয়াল নেই, অঝোর ধারায় কাঁদছে।

কেষ্ট সারাক্ষণ ছিল না। শ্যামার কান্না শুনে থেকেই তার মনটা খারাপ হয়েছিল। একসময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে অনন্ত-কেবিনে ঢোকে। আশুদা জিজ্ঞেস করলেন, শরীর খারাপ হয়নি তো?

—না।

—শ্যামার যাবার সময় তুমি থাকলে না? তোমার জন্যে বড় কাঁদছিল।

—হুঁ।

আশুদা বোঝেন কেষ্ট কথা বলতে চাইছে না। বলেন, বোস, তোমার চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

কেষ্ট সেখান থেকে উঠে পড়ে, অন্য দিনের চেয়ে সকাল সকাল বেহালায় যায়। গৌরী ঘরে ছিল না, রিহার্সালে গিয়েছিল। কেষ্ট পকেট থেকে আর একটা চাবী বার করে দরজা খুলে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

দরজা খোলার শব্দে চিনু ভেবেছিল গৌরী বুঝি ফিরেছে। ঘরে ঢুকে কেষ্টকে দেখে বিস্মিত হয়।

—আপনি এত সকাল সকাল?

কেষ্ট ম্লান হেসে উত্তর দেয়, শরীরটা ভাল নেই।

—কি হ'ল?

—এমনি ম্যাজম্যাজ করছে। গৌরী কোথায়?

—রিহার্সালে গেছে।

—তুমি যাওনি?

—না, আমার তো ক'দিন থেকে জ্বর।

—একলা গেছে?

—বিনোদবাবু গাড়ী করে নিয়ে গেছেন, আবার পৌঁছে দেবেন। গৌরী তো একা কিছুতেই যাবে না। আমি জোর করে পাঠিয়ে দিলাম।

কথাটা অবশ্য একেবারেই সত্যি নয়। কারণ, আজ যে রিহার্সাল আছে, গৌরী সে-কথা চিনুকে আগে বলেই নি। এমন কি যাবার সময় জিজ্ঞেসও করেনি ও যাবে কি না। সেই জন্যেই চিনু ঝগড়া করতে এসেছিল, কিন্তু ঘরে কেষ্টকে দেখে সম্পূর্ণ অন্য কথা বলে যায়।

কেষ্ট হঠাৎ বলে, মাথাটা বড্ড ধরেছে।

—অ্যানাসিন আছে, দেবো?

—দাও।

চিনু এক গ্লাস জল আর বড়ি এনে দেয়। কেষ্ট অল্প সময়ের মধ্যেই সুস্থ বোধ করে।

একটু পরে চিনু এসে জিজ্ঞেস করে, এখন কেমন লাগছে কেষ্টদা?

—ভালোই। দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো।

চিনু যেন এই কথাটুকুরই অপেক্ষা করছিল। ঝুপ করে সে মাটিতে বসে পড়ে বলে, আপনি কি এত ভাবছেন?

—কে বললে ?

—আমি বুঝতে পারি !

কেষ্ট আস্তে আস্তে বলে, ঠিক ধরেছ, সত্যি খুব ভাবছি।

চিনু আবার জিজ্ঞেস করে, কি নিয়ে এত ভাবছেন ?

—শ্যামার আজ বিয়ে হয়ে গেল।

—আপনার ভাইঝির ?

কেষ্ট ধীরে ধীরে শ্যামার কথা সব বলে। বলতে ভালো লাগে, তাই বলে যায়। চিনু বলে নয়, গৌরী কি যে-কেউ থাকলে সে বলতো, কিছুতেই সে চেপে রাখতে পারতো না। শ্যামা শুধু কাকু কাকু বলে কাঁদতে কাঁদতে শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে।

শুনে চিনুর চোখ জলে ভরে ওঠে। কান্নাভেজা গলায় বলে, তাই আপনার মন খারাপ হয়ে গেছে, না কেষ্টদা ?

কেষ্ট কোন উত্তর দেয় না।

—মানুষ কি করে এত নিষ্ঠুর হয়। শ্যামার বিয়েতে আপনাকে একবার ডাকলে না পর্যন্ত ?

—পাছে আমি বাধা দিই। দোজবরে মাস্টার, সেই কোন্ অজ পাড়াগাঁয়ে—

—বাধা দিলে তো ভালোর জন্যেই দিতেন।

—কে বুঝবে বলো ? দাদা যে আমায়—কেষ্ট কথা শেষ করতে পারে না।

চিনুর সবটুকু সহানুভূতি কেষ্টর উপর গিয়ে পড়ে। উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আপনি একটু বরং ঘুমিয়ে নিন।

কেষ্ট কথামত শুয়ে পড়ে, চিনু দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে যায়।

বিনোদ আজকাল সুযোগ পেলেই গৌরীকে গাড়ীতে নিয়ে একা

বেরিয়ে যায়। সেদিন শনিবার তাড়াতাড়ি রিহার্সাল শেষ হয়ে গেল। পিনাকী এসেছিল প্রোগ্রামের ছবি তুলতে। চিনুকে নিয়ে তার আর এক জায়গায় যাবার কথা। চিনু ইতস্তত করতে গৌরী জোর দিয়েই বলে, তুই যা না, আমাকে তো বিনোদবাবুই পৌঁছে দেবেন।

চিনুরা চলে গেলে বিনোদ গৌরীকে নিয়ে গাড়ীতে উঠে বসে। বেহালা ছাড়িয়ে বিনোদের গাড়ী ডায়মণ্ড হারবারের পথে এগিয়ে যায়। বিনোদ জিজ্ঞেস করে, তোমার বেড়াতে ভালো লাগে, না গৌরী ?

—খু-উ-ব।

—কোথায় বেড়াতে যাও ?

—আগে কেষ্টদা নিয়ে যেত। বেহালায় আসার পর থেকে—

—আর যায় না, এই তো ? আমি তো আগেই বলেছি, ও লোকগুলো ঠিক ঐ রকম। তোমাকে ঘর থেকে বার করে আনার জন্যে সব কিছু করবে, পরে একটা কথাও মনে থাকে না।

গৌরী গম্ভীর গলায় বলে, এখন তাই মনে হচ্ছে।

—তোমার কেষ্টদা কি করেন ?

গৌরী ইতস্তত করে উত্তর দেয়, ঠিক জানি না। শুনেছি কি ব্যবসা করেন।

—কি জানি আমার মনে হয় না।

—কেন ?

—ভালো রোজগার থাকলে কেউ ঐ বাড়িতে ওঠে। বদনাম হয়ে যাবে না ?

এ কথার উত্তর গৌরী দেয় না। বিনোদ বলে যায়, পয়সা থাকলে ভালো জায়গায় তোমার থাকার ব্যবস্থা করে দিত। লোকটার লজ্জা বলে কোন পদার্থ নেই।

—ক'দিন বাদেই বিয়ে হবার কথা—

—সেজন্যে তো আরও দরকার। যার সঙ্গে দু'দিন বাদে বিয়ে হবে তাকে কি হাফ্‌গেরস্থ করে রাখা যায়?

—আমি এত ভাবিনি।

—আমি তোমার কথা ভাবি বলেই বলছি। বাঁ হাতটা গৌরীর কাঁধের ওপর রেখে বিনোদ বলে, সত্যি বলছি, তুমি ওকে জিজ্ঞেস করো, এরকম অপমান সহ্য করো না।

গৌরী কেঁদে ফেলে, কেষ্টদা ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই।

বিনোদ এই সুযোগই খুঁজছিল। গাড়ী বাঁ দিকে পার্ক করে গৌরীকে কাছে টেনে নেয়। কেন, আমি তো রয়েছি।

গৌরী তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

—গৌরী, তুমি কি আমায় ভালোবাসতে পারবে না? বিনোদ একটু থেমে আবার বলে, যেদিন তুমি প্রথম রিহার্সালে এলে সেদিন থেকেই তোমায় আমি ভালোবাসি। তুমি যাতে সুখী হও, যাতে বড় হও, সব ব্যবস্থা আমি করে দেবো।

গৌরী আজ নিজে থেকেই বিনোদের আহ্বানে সাড়া দেয়। কয়েকটি সুন্দর মুহূর্ত কেটে যায়। এত আনন্দ কোন দিনই সে পায়নি।

বেলারাণীর প্রযোজনায় ছবি উঠতে শুরু করেছে। মহরতের দিন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সুধীবৃন্দের সামনে ক্লাপস্টিক হাতে বেলারাণীর প্রথম সট্‌ নেওয়া হয়। প্রভাত চেষ্টা করে কয়েকজন খ্যাতনামা লেখককে ধরে এনেছিলো। বেলারাণী সারাক্ষণ ব্যস্ত, কে এলো, তা দেখার সময় কোথায়।

বিনোদ কিন্তু এক কোণে দু'টি মেয়ে নিয়ে বসেছিলো, চিনু আর গৌরী। এদের এতদিনের স্টুডিও দেখার শখ মিটলো। শ্যামলও বাদ যায়নি, এদের পেছু-পেছু ঠিক এসেছে। প্রভাতকে কাছে পেয়ে বলে, কি প্রভাতদা, আপনি তো নিয়ে এলেন না?

প্রভাত শ্যামলকে দেখে প্রথমটা অবাক হলেও চিনুদের দেখে বুঝেছিলো, নিশ্চয় বিনোদ নিয়ে এসেছে। বললে, এসেছো তো, তবে আর কি।

শ্যামল চোখ টিপে বলে, ছবির মত নয় কিন্তু—

—কে ?

—বেলারাণী।

আবার সেই অসভ্য কথা! বিরক্ত হয়ে প্রভাত সেখান থেকে সরে যায়। বেলারাণীর কাছে গিয়ে বলে, বেলা, এদিকের কাজ শেষ হ'তে আর কত দেরি ?

বেলারাণী জিগ্যেস করে, কেন, তাড়া আছে নাকি ?

—হঁ্যা, বাড়িতে—

—কি ব্যাপার ?

—পরে বলবো। তোমার গাড়ীটা আমায় ছেড়ে দেবে ?

বেলারাণীর সঙ্গে বিনোদের শুধু একবার কথা হয়েছিলো। বেলারাণী খোঁপা ঠিক করতে করতে জিগ্যেস করে, কি হলো, অনেক দিন আসনি যে ?

বিনোদ গম্ভীর স্বরে উত্তর দেয়, ব্যস্ত ছিলাম।

নতুন কথা! বেলারাণী ভ্রূ উঁচিয়ে তাকায়। প্রশ্ন করে—তোমাদের নাটক কবে ?

—পুজোর সময়।

বেলারাণী চিনুদের ইঙ্গিত করে বলে, ওরা কারা, নাটকের নায়িকা নাকি ?

বিনোদও বঁ্যাকা উত্তর দেয়, কেন আপত্তি আছে ?

—তা নয়, একটু ভালো দেখে যোগাড় করলেই পারতে।

—অ্যাক্‌টিং ভালো করে।

—তাই নাকি ? আমার ছবিতে নামাও না, তবে টাকা দেবো না।

বিনোদ হাসে, সে দেখা যাবে।

প্রভাত স্টুডিও থেকে যাবার সময় বেলারাণীর কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা চেয়ে নিয়ে গেল। বিশেষ দরকার, পরে ফেরত দেবে।

বেলারাণী অনুরোধ করে, আমার বাড়িতে এসো, কি হয়েছে শোনার জন্যে বসে থাকবো।

—সময় পেলেই আসবো।

প্রভাত বেলারাণীকে কথা দিয়ে এসেছিল বটে গিয়ে দেখা করবে, কিন্তু পারে নি। অরুণার কাছ থেকে রমেশবাবুর শরীর খারাপ শুনেই প্রভাত মনে মনে যে আশঙ্কা করেছিল, তা সত্যি সত্যিই ঘটেছে। শেয়ার মার্কেটে উনি অনেক টাকা লোকসান দিয়েছেন। ভাগ্যবিপর্যয় একেই বলে! যে সময় বাজার তেজী ভেবে লোহার শেয়ার কিনলেন সেই সময়ই দাম চার-পাঁচ টাকা পড়ে গেল। পঁচিশ-তিরিশ হাজার টাকা ঘর থেকে দিয়ে সে-যাত্রা বেঁচে গেলেন, কিন্তু এই টাকা উঠিয়ে আনতে গিয়েই মার খেলেন সবচেয়ে বেশি। বাজার মন্দা দেখে অনেক শেয়ার বেচলেন দাম পড়ে গেলে ধরে নেবেন মনে করে, কিন্তু পাকিস্তানে লীগ হারছে, খবর আসতেই শেয়ার বাজার গরম হয়ে উঠলো ; শেয়ার-পিছু ছ'-সাত টাকা লোকসান হয়ে গেল। এবার আর বাড়ি ঘর গয়না সব-কিছু বেচা ছাড়া উপায় রইল না। অরুণা যে সময় প্রভাতকে খবর দিয়েছিল তখন থেকেই দুঃসময়ের শুরু। রমেশবাবু ঘর বন্ধ করে চুপ করে বসে থাকতেন। হঠাৎ একদিন থ্রমবসিস অ্যাটাক হল, অরুণা গাড়ী পাঠিয়ে প্রভাতকে ডেকে আনলে। তারপর থেকে সব-কিছু ব্যবস্থাই প্রভাত করছে। ডাক্তারদের অনেক চেষ্টায় রমেশবাবু বেঁচে উঠলেন বটে, কিন্তু বাঁ দিকটা পক্ষাঘাতে পড়ে গেল।

প্রভাত এ সময় অমানুষিক খেটেছে। দিন নেই, রাত নেই রুগীর সেবা করেছে। অরুণার মা সব সময় বলেন, প্রভাত আমার দুঃসময়ে যা করেছে নিজের পেটের ছেলে ছাড়া আর কেউ এমন করতে পারে না।

রমেশবাবু কিন্তু জড়ানো গলায় বলেন, আমার মরে যাওয়াই ছিল ভালো, কেন বাঁচালে ?

অরুণা চোখের জল সামলাতে পারে না, এ কি বলছো বাবা !

—ঠিকই বলছি মা, আর বেঁচে কি হবে ? ভাল করে তোর বিয়েটাও দিতে পারলাম না।

রমেশবাবুর এই অসহায় কান্নাকে একমাত্র প্রভাতই সামলাতে পারে, ফের বাজে কথা ভেবে কাঁদছেন, এ করলে শরীর সারবে কি করে ?

—সারিয়ে কি হবে ?

—সে আবার কি কথা ! শরীর ভালো হলেই আবার শেয়ার খেলবেন।

রমেশবাবু আঁতকে ওঠেন, আবার শেয়ার বাজারে ! না না, ওখানে না।

প্রভাত উৎসাহ দেয়—কেন, সব জিনিসের ভাল-মন্দ আছে। তাইতে এত ভেঙে পড়লে কি চলে ? আপনার মত এত চমৎকার স্পেকুলেটিভ বুদ্ধি ক'জন বাঙালীর আছে ?

রমেশবাবু মুখে ম্লান হাসি ফুটে ওঠে, একথা তুমি ঠিক বলেছো, কত মাড়োয়ারী আমার প্রশংসা করে বলে, বাঙালীবাবু বহুৎ আচ্ছা বাজার কা চাল সমঝাতে হেঁ।

—তবে সে কি কম কথা !

—কিন্তু এখন যে সব গেল।

—তাতে কি হয়েছে আবার হবে।

কত রকম উৎসাহ দিয়ে, ডাক্তারদের কথামত শুশ্রূষা করে প্রভাত রমেশবাবুকে সারিয়ে তোলে। অরুণার মা মাঝে মাঝে বলেন, এই দুঃসময়, কেউ এলো না। সবাই লোক দেখানো—

অরুণা চোখ বড় বড় করে বলে, প্রভাতদা না থাকলে কি হত মা-মণি ?

—ওর ঋণ কি আর আমরা শোধ করতে পারবো ?

—প্রভাতদা আজ বলছিলেন, এ বাড়ি ছেড়ে আমাদের ওর বাসাতেই নিয়ে যাবেন।

অরুণার মা ক্লান্ত স্বরে বলেন, সে কি করে সম্ভব বুঝতে পারছি না। ওর ওখানে গিয়ে কি করে সবাই উঠবো! উনি কি রাজী হবেন ?

—প্রভাতদা বাবাকে রাজী করাবেন বলেছেন, এ মাসেই তো বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার কথা—

অরুণার মা হাউ-মাউ করে কেঁদে ওঠেন, কত সাধ করে এ বাড়ি করেছিলেন। এক কথায় ছেড়ে যেতে হচ্ছে! ওঁর মুখের দিকে আমার চাইতে কষ্ট হয়।

আশ্চর্য ক্ষমতা প্রতাতের! অরুণার বাবাকে বুঝিয়ে নিজের বাসায় নিয়ে গেল। ইতিমধ্যে প্রভাত বাসা বদলেছিল। নীচে তিনখানা, উপরে দু'খানা ঘরের ছোট্ট দোতালা বাড়ি। উপরের ঘর দুটিতে অরুণারা রইল, নীচে থাকে প্রভাত।

রমেশবাবু জিজ্ঞেস করেন, এ ভাবে কতদিন চলবে ?

প্রভাত হেসে বলে, যত দিন দরকার।

—তোমার এমন কি রোজগার ?

—চার জনের যথেষ্ট চলে যাবে।

—এর চেয়ে আমার ঐ বাড়িটাই বিক্রি করে দিলেই ভাল হ'ত।

—অত সাধ করে বাড়িটা করেছিলেন,—তাছাড়া মাসিক একটা আয়ও বাঁধা রইল—

রমেশবাবুর ব্যাঙ্কে যা টাকা ছিল তা সব বের করেও আরও কয়েক হাজার টাকার দরকার ছিল। প্রভাত রমেশবাবুর বাড়ি মর্টগেজ করে সব শোধ করে বাড়িটা ভাড়া দিয়েছে পাঁচশ' টাকায়। প্রভাত ভেবে রেখেছে, ঠিকমত খরচ বাঁচিয়ে চালালে বাড়ি মর্টগেজটাও ছাড়িয়ে নিতে পারব।

রমেশবাবু বলেন, তুমি বুদ্ধি ঠিকই করেছো, কিন্তু এত দিন তোমার কষ্ট হবে—

প্রভাত মুখ নীচু করে বলে, আমার কি-ই বা ছিল! আপনিই চাকরী করে দিলেন, তাইতো বেঁচে গেলাম।

ভালো খবরের মধ্যে রমেশবাবুর দুরবস্থার কথা শুনে প্রভাতের মালিক ওর মাইনে বাড়িয়ে দিলেন। মালিক মোহনলালজী নিজে এসে রমেশবাবুর সঙ্গে দেখাও করে গেছেন। প্রভাতের পিঠ চাপড়ে বললেন, বড় হুঁসিয়ার আদমী আছে, বড় হবে একদিন।

রমেশবাবুর চোখে জল আসে, এর মনটা যে কত বড়, তা আপনাকে কি করে বোঝাব!

মোহনলালজী চিরকাল কলকাতায় মানুষ। পরিষ্কার বাংলা বোঝেন। বললেন, খুব ভাল কথা, বাবুকে জামাই করে নিন।

একথা রমেশবাবুর অসুখ হবার আগে কখনও ভাবেননি! খুব ধুমধাম করে অরুণার বিয়ে দেবেন বলেই ঠিক করেছিলেন। কিন্তু এ অবস্থায় কি করে যে অরুণার বিয়ে দেবেন তাই ভেবে স্থির করে উঠতে পারছেন না। মোহনলালজীর কথার উত্তর দিতে গিয়ে তাঁর চোখ ছলছল করে ওঠে, আমার তো সবই গেছে, শুধু হাতে অরুণাকে—

প্রভাত বাধা দিয়ে বলে, ও সব কথা কেন ভাবছেন? অরুণার মত মেয়েকে যে পাবে সে-ই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবে।

মোহনলালজী উৎসাহ দিয়ে বলেন, সেই কথাই তো বলছি। আপনি শাদির সব ব্যবস্থা করে নিন। খরচা যা হবে আমি আপনাকে দেবো। আপনি আমার কত উপকার করেছেন।

রমেশবাবু সজল চোখে বলেন, ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

মোহনলালজীকে নিয়ে প্রভাত নীচে চলে গেলে অরুণার মা রমেশবাবুর ঘরে এসে ঢোকেন। রমেশবাবুর চোখ দিয়ে তখনও জল পড়ছে।

—কি হয়েছে গো, চোখে জল কেন?

—প্রভাতকে জামাই করবো ঠিক করলাম।

অরুণার মার মুখ হাসিতে ভরে যায়, এ তো খুব ভাল কথা। আমি রোজই বলবো বলবো ভাবি, বলে উঠতে পারি না! অরুণাতো প্রভাতদা বলতে অজ্ঞান! প্রভাতও অরুণার জন্যে যে কি করে তা না দেখলে বুঝতে পারবে না।

ইতিমধ্যে বেলারাণী দু'বার গাড়ী পাঠিয়েছিলো প্রভাতের কাছে। প্রভাত যেতে পারেনি। ড্রাইভার ফিরে গিয়ে জানিয়েছিল, বাড়িতে অসুখ আছে, বাবু আসতে পারলেন না।

বেলারাণী জানতো প্রভাত এখানে একা থাকে, অতএব তার বাড়িতে আর কার অসুখ করতে পারে, ভেবে পেল না। তবে কি ওর বাবা-মা এখানে ফিরে এসেছেন? যাই হোক সন্দেহভঞ্জনের জন্যই একরকম বেলারাণী নিজেই আজ প্রভাতের বাড়ি এসে হর্ন দিল। প্রভাত বাড়ি ছিল না, অরুণা এসে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে, আসুন, নামবেন না?

—প্রভাতবাবু বাড়ি নেই ?

—তাতে কি হয়েছে, আমি তো আছি।

অরুণার কথা শুনে বেলারাণীর মনে কেমন যেন খটকা লাগে, তবে কি তার সঙ্গে প্রভাতের বিয়ে হয়ে গেছে! বেলারাণীকে একবার জানালও না ? চট্ করে দেখে নেয় অরুণা মাথায় সিঁদুর দিয়েছে কি না। তা না দেখে খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে নেমে পড়ে।

নীচের বৈঠকখানায় তারা দু'জনে বসে। কি করে কথা শুরু হবে কেউ-ই ভেবে পায় না। এর আগে দু'জনের একবার মাত্র দেখা হয়েছিল সিনেমায়, তারপর এই দেখা। এর মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। তবু অরুণা সেই কথাই তোলে। প্রভাতদার সঙ্গে মেট্রোতে আপনাকে দেখেছিলাম, তখন থেকেই আলাপ করার ইচ্ছে ছিলো।

বেলারাণী হেসে বলে, তবু তো আলাপ করেন নি, আমি নিজে এসে আলাপ করলাম।

—কি করবো সময় পাইনি।

—ঐটাই পাওয়া শক্ত।

—বাবার বড় অসুখ যে—

—কি হয়েছে ?

অরুণা সংক্ষেপে সব কথা বলে। সত্যি, প্রভাতদা না থাকলে যে আমাদের কি হত ?

বেলারাণী মন দিয়ে শুনছিলো, চোখে জল এসে পড়ে, সত্যিই বড় ভালো লোক। তাছাড়া প্রভাত যে তোমায় প্রাণ দিয়ে ভালবাসে অরুণা!

বেলারাণীর মুখ থেকে একথা শুনতে অরুণার অদ্ভুত লাগে। বেলারাণী আবার বলে, তুমি বললাম বলে রাগ করো না, আমি তোমার চেয়ে অনেক বড়। তুমি খুব ভাগ্য করেছ। তা না হলে এমন স্বামী কেউ পায় না।

অরুণার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে।

—আমি প্রভাতবাবুর মুখে তোমার কথা প্রথম দিন শুনেই বুঝেছিলাম, তোমাদের দু'জনের জুড়ি মিলবে খুব চমৎকার! প্রভাতবাবুকে কত দিন বলেছি, উত্তর পাইনি। বল তো শুভদিনটা কবে?

—পুজোর পর, বোধ হয় অঘ্রান মাসে।

অরুণা বেলারাণীকে বসিয়ে খাওয়ালো, শুধু তাই নয়, জোর করে উপরের ঘরে নিয়ে গেল বাবা-মা'র সঙ্গে পরিচয় করবার জন্যে। বেলারাণী দশ মিনিটের জন্যে এসে অরুণার কাছে দু'ঘণ্টা আটকে গেল। কিন্তু এতটুকু তার খারাপ লাগে নি। মনে হয়েছে কত দিনের পরিচিত এরা! বিশেষ করে অরুণার ব্যবহারে সে মুগ্ধ হয়েছে সবচেয়ে বেশি। এতটুকু মেয়ের কি গিন্নীপনা! কত সহজে বেলারাণীর সঙ্গে 'দিদি' সম্বন্ধ পাতিয়ে নিলে। আব্দার করে বললে, এবার থেকে বোনের কাছে আসতে হবে কিন্তু, শুধু প্রভাতবাবু প্রভাতবাবু করলে চলবে না বেলাদি!

তার বলার ধরনে বেলারাণী হেসে ফেলে, নিশ্চয় আসবো। যা নেবুর আচার খাইয়েছো। প্রভাতবাবুকে একদিন যেতে বলো। ওঁর বই উঠতে আরম্ভ করেছে।

—আমিও একদিন স্টুডিও দেখতে যাবো।

—নিশ্চয় যাবে, আমায় খবর দিও, তুলে নিয়ে যাবো।

—কি মজা হবে, প্রভাতদা কিছুতেই নিয়ে যায় না।

—দেখো তোমার প্রভাতদা আবার আমায় না দোষ দেয়।

অরুণা মাথা দুলিয়ে বলে, না না আপনাকে কিছু বলবে না। এখন বলুন আবার কবে আসবেন?

—চেষ্টা করবো, দু'চার দিনের মধ্যেই।

—না বলুন, আসবেন শনিবার দিন?

বেলারাণী হেসে ফেলে, বেশ আসবো।

—আমি বসে থাকবো কিন্তু।

—আচ্ছা, আচ্ছা, বলে হাসতে হাসতে বেলারাণী গাড়ীতে গিয়ে বসে।

অনন্ত-কেবিনে আবার হৈ-হৈ হুল্লোড়। আশ্বিন মাস পড়ে গেছে। আর ক'দিন বাদেই পুজো ; তারই তোড়জোড় চলছে। এ বছর প্রথম পুজোর সঙ্গে একজিবিশানের আয়োজন হয়েছে। প্রায় পঞ্চাশ ঘর দোকান বসবে, সে ও তো কম কথা নয়। কেষ্ট বুদ্ধি না দিলে এ কাজে পুজো কমিটি হাতই দিত না। দু-এক ঘর দোকান বসবে বলে কাজ আরম্ভ হয়েছিল, এখন বেড়ে ক্রমে ক্রমে পঞ্চাশ ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে।

আশুদার দোকানে পাড়ার ছেলেদের আবার ভিড় জমছে, যেমন জমেছিল রাঘব বোয়ালের ইলেক্‌শানের সময়। ভোতন, ল্যাংচা, বিশু সবাই সকাল থেকে কাপের পর কাপ চা ওড়াচ্ছে আর নতুন নতুন প্ল্যান ঠিক করে সারাদিন কাটিয়ে দিচ্ছে।

ভোতন বললে, দেখলি, শালা রাঘব বোয়ালের কাণ্ডটা, মাত্র পাঁচ টাকা চাঁদা দিয়েছে।

বিশু বলে, আমি তো ভেবেছিলাম, একটা পয়সাও দেবে না—

—কেন, পাড়ার পুজো?

—সেই জন্যেই তো আরও দেবে না। শুনবি হয়তো বাগবাজারে, চোরবাগানে, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢেলেছে।

—যা যা, ও সব মক্কেলকে খুব জানি। প্যাঁচে না পড়লে শালারা টাকা বার করে না।

ইতিমধ্যে কেষ্ট এসে ঢোকে। ছেলেদের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলে, ব্যাপার কি রে? এত বেলা পর্যন্ত সব বসে গুলতানী করা হচ্ছে, মাঠে গিয়ে ত্মাখ কাজকর্ম হচ্ছে কি না—

ভোতন চট্ করে থামিয়ে দেয়, ও নিয়ে ভেবো না কেষ্টদা! সব ঠিক আছে, আমরা পালা করে পাহারা দিচ্ছি।

আশুদা বলেন, প্যাণ্ডেলে অনন্ত-কেবিনের যে ব্রাঞ্চ খুলব, দেখবে সেখানে কি জিনিস দিই।

ল্যাংচা জিজ্ঞেস করে, সে যাই দিন আশুদা, ভলেন্টিয়াররা ফ্রী খেতে পাবে তো?

—পাগোল নাকি, তাহলে তো আমাকেই খেয়ে ফেলবে।

—সে এমনিতেও খাবো ওম্‌নিতেও খাবো। আমরা ছাড়ব না—

আশুদা কপট ভয়ের ভান করে বলেন, কেষ্ট ব্যাপার শুনছ? এ হলে আমি দোকান খুলছি না ভায়া।

কেষ্ট হেসে উত্তর দেয়, আপনার কাছে আবদার করবে না তো কার কাছে করবে বলুন। যাই হোক আমি নিয়ম করে দেবো, দু'বেলা এক কাপ করে চা ফ্রী পেলেই হবে।

—ওতে আমার আপত্তি নেই। চা ফ্রী পাবে, কিন্তু 'টা'টা পয়সা দিয়ে কিনতে হবে।

শুধু যে এ ভাবে হাসি-ঠাট্টা চলে তাই নয়, কি ভাবে কাজ হবে কোন্ ঘরে কিসের দোকান বসবে সব কিছুর আলোচনাই এইখানে। এককথায় বলতে গেলে অনন্ত-কেবিন পূজা কমিটির সদস্যদের অফিস! কেষ্ট এখানে ক'দিন থেকে দশটা-পাঁচটা কাজ করছে, বলতে গেলে তার ওপর সমস্ত ভার। ডেকরেটার, ইলেকট্রিশিয়ান, প্রতিমা গড়ার শিল্পী, অতগুলো দোকানদার, সকলের সঙ্গে মাথা ঠিক করে কাজ করা সহজ কথা নয়। ফ্যাকড়া তো লেগেই আছে, এটা হয় তো ওটা হয় না, সব দিক মানিয়ে নিয়ে কাজ করতে একমাত্র কেষ্টই পারে।

এই ভাবে চললো প্রায় দিন পনেরো। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি। আশুদা, শ্যামল, কেষ্ট আর তার সাঙ্গোপাঙ্গ

সককের অক্লান্ত পরিশ্রম। অবশ্য ফল খুব ভাল হ'ল। ষষ্ঠীর আগের দিন সব কাজ শেষ। ষষ্ঠীর দিন পুজোর মণ্ডপ আর প্রদর্শনী আলোয় ঝলমল করে উঠল। সকলের মুখেই এক কথা, এ রকম পুজো এ পাড়ায় কখনও হয়নি। কেষ্টর জয়-জয়কার।

পুজোর ক'দিন ভীষণ ভীড়, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত লোকের শেষ নেই। বরং দুপুরের দিকে কম, কিন্তু সন্ধ্যের পর আলো জললে কাতারে কাতারে লোক আসে। প্রতিমা দেখতে নয়, প্রদর্শনী দেখতে। প্রতিমা খুব ভালো হয়নি। আগের বছরের মতও নয়। কারণ, কেষ্টরা সব চেয়ে কম টাকা খরচা করেছে প্রতিমা গড়ানর জন্যে। কেষ্ট বলে ও তো পয়সা নষ্ট। পুজোর সামগ্রীও যত কম খরচ হয় ভাল—

আশুদা মৃদু আপত্তি করেছিলেন, তা বলে প্রতিমা গড়ার খরচা কমিয়ে দেবে, পুজো তো মায়েরই ?

—কেউ প্রতিমা দেখে না আজকাল। এতো বছর তো খুব ভাল ভাল প্রতিমা করেছেন, লোক এসেছে দেখতে ? এইবার দেখবেন ভিড়। ডেকরেশানে কত খরচ করেছি দেখেছেন ? ফার্স্ট ক্লাশ সাজানো হবে। আলোর চর্কী ঘুরবে, মাইকে গান দিচ্ছি, ভীষণ জমবে।

কেষ্টর কথা মিথ্যে হয়নি। ঝলমলে আলো, রেকর্ডের গান আর দোকানের মেলা টেনে এনেছে অসংখ্য লোক, সব পাড়া থেকে। ভোতনরা ভলেন্টিয়ারের ব্যাজ লাগিয়ে ব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রদর্শনী দেখার পথ দড়ি দিয়ে দু'ভাগ করা। ছেলেদের আর মেয়েদের আলাদা ব্যবস্থা। কোন্ কোন্ ভলেন্টিয়ার মেয়েদের দিকে ডিউটি পাবে, তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রায় মারামারি হবার যোগাড়। শেষ পর্যন্ত কেষ্টকে এসে ডিউটির ব্যবস্থা করে দিতে হয়।

আশুদার দোকানে চা-সরবৎ খুব বিক্রি হয়। বলতে গেলে আসল দোকানে এখন উনি বিশেষ কোন ব্যবস্থাই রাখেন নি। সবাইকে নিয়ে

প্যাণ্ডেলে চলে এসেছেন। কেষ্ট রোজ জিজ্ঞেস করে, কেমন বিক্রি হল আশুদা ?

—মন্দ নয়। হৈ-হৈও হচ্ছে, কাজও হচ্ছে। প্রত্যেক বছর একজিবিশান করো হে, আর অনন্ত-কেবিনের জন্যে একটা স্টল বাঁধো।

—আমার দোকানও খারাপ চলছে না।

—হ্যাঁ, শ্যামল তাই বলছিলো—

—ছেলেটা খুব কাজের আছে।

কেষ্টর দোকান প্রদর্শনীর এক কোণে। কিন্তু জায়গাটা ভাল। সকলকেই একবার এদিকে আসতে হয়। জিনিস-পত্র বেশি না থাকলেও বিক্রি ভালই হচ্ছে। ফাউণ্টেনপেনের কালী, মুখে মাখা পাউডার, কতকগুলো সস্তার বই, লজেন্স, চকোলেট, কাপড়কাচা সাবান, এই হ'ল বিক্রির সামগ্রী। যা সব চেয়ে বেশি চলে তা হোল লজেন্স আর বিস্কুট।

শ্যামল চৌকস ছেলে, জিনিস বিক্রি করার ক্ষমতা ওর আছে। পাউডার খুলে মেয়েদের হাতে লাগিয়ে দেয়, বয়স অনুযায়ী মা কিংবা দিদি বলে সম্বোধন করে, এই যে মেখে দেখুন না একবার। জিনিস ভাল না হলে দাম ফেরত দেব।

এক বৃদ্ধা নেড়ে-চেড়ে বলেন, কত দাম বাবা ?

—মাত্র এক টাকা, বিলিতি মাল।

—বিলিতি জিনিস এক টাকায় হয় ?

—লাভ করে তো বিক্রি করছি না মা, পুজোর মণ্ডপে কি কেউ ব্যবসা করতে আসে। কৌটার পেছনে লেখা আছে, দেখুন—শ্যামল নিজেই কৌটো উল্টে দেখিয়ে দেয় লেখা আছে, মেড ইন্ দি গ্রেট বৃটেন কোং। বলে, বললাম বিলিতি জিনিস।

—তাহলে দাও বাবা, এক কৌটো নিয়ে যাই।

বুড়া পাউডার নিয়ে চলে যায়। লক্ষ্মণ জিজ্ঞেস করে, সত্যি বিলিতি মাল নাকি শ্যামল ?

লক্ষ্মণের সঙ্গে শ্যামলের ভাব কালীর আড্ডায়। এ পাড়ায় বাড়ি, তাই সময় পেলেই দোকানে এসে বসে। শ্যামলও খুশি হত দোকানে একজন সঙ্গী পেয়ে।

—দূর গাধা, লেখা আছে দি গ্রেট বৃটেন কোম্পানী। লোকে ভাবে বিলিতি মাল।

—যাদের মাল তাদের কত দিবি ?

—কৌটো পিছু আট আনা।

—বলিস কি রে, এত লাভ ?

শ্যামল হাসে। উত্তর না দিয়ে চেঁচাতে শুরু করে, এই যে ফাউণ্টেন পেনের দিশি কালি, মুখে মাখার বিলিতি পাউডার, ছবিব বই, বাচ্চাদের লজেন্স—

এক খদ্দরপরা ভদ্রলোক আসেন, দেখলেই মনে হয় সেই ধরনের লোক যাঁরা ভুলেও বিলিতি জিনিস ব্যবহার করেন না। জিজ্ঞেস করলেন, ফাউণ্টেনপেনের কি কালি ভাই ?

শ্যামল কালির শিশি এগিযে দেয, এই যে দাদা, এক শিশি মসী—

—মসী, ভাল নাম দিযেছে। দেখতেও বেশ—

—শুধু দেখতে নয, কালিও খুব ভাল। যে কোন বিলিতি কালির সমান। এই দেখুন—বলে শ্যামল পকেট থেকে ফাউণ্টেনপেন বার করে দেয, আমি তো দু'বছর থেকে শুধু এই কালি ব্যবহার করছি।

ভদ্রলোক কাগজে দু'-একবার নাম সই করলেন, ভালই মনে হচ্ছে, কত দাম ?

—আট আনা।

ভদ্রলোক পয়সা দিয়ে চলে গেলেন। শ্যামল আট আনাটা বাজিয়ে

নিয়ে বলে, চার আনা লাভ। শালা কলমে ভরলেই নিবের বারোটা বেজে যাবে।

—কেন, তোর কলম তো বেশ চলছে।

শ্যামল হাসে, তুইও যেমন, ওতে তো বিলিতি কালি ভরা আছে।

মদনের সঙ্গে একদিন এখানেই দেখা। বাড়ির মেয়েদের নিয়ে প্রতিমা দেখতে এসেছে। শ্যামল পিঠ চাপড়ে জিজ্ঞেস করে, আমাদের পোস্টঅফিস কেমন চলছে রে, মন্টুদার চিঠি পেতে অসুবিধা হয় না তো?

মদন উত্তর দেয়, মন্টুদা খুব খুশি। দিনে দুটো করে চিঠি ছাড়ে।

—সত্যি নাকি। দোকানদারটা তো মাইরি লাল হয়ে গেল।

—তা আর বলতে, মাসে প্রায় তিরিশ টাকা।

—শেষ পর্যন্ত হবে কি বলতো?

—হয় বিয়ে, না হয় আত্মহত্যা। নন্দিতা না করলেও মন্টুদা তো নির্ঘাত। একটু থেমে মদন জিজ্ঞেস করে, এ দোকানটা কার?

—কেষ্টদার, তবে আমারও বলতে পারিস।

—আসব আর একদিন।

মদন বাড়ির লোকদের সঙ্গে চলে যায়।

সেদিন অষ্টমী পুজো। শ্যামল সকালে এসেই, ধুপ ধুনো জেলে দোকানঘর সুবাসিত করে রেখেছে। ভিড় আজ অসম্ভব রকম বেশি। সব সময় দোকানে চার-পাঁচজন খদ্দের। এক ভদ্রলোককে মসী কালির গুণাগুণ ব্যাখ্যা করছিল এমন সময় মেয়েদের দিক থেকে একজন মিহি গলায় জিজ্ঞেস করে—এ বইটার দাম কত?

শ্যামল বইটার দিকে তাকিয়েই জবাব দেয়, শারদীয়া সংখ্যা, অনেক ছবি আছে। দাম মাত্র দু'টাকা—আর এ বইটা।

যে ভদ্রলোক কালি কিনছিলেন তাঁকে অপেক্ষা করতে বলে

শ্যামল মেয়েটির দিকে এগিয়ে যায়। ভাল করে তাকিয়ে দেখে সে নন্দিতা। শ্যামল হেসে জিজ্ঞেস করে, একলা নাকি ?

—না মা'রা এসেছেন। ঐ দোকানে আচার কিনছেন।

—যত ভিড় ঐ দোকানে, এ দিকে কেউ আসেই না।

কথার ধরনে নন্দিতা হেসে ফেলে, দোকানে তো কিছুই নেই, কি কিনতে আসবে শুনি ?

—বাঃ, এই তো কত জিনিস রয়েছে।

নন্দিতা একটা বই তুলে নিয়ে বলে, এইটে নিচ্ছি। ব্যাগ থেকে পাঁচ টাকার নোট বার করে দেয়। বাকী পয়সা ফেরত দেবার সময় শ্যামল নীচু গলায় জিজ্ঞেস করে, চিঠি ঠিকমত পাচ্ছেন ?

—পাই। বলেই নন্দিতা ব্যস্তভাবে সামনের দিকে তাকায়, ঐ যে মা'রা আসছেন আমি যাই।

শ্যামল অন্য দিকে ফিরে গিয়ে দেখে, ভদ্রলোক চলে গেছেন। সে নিয়ে ওর দুঃখ হয় না। ভাবে, কতক্ষণ রসিয়ে রসিয়ে মদনের কাছে নন্দিতার কথা বলবে।

সন্ধ্যার পর অরুণাকে নিয়ে প্রভাত এলো একজিবিশান দেখ্‌তে। সে জানত কেষ্ট, আশুদা দোকান খুলেছে, একবার না গেলে দুঃখ করবে।

সত্যিই প্রভাতদের দেখে কেষ্টর আর আশুদার আনন্দের সীমা থাকে না। আশুদা বার বার বলেন, প্রভাত তোমার ভাগ্যি ভালো, এমন লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে পেয়েছ। সুখী হও মা, খুব সুখী হও। আমার দোকানে কি খাবে বল ?

অরুণা বাধা দিয়ে বলে, এখন আর কেন কষ্ট করবেন ?

—তা হবে না। আশুদার দোকানে প্রথম দিন এসেছো কিছু খেতেই হবে।

আশুদা ছাড়লেন না, যত্ন করে বসিয়ে খাওয়ালেন। প্রভাত এক সময় কেষ্টকে জিজ্ঞেস করে, থিয়েটার দেখতে যাচ্ছিস কাল?

—কি করে যাবো একজিবিশান ছেড়ে?

—একবার যাস, গৌরী ভালো পার্ট করছে।

—দেখি যদি সময় পাই।

—গৌরী-চিনু আজ এখানে আসবে বলেছিলো।

—এখনও আসেনি, হয়তো রিহার্সালে গেছে, রাত করে আসবে।

আশুদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রভাতরা কেষ্টর সঙ্গে প্রদর্শনীর মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। অরুণাকে অবশ্য মেয়েদের পথ ধরেই চলতে হয়।

প্রভাত জিজ্ঞেস করে, তোদের বিয়ের কি হল?

—এসব ঝামেলা চুকলে পর দেখা যাবে।

—বেশি দিন ফেলে রাখিস না।

—না ভাবছি, দু'এক মাসের মধ্যেই।

প্রভাত হেসে বলে, আয় সামনের অঘ্রান মাসে দু'জনে ঝুলে পড়ি।

—দেখি, কেষ্ট ছোট্ট উত্তর দেয়।

গৌরী, চিনু আর বিনোদ সেই সন্ধ্যাতেই দোকান দেখতে এলো বটে, তবে বেশ রাত করে।

শ্যামল গৌরীদের দেখে খুশি হয়, তবু অনুযোগ করে বলে, বাবা, কত রাত করলেন?

গৌরী হাসে, কি করবো, রিহার্সাল শেষ করে আসবো তো?

—কাল কি রকম হবে?

—মনে তো হচ্ছে, ভালোই।

—আমার বোধ হয় দেখা হবে না, দোকানে একজনকে থাকতে হবে তো?

বিনোদ ঠাট্টা করে বলে, এই তো দোকানের মাল, ও ফেলে রেখে গেলেও কেউ নেবে না। যাকগে তোমার কেষ্টদা কোথায়?

—প্রভাতদার সঙ্গে বেরিয়েছেন, এখুনি আসবেন।

—বলো, আমরা এসেছিলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা এদিক-ওদিক ঘুরে কেষ্ট না আসায় ওরা গাড়ীতে ফিরে যায়।

পরদিন সকালে উঠে স্নান সেরে গৌরী তৈরি হয়ে রইল বিনোদের সঙ্গে বেরুবে বলে। রান্নাবাড়ার হাঙ্গামা নেই। পুজোর ক'দিন কেষ্ট বা শ্যামল বাড়ি ফেরে না খেতে। রাত্রেও দেরি হয়ে গেলে শ্যামল কেষ্টর বাড়িতে গিয়ে শোয়, এত দূরে বেহালায় আর আসে না। কথাই ছিল আজ সকালে বিনোদ গৌরীদের নিয়ে যাবে ষ্টেজ সাজাতে। কিন্তু চিনু যে সকালে যেতে পারবে না, গৌরী আগে থেকেই জানত। কারণ পিনাকীর জন্যে রান্না করে রাখতে হবে তাকে।

বিনোদের গাড়ী আসতেই দরজা বন্ধ করে গৌরী গিয়ে গাড়ীতে উঠে বসে। বিনোদ একমুখ হেসে অভ্যর্থনা করে, বাঃ একেবারে তৈরি যে!

—আমি কি কোন দিন দেরি করি?

—চিনু কোথায়?

—ঘরে পিনাকী আছে তাই আর ডাকিনি। এখন কোথায় যাবে?

—বাড়িতে।

গাড়ী চলতে চলতে গৌরী জিজ্ঞেস করে, চিনু যদি আসত তাহলে কি করতে?

—তা হলে স্টেজে যেতে হত, সারা সকালটা নষ্ট।

—পার্ক সার্কাসের বাড়িতে পৌঁছে বিনোদ গৌরীকে নিয়ে বারান্দায় বসে।

—গৌরী, তুমি এই থিয়েটারে পার্ট করতে না এলে তো আলাপ হত না।

—সত্যি।

—কি আশ্চর্য বলতো। কোথায় ছিলে তুমি আর কোথায় ছিলাম আমি। কার সঙ্গে যে কি ভাবে আলাপ হয়, তা আগে থেকে কে বলতে পারে ?

গৌরী ঠিক এই কথাই নিজের মনে অনেক বার ভেবেছে। মনে মনে চিনুকে ধন্যবাদও দিয়েছে এই রিহার্সালে নিযে আসার জন্যে।

বিনোদ আবেগভরা গলায় বলে, আমার তৃপ্তি কিসে জানো ? শুধু এই ভেবে যে, তুমি আমায় বুঝতে পেরেছো।

—তোমাকে না বোঝার কি আছে ?

বিনোদ ম্লান হেসে বলে, এতদিন তো কেউ বুঝলো না—যাকৃগে সে-কথা, তোমার কেষ্টদার সঙ্গে এর মধ্যে আর কোন কথা হয়েছিল ?

—কি নিয়ে ?

—এই থিয়েটার, কি আমাদের বিষযে ?

—না, পুজোর ক'দিন দেখাই হচ্ছে না। সারা দিনই প্যাণ্ডেলে থাকেন।

—চিনু ?

—ওর সঙ্গে কথা বলতে আর ভাল লাগে না, বড় ব্যাঁকা ব্যাঁকা কথা বলে।

বিনোদ প্রাণ খুলে গৌরীর সঙ্গে গল্প করে। ফেলে-আসা দিনের কত কথা, কত কাহিনী। এক সময় হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়ে বলে, স্টেজটা ঘুরে আসি চল, সত্যি আজকের হাঙ্গামা চুকলে বাঁচি।

—তোমার ওপর বড় চাপ পড়ে, না ?

—থিয়েটার করার শখ আমার ছোটবেলা থেকেই। তবে এ

বছর এক নাগাড়ে অনেক দিন কলকাতায় আছি। আর ভালো লাগছে না, বাইরে কোথাও গেলে হত।

—কোথায়?

—কার্সিয়াঙে আর পুরীতে আমার বাড়ি আছে। প্রত্যেক বছর অন্তত একবার যাই, এবার বেরুতে পারি নি।

গৌরী বিনোদের দিকে তাকিয়ে বলে, নতুন নতুন জায়গায় গেলে বেশ মজা লাগে, না? বাংলার বাইরে আমি কোথাও যাইনি।

—আমার সঙ্গে যাবে, যেখানে তোমার খুশি।

—কি জানি, আমার ভাগ্যে আছে কি না।

বৈঠকখানায় গৌরী ব্যাগ রেখে এসেছিল, নেবার জন্যে দুজনেই ঘরে ঢোকে। বিনোদ গৌরীর কাঁধের ওপর হাত রেখে গাঢ় স্বরে বলে, আমাকে বাঁচতে দিও গৌরী!

—একথা কেন বলছ?

—তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারবো না সত্যি বলছি, আমার কথা একটু ভেবো।

গৌরী বিনোদের চোখে চোখ রেখে নরম গলায় বলে, সব সময়ই তো ভাবি।

—সত্যি বলছো, বলেই বিনোদ গৌরীকে জড়িয়ে ধরে চোখে-মুখে চুমু খায়।

গৌরী আজ সম্পূর্ণ ভাবে বিনোদের কাছে ধরা দিয়েছে। বিনোদ গৌরীর কানে ফিস-ফিস করে বলে, তোমাকে আমার সব দেবো গৌরী, যদি আমার কাছে আস। এই বাড়িতে তুমি থাকবে, চাকর, ঝি, বামুন সব থাকবে। তার ওপর আমাকে তো পাবেই।

গৌরী চাপা গলায় বলে, অত বোল না লক্ষ্মীটি, এত কিন্তু আমি চাই না—

বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিনোদ আর গৌরী স্টেজে অল্প সময়ের জন্য দাঁড়িয়ে, খেতে গেল রেস্তোরাঁয়। যত না খাওয়া হল, কথা হল তার চেয়ে অনেক বেশি। বিনোদের গলা গম্ভীর, থমথমে স্বর, আজ তো থিয়েটার শেষ, তার পর ?

গৌরীর দীর্ঘশ্বাস পড়ে, আমিও তাই ভাবছি।

—তাহলে কি করবে বল ?

—বল।

—সিনেমায় অভিনয় করবে বলে চলে এস।

—কোথায় ?

—আমার সঙ্গে প্রভাতের যে ছবি উঠছে তা বেশির ভাগ আমার টাকায়। আমি বললে ওরা তোমায় নিতে বাধ্য।

—কেষ্টদা কি মত দেবেন ?

—টাকা পাবে শুনলেই দেবে।

—বোধ হয় তাই।

বিনোদ গৌরীর হাতের ওপর হাত রেখে বলে, কথা দাও গৌরী তুমি আসবে ?

গৌরী মন্ত্রমুগ্ধের মত সম্মতি জানায়, আসব।

সন্ধ্যাবেলা থিয়েটার দেখতে এলো অনেকে। বিনা পয়সায় নাটক দেখার ভিড় এদেশে সব সময়েই পাওয়া যায়। সামনের সারিতে প্রভাত আর অরুণা বসেছিল। বেলারাণী এসে বললে, প্রভাতবাবু উঠুন, আমি অরুণার পাশে বসবো। কথামত প্রভাত উঠে যায়। অরুণা কিন্তু গম্ভীর হয়ে বলে, আপনার সঙ্গে আড়ি হয়ে গেছে বেলাদি।

—কেন, কি হল ?

—বাঃ, শনিবার এলেন না যে !

—তাতে কি হয়েছে, এই শনিবার যাবো, বিজয়ার পরে গিয়ে মা-বাবাকে প্রণাম করে আসব।

অরুণার নাটক দেখতে মন্দ লাগে না, গল্পটা বেশ হাসির। বেলারাণী কিন্তু পাশে বসে সারাক্ষণ খুঁত ধরে গেল, কারুরই নাকি অভিনয় মনের মত হচ্ছে না, দৃশ্যসজ্জা, রূপসজ্জা সবের মধ্যেই গলদ আছে। নাটক শেষ হতে দশটা বাজে। কিছু লোক আগেই উঠে গিয়েছিলো, যারা শেষ পর্যন্ত ছিল হাততালি দিয়ে বাহবা দিলে।

সিট থেকে উঠে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রভাত অরুণা আর বেলারাণী গল্প করছিল। বেলারাণী জিজ্ঞেস করলে, ঐ মেয়েটি কে, যে বন্দনার পার্ট করলে?

প্রভাত উত্তর দেয়, গৌরী।

—নতুন বোধ হয়, আগে তো দেখিনি। গলাটা মন্দ না।

—চিনুর বন্ধু।

—চিনুকে অনেক থিয়েটারে দেখেছি, বড্ড খারাপ পার্ট করে।

বিনোদ গ্রীনরুম' থেকে ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে আসে। জিজ্ঞেস করে, কি রকম লাগলো?

বেলারাণী হেসে বলে, বেশ ভালই তো। তুমি খুব স্বাভাবিক করেছো।

বিনোদের পার্ট-ই বোধ হয় সব চেয়ে খারাপ হয়েছিল, বেলারাণী তারই প্রশংসা করলে। প্রভাত হাসে, উনি তো গৌরীর গলার প্রশংসা করছিলেন।

বিনোদ খুশি হয়ে বলে, তাই নাকি। ওকে নাও না তোমার প্রোডাকসানে।

—কাল বাড়িতে এসো, কথা হবে।

সবাই চলে গেলে বিনোদ গ্রীনরুমে ফিরে এলো। পিনাকী আর

চিনু ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিল, চিনু জিজ্ঞেস করলে, গৌরীকে কি আমরা নিয়ে যাবো ?

—আপনারা আর কষ্ট করবেন কেন, আমি ছেড়ে দিয়ে আসব।

গৌরীকে নিয়ে একলা বেরুবার সুযোগ পাবে বিনোদ আশা করেনি, তাই চিনুরা চলে যেতে ছুটে এল গৌরীর কাছে। গৌরী সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে বসেছিল। বিনোদ বললে, চল গৌরী, চিনুরা চলে গেছে।

—চল।

যাকে যা বলবার বলে দিয়ে বিনোদ গৌরীকে নিয়ে গাড়ীতে বসে প্রথম কথাই বললে, তোমার পার্ট আজ খুব সুন্দর হয়েছে গৌরী !

—সত্যি ?

—বাইরের সবাই তাই বলছে, এমন কি বেলারাণীও।

গৌরী আশ্চর্য হয়ে বলে, বেলারাণী ?

—হ্যাঁ, ও তো কাল আমায় যেতে বলেছে। তোমায় ছবিতে পার্ট দেওয়া নিয়ে কথা হবে।

গৌরী কেমন যেন বিহ্বল হয়ে যায়, তুমি আমার জন্যে কত করছ !

—কিছুই না। তোমার মধ্যে যে গুণ আছে তাই ফুটিয়ে দিচ্ছি।

—কেষ্টদারা আসেনি ?

—না বোধ হয়। তাহলে প্রভাত বলতো, ও তোমাকে বড় হতে দিতে চায় না, একটা ঘরে বন্ধ করে রাখতে চায়।

—আজ-কাল সত্যিই তাই মনে হচ্ছে।

—মনে হয় নয়, নিশ্চয়। পুজোর প্যাণ্ডেলে বসে রইল তবু তোমার থিয়েটার দেখতে আসতে চাইল না। এই তার ভালোবাসা !

গৌরী হঠাৎ বলে, কেষ্টদা আমায় ভালোবাসে না, ভালোবাসা কি, ও তা বোঝেই না—

বিনোদ অন্ধকারে গাড়ী রেখে গৌরীর কাছে সরে এসে তাকে দু'-হাতে জড়িয়ে ধরে, তুমি ভুল বুঝতে পেরেছো দেখে খুশি হলাম।

—তুমিই তো আমায় বুঝিয়ে দিয়েছো।

—আমি যে তোমায় ভালোবাসি।

—জানি।

বিনোদ যখন গৌরীকে বেহালার বাড়ির সামনে নামিয়ে দিলে তখন বারোটা বেজে গেছে। বিনোদ নীচু গলায় বলে, কাল আমি বিকেলের দিকে আসব।

—চারটের সময়।

—চারটে-সাড়ে চারটে, সকালে যাবো বেলারাণীর কাছে।

বিনোদ চলে গেলে গৌরী দরজার চাবি খুলে ঘরের মধ্যে ঢোকে। শ্যামল আজও আসেনি। মনে মনে গৌরী খুশিই হয়, একলা শুয়ে শুয়ে অনেক কথা ভাবতে পারবে। বিনোদ তার সামনে একটা নতুন পথ খুলে দিয়েছে, একদিন সেও হয়ত বড় হতে পারবে, বেলারাণীর মত নাম করতে পারবে। সবাই তখন তার পেছনে ছুটবে। থিয়েটারে নামার আগে এ সম্ভাবনা তার মাথায় আসেনি, আজ অভিনয় করার সময় তার ভীষণ পা কেঁপেছে, তবু তো সবাই ভালো বলেছে। চেষ্টা করলে ঠিক হয়ে যাবে।

বিনোদ কি তাকে ভালবাসে? এ প্রশ্ন যে তার মনে আসে না তা নয়, কিন্তু গৌরী ভাবে, কেষ্টও তো তাকে ভালবাসে না। এতে কিছু আসে-যায় না। কেষ্টর সঙ্গে যদি এভাবে থাকতে পারে বিনোদের সঙ্গেই বা থাকতে পারবে না কেন? বিনোদের কাছে সে আরও অনেক সুখে থাকবে! এ ক'দিনেই টাকার মহিমা সে বুঝে নিয়েছে! পার্ক সার্কাসের ঐ সুন্দর বাড়ি, গাড়ী, চাকর, এ যেন স্বপ্ন বলে মনে হয়।

এই ধরনের অনেক কথা ভাবতে ভাবতে গৌরী কখন ঘুমিয়ে

পড়েছে। সকালবেলা চিনুর দরজা ঠেলায় ঘুম ভাঙলো। তাড়াতাড়ি উঠে গৌরী দরজা খুলে দেয়। চিনু ঘরে ঢুকে শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করে, কি হল, এত বেলা পর্যন্ত ঘুমুচ্ছিস যে?

—এমনি।

—কাল তোর পার্ট ভালই হয়েছে।

—কে বললে?

—ও বলছিলো। একটু থেকে আবার বলে, কেষ্টদাও—

—কেষ্টদা! গৌরী বিস্মিত হয়, কেষ্টদা তো থিয়েটার দেখতে যায়নি?

—গিয়েছিলেন। পেছনের দিকে বসেছিলেন, শেষ হতেই চলে গেছেন।

—আশ্চর্য!

চিনু চুলের বিনুনি খুলতে খুলতে বলে, আশ্চর্য হবার কি আছে? কেষ্টদা যে যাবে আমি জানতাম।

—তোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

—হ্যাঁ। অনেকক্ষণ তোর জন্যে অপেক্ষা করেছিলেন, দেরি হচ্ছে দেখে চলে গেলেন।

গৌরী মনে মনে বিরক্ত হয়, থিয়েটারের পর আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন না কেন?

—উনি বললেন, সব বড় বড় লোকের ভিড়। ওখানে গিয়ে দেখা করতে লজ্জা করে।

—যত সব ন্যাকামী। গৌরী কলতলায় মুখ ধুতে চলে যায়।

চিনু ঘর থেকে চেঁচিয়ে গৌরীকে জিজ্ঞেস করে, তোর কি হয়েছে বল তো? কেষ্টদার উপর কথায় কথায় বিরক্ত হোস?

গৌরী কোন উত্তর দেয় না। চিনু নিজে থেকেই বলে, গৌরী, তোকে বলছি, একটু সামলে চলিস।

গামছায় মুখ মুছতে মুছতে গৌরী জিজ্ঞেস করে, হঠাৎ এত উপদেশ দিচ্ছিস যে ?

—মনে হল বললাম।

—তুই দেখছি কেষ্টদার যোগ্য ছাত্রী হযেছিস! কথায় কথায় বড় বড় উপদেশ।

চিনু আঙ্গুল দিয়ে চুলের জট ছাড়াতে ছাড়াতে বলে, সে যাই বলিস, আজকাল অনেক বদলে গেছিস তুই।

—কি জানি!

—আজকাল কত সাজিয়ে কথা বলিস, আগের মত আর প্রাণখোলা ভাব তোর নেই।

গৌরী হেসে উত্তর দেয, সে বোধ হয় তোদের সঙ্গে মিশে!

—তা হতে পারে, কিন্তু ভালো নয়। আর একটা কথা—

—কি ?

—বিনোদবাবুর সঙ্গে অত মেলামেশা কি উচিত ?

গৌরীর মনের কাঁচা জায়গায় চিনু খোঁচা দিযেছে। মুখ কালো করে বলে, কেন, কি হয়েছে ?

—কাল কোন সকালে তোরা স্টেজে যাবি বলে বেরুলি অথচ সেখানে তো মাত্র পনের মিনিট ছিলি।

গৌরীর বুঝতে বাকী থাকে না, চিনু ভেতরে ভেতরে সব খবরই রাখে। তাই এ প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, চিনু, তুই আমাকে মিথ্যে সন্দেহ করছিস। অন্য সময় এ নিয়ে কথা বলব। এখন আমার কাজ আছে।

চিনু বোঝে, গৌরী আর কথা বাড়াতে চায় না, ধীরে ধীরে নিজের ঘরে চলে যায়।

বিপদ হল পাঁচটার সময় বিনোদের গাড়ী আসতে। গৌরী ঘর

থেকে বেরিয়েই দেখে, চিনু সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জিজ্ঞেস করলে, কোথায় যাচ্ছিস ?

গৌরী দৃঢ়স্বরে বলে, ভাসান দেখতে।

—বিনোদবাবুর সঙ্গে ?

—কোন দোষ আছে ?

চিনু নীচের ঠোঁট কামড়ে জিজ্ঞেস করে, কেষ্টদা যদি আসে, কি বলবো ?

—তোর যা ইচ্ছে। বলে গৌরী লঘু পায়ে নেমে গিয়ে বিনোদের গাড়ীতে উঠে বসে।

চিনু চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের চলে যেতে দেখে। গৌরী কি করে এতখানি বদলে গেল, সত্যিই সে ভেবে পায় না। মানুষের কি এত তাড়াতাড়ি পরিবর্তন সম্ভব ? যে গৌরী ক'দিন আগেও নিজের বলতে কিছু বুঝত না, বিয়ে করার দরকার কতটা জানতো না, সে আজ কি করে চিনুর মুখের ওপর এমন করে চলে যেতে পারে ! থিয়েটারের রঙ্গ দেখার জন্যেই চিনু তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো, বিনোদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াবার জন্যে নয়। কেন জানা নেই, কেষ্টদার জন্যে তার দুঃখ হয়। আর যাই হোক লোকটা খাঁটি, অন্যান্য পুরুষদের মতো নয়। গৌরীর জন্যে কতই না করে। পিনাকী তো কিছুই করে না চিনুর জন্যে ! সেই কেষ্টদাকে ফাঁকি দিয়ে বিনোদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানর কথা ভাবতেই বিশ্রী লাগে চিনুর।

ঘরে গিয়ে চুল বাঁধতে বসে চিনু। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে অদ্ভুত লাগে। মুখটা শুকিয়ে গেছে, রংটা আরও কালো হয়ে গেছে, এরকম সে ছিল না। তাইতো পিনাকী তার মুখের ছবি এত তুলেছে। বিনা পয়সায় মডেল পাবার লোভে বিয়ে করবে বলে বার করে এনেছে তাকে। তার পর এই দেড় বছরের মধ্যে কি চেহারাই না হয়েছে !

পিনাকী তার ছবি আর তোলে না, নতুন নতুন মুখ খুঁজে বেড়ায়। গৌরীকে বন্ধু ভাবে পেয়ে সে খুশি হয়েছিল, কিন্তু ক'দিন থেকে তার ব্যবহারে সে পীড়িত হয়েছে। এর পরিণাম তার অজানা নেই, ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায়।

গৌরীদের ঘর খোলার শব্দে চিনু বেরিয়ে এসে দেখে, কেষ্ট ঘরে ঢুকছে। চিনুকে দেখে হেসে জিজ্ঞেস করলে, কি চিনু, তোমার বন্ধুটি বেরিয়ে গেছে না কি ?

—হ্যাঁ।

—কোথায় গেছে ?

—ভাসান দেখতে।

—তুমি গেলে না ?

—না।

চিনু বিনোদের কথা উল্লেখ করে না। কাছে ।য়ে জিজ্ঞেস করে, চা খাবেন

কেষ্ট হেসে বলে, পেলে খুব ভাল হয়, সকাল থেকে বড় খাটনি গেছে—

—আমি এখুনি নিয়ে আসছি।

কেষ্ট জুতো খুলে বিছানায় গা এলিয়ে দেয়, শুয়ে শুয়ে পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে পড়ে।

চিনু চা নিয়ে এসে দেখে, কেষ্ট চোখ বুজে শুয়ে আছে। বলে, চা এনেছি।

কেষ্ট উঠে বসে হাত বাড়িয়ে চা নেয়, তুমি খাবে না ?

—খেয়েছি।

—বসো।

বিছানার আর-এক প্রান্তে চিনু বসে। কেষ্ট চায়ে চুমুক দিয়ে বলে, আঃ, চমৎকার চা করেছ !

—ঘরে আর কিছু নেই, দিতে পারলাম না।

—খিদে মোটেই নেই, এ শুধু চা-তেষ্টা। একটু পরে নিজে থেকেই বলে, ক'দিনই গৌরীর সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। সময়-মত আসতেই পারি না, বোধ হয় ও আমার ওপর খুব চটে গেছে। যাই হোক, কালকের মধ্যেই সব ঝামেলা মিটে যাবে, আজ তো বিসর্জন।

—গৌরীকে কিছু বলব?

—হ্যাঁ, মানে শ্যামার চিঠি এসেছে।

—তাই নাকি, কি রকম আছে সে?

চিনু যে শ্যামার সম্বন্ধে এতখানি আগ্রহ প্রকাশ করবে, কেষ্ট তা ভাবে নি। জিজ্ঞেস করে, তুমি শ্যামার কথা জান?

চিনু হাসে, সব জানি। বলুন, ও কেমন আছে?

কেষ্ট খাম থেকে চিঠি বার করে বলে, তোমায় পড়ে শোনাই।

'শ্রীচরণেষু কাকু, বিয়ের সময় হইতে তোমার সহিত আর দেখা হয় নাই। তোমার জন্যে ভারী মন কেমন করে। তুমি কেমন আছ জানাইও। আমরা এখানে খুব ভালো আছি। সংসার লইয়া ব্যস্ত আছি। ছেলেরা দু'জন আমার কথা সব শোনে। আমায় খুব ভালোবাসে। তোমাদের জামাই এখানকার নাম-করা লোক, সকলে খুব খাতির করে। তুমি একবার এখানে আসিলে ভাল হয়, নিশ্চয় করে আসিও। প্রণাম নিও। ইতি তোমার স্নেহের শ্যামা।'

চিনু একগাল হেসে বলে, শ্যামা নিশ্চয় সুখী হয়েছে।

—কি জানি, চিঠি পড়ে তো বুঝতে পারছি না।

—আমি ঠিক বুঝেছি। মেয়েরা সুখী না হলে এমন করে লিখতে পারে না।

—তা হবে।

—চিঠির উত্তর দেবেন না?

—দেবো, গৌরী আসুক।

চিনু নিজে থেকে বলে, কেন, পোস্টকার্ড নেই বুঝি?

—শুধু তাই নয়, লিখেও দিতে হবে। আমার হাতের লেখা বড্ড খারাপ।

—আমি লিখে দেবো?

কেষ্ট চিনুর দিকে তাকায়। চিনু দাঁড়িয়ে বলে, পোস্টকার্ড নিয়ে আসি?

—আনো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই চিনু দোয়াত-কলম আর পোস্টকার্ড নিয়ে এসে বসে, বলুন, কি লিখবো?

কেষ্ট ম্লান হাসে, শ্যামাকে আগে কখনও চিঠি দিই নি।

চিনু চিঠির ওপরে লেখে, শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়।

কেষ্ট বলে যায়, 'তোমার চিঠি পেয়ে খুব আনন্দিত হলাম। তুমি সুখী হলেই আমি খুশি হব। পুজোর ক'দিন বড় হাঙ্গামায় আছি। যদি পারি কিছুদিন বাদে তোমার বাড়ি যাবো। তোমরা আমার ভালবাসা নিও।'

চিনু জিজ্ঞেস করে, আর কিছু লিখবেন না।

—আর কি লিখবো?

—আপনি গেলে শ্যামা বড় আনন্দ পাবে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বসে থেকেও গৌরী যখন ফিরল না কেষ্ট উঠে পড়ে,—আমি এখন চলি। ও-দিকে অনেক কাজ বাকি, বিসর্জনের ব্যাপার—

আমরাও হয়তো যাব ভাসান দেখতে, সাতটার পর।

কেষ্ট বেহালা থেকে বেরিয়ে সোজা চলে এল পূজার মণ্ডপে। রাত্রি আটটার সময় প্রতিমা বেরোবে। এখনও দলে দলে লোক আসছে ঠাকুর দেখতে। গেটের মুখে বিশুর সঙ্গে দেখা।

—মাইরি কেষ্টদা, আর একদিন প্রতিমা রেখে দাও। কি ভিড় দেখছো!

—তা কি হয়?

—না হয় এক কাজ করো। প্রতিমা যাক, এক্জিবিশানটা রেখে দাও।

কেষ্ট হাসে, তাহলে কি আর ভিড় হবে ভেবেছিস, সব ফাঁকা হয়ে যাবে।

—কখ্খোনা নয়, খুব লোক আসবে। প্রতিমা দেখবার চেয়ে ঠাকুর দেখতে বেশি লোক আসে—

—তার মানে?

—তা-ও বুঝতে পারছ না? বিশু হো-হো করে হাসে। পাশ দিয়ে ল্যাংচা যাচ্ছিল, বিশু তাকে ডেকে বলে, শুনেছিস, কেষ্টদা ঠাকুর আর প্রতিমার তফাত বুঝতে পারছে না।

ল্যাংচা উত্তর দেয়, কি করে বুঝবে? তোমার কথা কি সহজে বোঝা যায়? জানো কেষ্টদা, বিশুর মতে প্রতিমা হ'ল মাটির তৈরি আর ঠাকুর হল জ্যান্ত, যারা ঘুরে বেড়ায়।

কেষ্ট হাসে, বিশু ভালো বলেছে, লোকে ঠাকুর দেখতেই আসে।

কেষ্ট মণ্ডপের দিকে এগিয়ে দেখে, মদন আরও দুজনকে নিয়ে বসে আছে। উঠে এসে বললে, কেষ্টদা আপনার জন্মেই বসে আছি।

—কি ব্যাপার মদন, তোমাকে অনেক দিন দেখিনি।

—বাবার শরীরটা ভাল নেই।

—কি হ'ল?

—ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আজও আসতে পারতাম না, এলাম এঁদের জন্যে। এই আমার বন্ধু চুনীলাল আর ইনি শ্যামলের বাবা, শশধরবাবু।

শশধরবাবু কেষ্টর কাছে এগিয়ে আসেন, শ্যামলের বিষয় দু'-একটা কথা বলার আছে!

—বলুন।

—ও এখন আপনার কাছে থাকে তো?

—হ্যাঁ।

—ওর মামার বাড়িতে কি ব্যাপার নিয়ে গোলমাল হয়েছে, জানেন বোধ হয়?

—শ্যামলই যা বলেছে।

—কি বলেছে জানি না। তবে তার পর থেকে আমার সঙ্গেও আর দেখা করেনি, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

কেষ্ট বিস্মিত হয়, সে কি, আমি তো জানি আপনার সঙ্গে ওর কথাবার্তা হয়—

শশধরবাবু সব কথা খুলে বলেন। কেন শ্যামলের মামার বাড়িতে ঝগড়া হয়, কোন্ দলে শ্যামল মিশছে এবং তাঁর সঙ্গে দেখাও করে না, চিঠিরও উত্তর দেয় না।

কেষ্ট চুপ করে থেকে বলে, বিশ্বাস করুন, এর কিছুই আমি জানি না। আমি এখুনি এর ব্যবস্থা করছি।

কেষ্ট ভোঁতনকে পাঠিয়ে দেয় শ্যামলকে দোকান থেকে ধরে আনার জন্যে। কিন্তু ভোঁতন ফিরে এসে জানাল, শ্যামল একটু আগে দোকান বন্ধ করে চলে গেছে, পাশের দোকানদার তাই বললে।

কেষ্ট শশধরবাবুকে ভরসা দিয়ে বলে, আজই রাত্রে কি কাল সকালে আমার সঙ্গে শ্যামলের নিশ্চয় দেখা হবে। আমি কথা বলে আপনার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবো।

কেষ্টর মাথা গরম হয়ে ওঠে। শ্যামল যে তাকে না জানিয়ে কিছু করতে পারে, তা তার জানা ছিল না। তার উপর বার বার মিথ্যে

কথা বলেছে। সেও তো ভয়ানক কথা, এর বিহিত তাকে করতেই হবে। কাছে পেলে এখনই শ্যামলের কাছে কৈফিয়ৎ চাইতো, না পেয়ে মনে মনেই গজরাতে থাকে। অবাধ্য ছেলেদের শায়েস্তা করতে সে জানে। আজ বিসর্জনের হাঙ্গামায় বোধ হয় সম্ভব হবে না, তবে পরদিন সকালেই শ্যামলের সঙ্গে বোঝাপড়া সে করবে।

চিনুর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে মেজাজ দেখিয়ে গৌরী বিনোদের গাড়ীতে এসে উঠলো বটে, কিন্তু মনের মধ্যে দুর্ভাবনার অন্ত রইল না। এতদিন বিনোদের সঙ্গে বার হওয়া নিয়ে কেষ্ট কোন কথাই বলেনি। আজ যদি চিনু তার নামে নতুন করে লাগায় হয়তো কেষ্ট তার ওপর রাগ করতে পারে। গাড়ী চলতে শুরু করলে বিনোদ জিজ্ঞেস করে, কি এত ভাবছ গম্ভীর হয়ে?

—কিছু না।

—তবু?

—চিনুটা যেন কি রকম!

—কি হল?

—আমাকে ভয় দেখাচ্ছে, কেষ্টদাকে বলে দেবে বলে।

বিনোদ হাসে, ও, এই! আমি ভাবলাম হাতি-ঘোড়া আর-কিছু। তা ওর তো হিংসে হবেই। যাকুগে ও সব বাজে কথা, বেলারাণীর কাছে গিয়েছিলাম।

—কি বললেন?

—তোমায় স্টুডিওতে নিয়ে যেতে।

—কবে?

—সামনের সপ্তাহে যে কোন দিন।

—সত্যি?

—বিশ্বাস হচ্ছে না ?

—আমি পারব না।

—কি, স্টুডিওতে যেতে ?

গৌরী ব্যস্ত হয়ে বলে, না, বলছি সিনেমায় পার্ট করতে।

—প্রথমে ঐ রকম মনে হয়, নামলে দেখবে কিছুই নয়। বেলারাণীও ঠিক এই রকম বলত।

গৌরী জিজ্ঞেস করে, কি করে জানলে ?

বিনোদ হাসে, এ তো জানা কথা। তুমি কবে যাবে বল ?

—যেদিন বলবে।

বিনোদ ভুরু কুঁচকে বলে, কেষ্টদার অনুমতি নিতে হবে তো ?

—সে আমি আদায় করে নেব।

একটা ছোট রেস্তোরাঁয চা পান করে তারা এল গঙ্গার ধারে। বিকেল থেকেই ঠাকুর বিসর্জন শুরু হয়েছে। একের পর এক লরীতে প্রতিমা নিয়ে আসছে। সন্ধ্যে হতেই কত রকম আলো দিয়ে সাজিয়ে সামনে নাচতে নাচতে ছেলেরা চলেছে। চার দিকে ঢাকের, ব্যাণ্ডের বাজনার শব্দ। বিনোদ আর গৌরী গাড়ীর মধ্যে বসে বসে অনেকক্ষণ দেখে। অন্ধকার বেশি হয়ে এলে গৌরী বলে, চল, ফেরা যাক।

—এত শীগ্‌গিরি ?

—আজ বিসর্জন, কেষ্টদারা হয়তো তাড়াতাড়ি ফিরতে পারে।

—চল।

বেহালার বাড়ির কাছে এসে গৌরীরা দেখে সব অন্ধকার। কোন ঘরেই আলো জ্বলছে না।

বিনোদ বলে, কেউ নেই, সবাই বেরিয়েছে। তুমিই সাত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে।

গৌরী মৃদু স্বরে বলে, এখন তাই মনে হচ্ছে।

—একলা ভয় করবে না ?

—আমি খুকি নাকি ?

বিনোদ গৌরীর দিকে তাকিয়ে বলে, আমার কিন্তু বড্ড তেষ্টা পেয়েছে—

—একটু দাঁড়াও, আমি জল নিয়ে আসছি।

—ভয় না পেলে আমিও সঙ্গে যেতে পারি।

—ভয় কিসের ? এসো।

বিনোদ গৌরীর সঙ্গে বারান্দায় গিয়ে ওঠে। গৌরী চাবি বার করে দরজা খোলে। ঘরে ঢুকে আলো জ্বালিয়ে ডাকে, এসো, যদিও তোমার বসবার মত ঘর এ নয়।

—কে বললে ? বিনোদ মাটিতে পাতা বিছানার উপর বসে পড়ে।

গৌরী জল আর মিষ্টি নিয়ে আসে, নারকোল নাড়ু, খাও। আমি করেছি।

বিনোদ খেতে খেতে জিজ্ঞেস করে, হঠাৎ যদি কেউ এসে পড়ে ?

—আমি দেখে আসছি।

গৌরী সন্তর্পণে বেরিয়ে যায়। ফিরে এসে বলে, ভয় নেই। চট্ করে কেউ আসবে না। চিনুদের ঘরেও তালা বন্ধ, ভাসান দেখতে গেছে নিশ্চয়।

—তাহলে দরজাটা ভেজিয়ে দাও।

গৌরী কথামত দরজা বন্ধ করে দেয়। বিনোদ ডাকে, আমার কাছে বোসো।

গৌরী বিনোদের কাছে গিয়ে বসে। বিনোদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে, এই দিনটি আমার প্রিয় ; কতজনের কথা মনে হয়, যাদের প্রণাম করতাম একে একে তারা সব চলে গেল !

—আমারও তো কেউ নেই। গত বছরও ভাইটা ছিল ; বলতে গিয়ে গৌরীর চোখে জল ভরে আসে।

বিনোদ গৌরীর একটা হাত টেনে নিয়ে বলে, ছিঃ গৌরী, কেঁদো না। লক্ষ্মীটি, বিনোদের কাছে সহানুভূতি পেয়ে গৌরীর কান্নার উচ্ছ্বাস বেড়ে যায়। বিনোদ গৌরীকে সযত্নে কাছে টেনে এনে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করে।

পুজোর ক'দিনই শ্যামল ব্যস্ত ছিল দোকান নিয়ে। হৈ-হৈ করে দিন কেটেছে, লক্ষ্মণ প্রায় সব সময় তার সঙ্গে থাকতো। বিক্রি করার সময় সাহায্য করত। অবসর সময়ে দুজনে বসে গল্প করত। লক্ষ্মণের দোষের মধ্যে মেয়েদের দিকে হ্যাংলার মত তাকায়! শ্যামল কত বার বলেছে, ওরকম করে তাকাস না। কি ভাববে—

লক্ষ্মণ তাচ্ছিল্যভরে উত্তর দেয়, কি আবার ভাববে, সেজেগুজে এসেছেই তো দেখাতে—

শ্যামল আর কিছু বলত না যদি-না লক্ষ্মণ সপ্তমীর দিন বিক্রি করার সময় একটা মেয়েকে চারটে লজেন্স বেশি দিয়ে দিত। বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলে, ও কি, চারটে বেশি দিলি কেন?

লক্ষ্মণ পানখাওয়া দাঁত বার করে বলে, কি বড় বড় চোখ মাইরি।

শ্যামল থাকতে না পেরে হেসে ফেলেছিল।

বিসর্জনের দিন লক্ষ্মণ বললে,আজ কিন্তু আর সন্ধ্যের পর আসবোনা।

—কেন?

—বাঃ, আজ বিজয়া। বাড়িতে সকলকে প্রণাম করতে হবে যে, নইলে আর রক্ষে থাকবে না।

শ্যামলের মুখ শুকিয়ে যায়, আজকের এ দিনটাতেও সে বাড়ি ফিরতে পারবে না। মামা, পিসিমা, বাবা, সবাই এসে জড়ো হবেন মাঝখানের উঠোনে। গৃহদেবতাকে প্রণাম করে একের পর এক বড়দের প্রণাম করা, তারপর কোলাকুলি, প্রিয়জনদের স্মরণ করে চোখের জল ফেলা। শ্যামলের সেখানে আর যাবার অধিকার নেই।

লক্ষ্মণ বলে যায়, জ্বালাতন মাইরি। এমন দিনে যে সিদ্ধি-টিদ্ধি একটু ওড়াবো তার উপায় নেই। রাজ্যের যত বেরসিক লোক এসে জুটবে। বাবাই এখন আমাদের বংশের মধ্যে সবচেয়ে বড় কি না—

তখন থেকেই শ্যামলের মন খারাপ হয়েছিল। কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারে না। বার বার চোখে জল এসে পড়ে তার। কোন রকমে দুপুরটা কাটিয়ে বিকেল হতেই দোকান বন্ধ করে ফেলে। লক্ষ্মণ অনেক আগেই চলে গিয়েছিল, শ্যামলও বেরিয়ে পড়ে। ভেবেছিল কেষ্টকে বলে যাবে, কিন্তু তার সঙ্গে আর দেখা হ'ল না। সেখান থেকে পার্কে গিয়ে বসে। বিকেলের রোদের তেজ কমে গেছে। অল্প অল্প হাওয়া দিচ্ছে। বসে থাকতে শ্যামলের ভালই লাগে। হঠাৎ মনে হয়, মামার বাড়িতে গেলে কি হয়? সে তো থাকতে যাচ্ছে না, সবাইকে প্রণাম করে চলে আসবে। মনে হতেই শ্যামল উঠে পড়ে মামার বাড়ির পথে চলতে শুরু করে। খানিক দূর এগিয়ে তার মনে পড়ে বাবার সঙ্গে একবারও দেখা করেনি, তাঁর একটা চিঠিরও উত্তর দেয়নি। আজ যদি ওখানে বাবা থাকেন, আবার একটা অপ্রীতিকর ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে। শ্যামলের নিজেকে বড় হীন মনে হয়। ভাবে, তার চেয়ে বেহালার বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়া ভালো। ক'দিন অমানুষিক পরিশ্রম গেছে, ঘুমিয়ে নিলে সব রকম অবসাদ কেটে যাবে।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। শ্যামল বেহালার ট্রাম থেকে নেমে পড়ে। ঐ পাড়ার পুজোর প্যাণ্ডেলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে পরিচিত গলায় কে একজন ডাকলে, শ্যামল না?

ফিরে দেখে জলিল। জলিল কালীর ডান হাত। তবে সে জাতে মুসলমান। কিন্তু না বলে দিলে বোঝবার উপায় নেই, ঠিক বাঙালী হিঁদুর মত দেখতে। শ্যামল হেসে জিজ্ঞেস করে, কি খবর জলিল?

—এসো, এক-ভাঁড় খেয়ে যাও।

—কি ?

—সিদ্ধি।

—না ভাই, মন-মেজাজ ভালো নেই।

জলিল হাসে, সেইজন্যেই তো আরও খাবে।

—আজ না, অন্য দিন হবে।

জলিল শ্যামলের হাতটা চেপে ধরে, কি হয়েছে রে ?

—কিছু না।

—তার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বুঝি ?

এত দুঃখেও শ্যামলের হাসি পায়। কালীর আড্ডায় সে অনেক দিন বাহাদুরী করে জলিলদের কাছে বলেছে, সে একটা মেয়েকে নিয়ে এই বেহালায় থাকে। কি রকম ভাবে মেয়েটি তার প্রেমে পড়েছিল, তারপর কি ভাবে তাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে। বানিয়ে বানিয়ে নানারকম গল্প তাদের কাছে করেছে। অন্যেরা সন্দেহ করলেও জলিল করেনি, কারণ গৌরীর সঙ্গে দু'তিন দিন সে শ্যামলকে বাজারে যেতে দেখেছে। আজ সেই প্রসঙ্গ তুলতে সত্যিই শ্যামলের হাসি পায়। ভাবে জলিলটা কি বোকা, সব কথাই বিশ্বাস করে।

জলিল কিন্তু ছাড়লো না। একটা ছোট্ট ভাঁড় ধরিয়ে দিয়ে বললো, ভালো না লাগে ফেলে দিও। এক চুমুক দিয়ে শ্যামলের মন্দ লাগে না, গল্প করতে করতে বেশ খানিকটা খেয়ে নেয়।

—এখন কেমন লাগছে ?

—মন্দ না।

—তবে ? নে ধর, এই বড় ভাঁড়টা।

এক কোণায় বসে দুজনে মিলে অনেকখানি সিদ্ধি খেয়ে ফেলে। জলিল ভাবেনি শ্যামলের এত সহজে নেশা হবে। খানিক বাদেই শ্যামল ভুল বকতে শুরু করে, অকারণে হাসতে থাকে।

জলিল বলে, দুর, এইটুকুতেই তোর নেশা লেগে গেল ?

শ্যামল রুখে ওঠে, নেশা লাগেনি তো, আমি ঠিক আছি। বলেই হাসতে শুরু করে।

—শালা এত হাসছিস কেন ?

—কোন্ শালা হেসেছে। আমি তো হাসিনি, তুই হাসছিস। শ্যামল হো-হো করে হেসে ওঠে।

জলিল জিজ্ঞেস করে, মেয়েটার নাম কি রে ?

—কোন মেয়েটার ?

—তোর সঙ্গে যে থাকে ?

—গৌরী।

—বেশ মিষ্টি নাম। চল, তোকে ঘরে ছেড়ে আসি।

জলিল শ্যামলকে একরকম ধরে ধরেই বাড়িতে নিয়ে আসে। সব ঘর অন্ধকার, শুধু গৌরীর ঘরে আলো জ্বলছে। বারান্দায় উঠে শ্যামল বসে পড়ে। আর পারছি না, এখানেই শুয়ে পড়ি।

—এই তো দরজা, চল না। গৌরী নিশ্চয় তোর জন্যেই বসে আছে। জলিল দরজায় ধাক্কা মারে। দরজা ভেজানো ছিল, ঠেলতেই খুলে যায়। বারান্দায় পায়ের শব্দ শুনেই বিনোদ আর গৌরী নিজেদের সামলে নিয়েছিল। জলিল ঘরে ঢুকে এদের দুজনকে দেখে থমকে দাঁড়ায়। শ্যামলকে কোন রকমে টেনে আনে। শ্যামল ঢুকেই ধপ করে মাটিতে বসে পড়ে। নেশার ঝোঁকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে, ঐ তো গৌরী। তারপর আবার মাটিতে শুয়ে পড়ে।

জলিল ছোট ছোট চোখ দিয়ে গৌরীর দিকে তাকিয়ে বলে, সিদ্ধি খেয়ে ওর নেশা হয়েছে। তাই পৌঁছে দিয়ে গেলাম।

গৌরী কোন উত্তর দিতে পারে না, মুখ নিচু করে থাকে। বোঝে, শ্যামল না দেখলেও এই অপরিচিত লোকটার কাছে তারা হাতে-নাতে

ধরা পড়ে গেছে। বিনোদ বুদ্ধিমান, জলিলের জামা-কাপড়ের অবস্থা দেখেই বুঝেছিল টাকা পেলেই সে খুশি হবে। জলিলের হাতে দুটো টাকা দিয়ে বলে, বেশ করেছো, এখন যাও, জলিল নোটটা হাতে নিয়ে চোখ টিপে হেসে সেলাম করে চলে যায়।

গৌরী এতক্ষণে কথা বলে, বাবা, আমি ভীষণ ভয়পেয়েগিয়েছিলাম!

—ভাগ্যিস তোমার কেষ্টদা নয়, হাতাহাতি হয়ে যেতো।

—সত্যি।

—আমি এখন চলি, আর থাকা ঠিক হবে না।

গৌরী শ্যামলকে দেখিয়ে বলে, একে নিয়ে কি করবো?

—তাই তো, ভাবনার কথা। ওকে নিয়েএক ঘরে থাকা ঠিক হবে না।

—কি করি?

—আমি ওকে বারান্দায় শুইয়ে দিয়ে যাচ্ছি।

বিনোদ শ্যামলকে পাঁজাকোলা করে তুলে বারান্দায় বিছানা করে শুইয়ে দেয়!

যাবার সময় গৌরী বিনোদকে ঘরে ডেকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। বিনোদ গৌরীকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়, মৃদুস্বরে বলে, যদি কোন গেলমাল হয় সোজা আমার কাছে চলে এসো।

বিনোদ চলে গেলে গৌরী দরজা বন্ধ করে আলো নিবিয়েশুয়ে পড়ে।

কেষ্ট ভোরবেলা উঠে চলল বেহালার দিকে। কাল রাত্রেই সে আসতো গৌরীর সঙ্গে দেখা করতে, যদি না প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে বাড়ি ফিরতেই রাত্রি এগারোটা বেজে যেত। তা ছাড়া মনে মনে একথাও ভেবেছিল, শ্যামল যেমন পুজোর ক'দিন বেহালায় না গিয়ে তার বাড়িতে শুচ্ছে বিজয়ার দিনও হয়তো আসবে। কিন্তু বাড়ি ফিরে শ্যামলকে না দেখে স্থির করেছিল পরদিন ভোরবেলাই গৌরীর কাছে যাবে।

কেষ্ট যখন বেহালায় এসে পৌঁছাল তখনও বেলা বাড়ে নি। গৌরীর ঘরের সামনে শ্যামলকে শুয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়। শ্যামল স্থির হয়ে ঘুমিয়ে আছে, তাকে না ডেকে কেষ্ট দরজায় ধাক্কা দেয়। গৌরী একটু দরজা ফাঁক করে দেখে নিয়ে বলে, ওঃ তুমি! কেষ্ট লক্ষ্য করে গৌরীর চোখে-মুখে কেমন যেন আতঙ্কের ভাব। জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে গৌরী?

গৌরী বলে, আমি বড় ভয় পেয়েছিলাম।

—কেন?

—শ্যামল কাল—

—কি হয়েছে, বল?

—কি রকম নেশা করে এসেছিল ঘরের মধ্যে ঢুকে মাতলামি—

—একলা?

—সঙ্গে একটা লোক ছিল।

কেষ্টর আর কথা শোনার ধৈর্য থাকে না, মাথার রক্ত গরম হয়ে ওঠে, বারান্দায় বেরিয়ে এসে শ্যামলের চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকি দেয়। শ্যামল ধড়-মড় করে উঠে বসে, অপ্রস্তুত মুখে বলে, কেষ্টদা। ও অনেক বেলা হয়ে গেছে বুঝি? কেষ্টর পায়ে হাত দিয়ে বলে, আপনাকে বিজয়ার প্রণাম করা হয় নি।

কেষ্ট সে-কথার উত্তর না দিয়ে কর্কশ গলায় বলে, ঘরের ভিতরে এসো।

শ্যামল কেষ্টর কঠিন স্বরে অবাক হয়ে যায়, ভয়ে ভয়ে ঘরের মধ্যে এসে ঢোকে।

দরজা বন্ধ করে কেষ্ট আগের মতোই তেঁতো গলায় জিজ্ঞেস করে, কাল নেশা করেছিলে?

শ্যামল মাথা নিচু করে খুব আস্তে বলে, সিদ্ধি খাইয়ে দিয়েছিল।

—কচি খোকা, খাইয়ে দিয়েছিল, না, নিজে খেয়েছিলে?

শ্যামল চুপ করে থাকে। কেষ্ট চিৎকার করে, সঙ্গে কাকে নিয়ে এসেছিলে?

জলিল যে তাকে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে এসেছিল, সে-কথা শ্যামলের আদৌ মনে ছিল না, বলে, কেউ না তো।

গৌরী বাধা দিয়ে বলে, সে কি! একমুখ পানখাওয়া পাজামা-পরা-লোকটা।

গৌরীর বর্ণনা শুনে শ্যামলের জলিলের কথা মনে হয়, ভয়ে ভয়ে বলে, কে জলিল?

কেষ্টর অরে সহ্য হয় না, সজোরে চড় মারে শ্যামলের গালে, মিথ্যেবাদী।

শ্যামল মার খেয়ে মেঝের উপর ছিট্‌কে পড়েছিল। হাত দিয়ে গাল চেপে ধরে চোখের জল সামলাবার চেষ্টা করে, কোন রকমে গলা পরিষ্কার করে বলে, আমার মনে ছিল না কেষ্টদা।

—একশ'বার মনে ছিল, মিথ্যুক।

—আমি মিথ্যে বলিনি।

—তোমার বাবার সঙ্গে দেখা না করে মিথ্যে বলনি তুমি, দেখা করেছো?

শ্যামল স্তব্ধ হয়ে যায়। তার বুঝতে বাকি থাকে না কেষ্টদা সব জানতে পেরেছে।

কেষ্টর ক্রমশ রাগ বাড়ছিল, শ্যামলকে চুপ করে থাকতে দেখে, এগিয়ে গিয়ে এক লাথি মেরে বলে, কুকুর কোথাকার, জানোয়ার, চোর।

শ্যামল আর সহ্য করতে পারে না। তার মাথায় যেন ভূত চাপে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে, চোর আমি না আপনি, কে আমায় মিথ্যে কথা বলতে শিখিয়েছে?

কেষ্ট আর-এক লাথি মারে, ফের কথা!

শ্যামল কাঁদতে কাঁদতে বলে, আপনি আমায় মারতে পারেন, আমি কোন দিন আপনার ক্ষতি করিনি। কিন্তু আপনি আমার সর্বনাশ করেছেন। আপনার জন্যে আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়েছে, আপনার জন্যে আজ আমি রাস্তার ছেলে হয়ে গেছি।

কেষ্ট রাগে অন্ধ হয়ে লাথি-চড় যা খুশি মারতে থাকে। শ্যামল চিৎকার করে বলে, ভগবান আপনাকে লাথি মারবেন, ঠিক এমনি করে মারবেন।

কেষ্ট ঘাড় ধরে শ্যামলকে ঘর থেকে বার করে দেয়। বলে, শূয়োর, আর কোন দিন এ-মুখো হবে না, জুতিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেবো। দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে কেষ্ট একটা ট্রাঙ্কের উপর বসে হাঁফাতে থাকে, জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেয়। গৌরী এতক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, কেষ্টকে এতখানি রাগতে সে আগে কখনও দেখেনি। কি অমানুষিক রাগ, পারলে বোধ হয় শ্যামলকে নখ দিয়ে কুটি-কুটি করে ছিঁড়ে ফেলতো। শ্যামলের জন্যে তার সত্যিই মায়া হয়, ভোর বেলা কেষ্ট হঠাৎ এসে না পড়লে গৌরী তার নামে লাগাতো না নিশ্চয়। পাছে শ্যামল বিনোদের সঙ্গে গৌরীর একঘরে থাকার কথা কেষ্টর কানে তোলে, সেই ভয়ে সে একথার অবতারণা করেছিল, কিন্তু তার পরিণাম যে এত ভয়ঙ্কর হবে তা মোটেই কল্পনা করেনি। এ অবস্থায় কথা বলারও সাহস হয় না।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে কেষ্ট বলে, কাল বিজয়ার রাত্রে তোমার কাছে আসতে পারিনি।

শুকনো গলায় গৌরী জবাব দেয়, তাতে কি হয়েছে, নিশ্চয় ব্যস্ত ছিলে।

আবার অনেকক্ষণ কোন কথা হয় না। কেষ্টই বলে, শ্যামল বাক্স নিতে এলে দিয়ে দিও। আমি এখন যাচ্ছি, ফিরতে বেলা হবে।

কেষ্ট ভেবেছিল গৌরী হয়তো তাকে বাধা দেবে, শীগ্‌গিরি ফেরার

জন্য পীড়াপীড়ি করবে, অন্তত বিজয়ার প্রণাম করবে। গৌরী কিছুই করল না, কেষ্ট চলে যেতে চুপ করে বসে রইল। শ্যামলের কথাগুলো তার মনের মধ্যে তোলপাড় করছে! কেষ্টদাই ছেলেটাকে নষ্ট করেছে, এ আর আশ্চর্য কি? গৌরীকে নিয়েও যে লোক ঠকানোর ব্যবসা করে, তার পক্ষে সব কিছুই সম্ভব। অথচ মেজাজ দেখিয়ে তাকে দিল তাড়িয়ে। এ তো অন্যায়। শ্যামল এখন কি কববে? কোথায় যাবে দরকার মনে করলে না।

খানিক বাদে চিনু এলো, জিজ্ঞেস করলে, ব্যাপার কি রে, কেষ্টদা শ্যামলকে এত বকছিলো কেন?

চিনুর সঙ্গে আজকাল আর কথা বলতে গৌরীর ইচ্ছে করে না। বলে, কি জানি কি নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে।

—তুই তো শুনেছিস সব, কি ব্যাপার বল না?

—ওসবের মধ্যে আমি থাকতেও চাই না, ভালোও লাগে না।

—তোর কি হয়েছে বল তো?

—আর আমি পারছি না, এভাবে পড়ে থাকতে, এর চেয়ে বস্তী ঢের ভালো, সেখানকার মানুষগুলো খাঁটি, এরকম চোর-জোচ্চোর নয়।

চিনুর মনে হয় গৌরী যেন তাকে শুনিয়েই কথাগুলো বললো, হেসে উত্তর দেয়, তোর মন এখন উড়ু উড়ু করছে, আমি তা জানি গৌরী।

—তার মানে?

—আমি বলে রাখছি, বেশি ফুলে মধু খেয়ে বেড়াস না, দেখবি রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। বলেই চিনু ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সে যে কি ইঙ্গিত করে গেল তা বুঝতে গৌরীর বাকি থাকে না। ইচ্ছে করে দরজাটি বন্ধ করে দেয়, আর না চিনু জ্বালাতন করতে আসে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে গৌরী সেজেগুজে বেরিয়ে পড়ে। একবার ভাবে,

চিনুকে কিছু না বলেই সে চলে যাবে, আবার মনে হয় ওকে এত ভয় কিসের? ইচ্ছে করেই চিনুকে ডেকে হাতে চাবি দিয়ে বলে, যদি শ্যামল এসে ওর জিনিসপত্র চায় দিয়ে দিস।

—কোথায় যাচ্ছিস?

—বেড়াতে।

গৌরী বেহালার ট্রাম ধরে ময়দানের কাছে এসে ট্যাক্সি নেয়। হাজির হয় বিনোদের বাড়ি। বিনোদ কাল জোর করে ওর ব্যাগে দশ টাকা দিয়ে দিয়েছিলো, বলেছিলো, দরকার পড়লেই ট্যাক্সি করে আমার বাড়ি চলে এসো।

বিনোদ গৌরীকে আসতে দেখে প্রথমেই জিজ্ঞেস করে, কিছু হয়নি তো?

—কেষ্টদা শ্যামলকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

—তাই নাকি? ভালো কথা।

—সেকথা পরে হবে। এখন চল—

—কোথায়?

—বেলারাণীর কাছে। ওদিকে যদি ঠিক হয়ে যায় আমি বেহালা ছেড়ে চলে আসবো।

—সত্যি? কেষ্টদাকে?

—আর আমি পারছি না, সত্যি পারছি না!

বিনোদ গৌরীকে নিয়ে যখন বেলারাণীর বাড়িতে এল বেলারাণী তখন সবে ঘুম থেকে উঠে চা খেতে বসেছে। বিনোদ এসেছে শুনে উপরে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালো।

বিনোদ জিজ্ঞেস করে, ব্যাপার কি এত বেলায় ঘুম থেকে উঠলে যে?

বেলারাণী হেসে বলে, কাল এক বিশ্রী স্যুটিং ছিল, হাড়ভাঙ্গা খাটুনি গেছে। তোমরা বসো।

বিনোদ আর গৌরী বড় সোফায় পাশাপাশি বসে।

—কি খাবেন বলুন?

গৌরী মৃদু স্বরে বলে, খেয়ে এসেছি।

—না খেয়ে আসেননি তাতো জানি, চা আনতে বলি কি বলুন? বেয়ারাকে দু কাপ চা আনতে বলে।

বেলারাণী নিজ থেকেই বলে, আপনার পার্ট সেদিন দেখলাম বেশ হয়েছিলো। কথাগুলো আর একটু স্পষ্ট করলে ভালো হয়।

—আগে তো কখনও করিনি।

—তাই শুনলাম, বিনোদ বলছিলো।

বিনোদ মাঝখান থেকে জিজ্ঞেস করে, গৌরীকে কবে স্টুডিতে নিয়ে যাবো?

—সামনের সপ্তাহে দু'দিন আমার স্যুটিং আছে, সোমবারই নিয়ে এসো। দেখার আর কি আছে। ছবিতে ওর মুখ ভালোই উঠবে। মাইক্রোফোনে গলাটা কি রকম আসে, সেইটে শুধু দেখে নিতে হবে।

—সেই তো ভালো গৌরী, সোমবার তোমায় আমি নিয়ে যাবো।

গৌরী নীরবে সম্মতি জানায়।

বেলারাণী জিজ্ঞেস করে, কি ধরনের পার্ট আপনার ভালো লাগে?

—অত আমি বুঝি না, যা পারবো তাই দেবেন।

—প্রভাতবাবুর সঙ্গে কথা বলে আপনার পার্ট ঠিক করবো।

বিনোদ জিজ্ঞেস করে, প্রভাতের খবর কি, অনেক দিন দেখিনি।

—বিয়ের তোড়জোড় করছে আর কি। আজ একবার অরুণার কাছে যাবো বলেছিলাম। আজ কি বার বিনোদ?

—শনিবার।

—ঠিক কথা, বিকেলের দিকে যেতে পারবো কি না কে জানে, এই বেলা সেরে আসি।

বিনোদরা উঠে পড়ে। গৌরী হাত তুলে নমস্কার করে বলে, সোমবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে।

গাড়ীতে উঠেই বিনোদ প্রশ্ন করে, কেষ্টদাকে কবে বলবে?

—যেদিন প্রথম সুযোগ পাবো।

—এই লাইনে থাকবে স্থির করেছো?

—করেছি।

—এখন কোথায় যাবে?

—বল।

—বাড়ি ফেরার তাড়া নেই?

—না।

—কেষ্টদা জানে কোথায় এসেছ?

—না।

—ফিরলে তখন যদি জিজ্ঞেস করে?

—সত্যি কথাই বলব।

—ভয় করবে না?

—না।

বিনোদ হেসে বলে, তবে চল আমার সঙ্গে, একেবারে সন্ধ্যের সময় বাড়ি যেও।

প্রভাতের ছোট্ট বাড়ির চেহারা একদিনেই অনেকখানি বদলে গেছে। অরুণার মার সুনিপুণ গৃহিণীপনায় সংসারের সব কাজ নিখুঁত ভাবে চলছে। প্রভাতের রোজগার খুব বেশি না হলেও কেউ অভাব অনুভব করে না। রমেশবাবুর শরীরও আগের চেয়ে অনেকটা ভালো।

বাঁদিকটা যে পক্ষাঘাতে পড়ে গিয়েছিলো, তাতে অল্প অল্প করে জোর পাচ্ছেন। ঘর থেকে বারান্দা অন্য কারুর কাঁধে ভর দিয়ে বেড়াতে পারেন। নিয়ম করে সকালবেলা কাগজ পড়া, দুপুরে ঘুমনো, বিকেলের পর প্রভাত ফিরলে তাস খেলা চলে।

আজ ছুটির দিন বলে সকাল থেকেই তাস খেলা শুরু হয়েছে। রমেশ-বাবু আর প্রভাত একদিকে, অন্য দিকে অরুণার মা আর অরুণা। টোয়েন্টি-নাইন খেলাটাই সকলে জানে, তাই বেশির ভাগ সময় ঐ খেলাই হয়।

প্রভাত বলে, এ খেলা কলকাতার কারা খেলে জানো অরুণা?

—কারা?

—উড়ে চাকরেরা।

অরুণা বলে, সত্যি কথা। বাপি, সেই যে আমাদের বলিয়া ঠাকুর ছিল মনে আছে, কি রকম খেলতো—

খেলা বেশ জমে উঠেছে! প্রভাতদের তিনটে লাল বেরিয়েছে, অরুণা-দের একটা কালো। এমন সময় নীচে থেকে বেলারাণীর গলা শোনা গেল।

—অরুণা আছো, অরুণা?

—যাই, সাড়া দিয়ে অরুণা বলে, নিশ্চয় বেলাদি এসেছে, এখানে ডেকে আনি।

কয়েক মিনিট খেলা বন্ধ থাকে। বেলারাণীকে নিয়ে অরুণা ঘরে ঢোকে। নিজে থেকেই বলে, বাঃ, বেলাদিকে হলদে শাড়ীতে কি সুন্দর মানিয়েছে, না?

অরুণার মা হেসে অভ্যর্থনা করেন, এসো, কত দিন পরে এলে বলতো। বসো এখানে।

বেলারাণী বলে, অনেক কাজ পড়ে গিয়েছিল। আজ একটু ফাঁকা আছে, তাই বিজয়ার প্রণাম করতে এসেছি। বেলারাণী অরুণার মা-বাবাকে প্রণাম করে।

অরুণার মা আশীর্বাদ করেন, বেঁচে থাকো মা! বাবা বললেন, যশস্বিনী হও।

প্রভাত জিজ্ঞেস করে, আপনি টোয়েন্টি-নাইন খেলেন তো?

বেলারাণী হেসে জবাব দেয়, খেলি না, তবে খেলতে জানি।

মা বললেন, আমার হাতটা নিয়ে অরুণার সঙ্গে তুমি বসো তো মা, আমি এখুনি আসছি।

আবার খেলা শুরু হল। বেলারাণীর বরাত ভালো, দু'দানে খেলার চেহারা গেল পাল্টে। বেলারাণীর কুড়ির খেলা, অপর পক্ষকে একটাও পিঠ না দিয়ে খেলা করে কালো বুজিয়ে লাল খুলিয়ে দিলে। আর পরের দানে প্রভাতের আঠারোর ডাকে ডবল দিযে ওদের দুটো লালই বন্ধ করে দেয়।

অরুণা বলে, বেলাদি খুব ভালো খেলে, আমার সঙ্গে মাকে দিয়ে প্রভাতদা আর বাপি খালি খালি হারিয়ে দেয়।

অরুণার মা প্লেটে মিষ্টি সাজিয়ে এনে বেলারাণীকে খাওয়াতে বসলেন। খেলা বন্ধ হয়ে গেল। প্রভাত একটা মিষ্টি তুলে নিয়ে নীচে নেমে যায়, আসছি, কোন চিঠিপত্র আছে কি না দেখি।

বেলারাণী অরুণার বাবাকে জিজ্ঞেস করে, এখন কি রকম আছেন?

—অনেকটা ভাল। রমেশবাবুর গলা ভারী হয়ে আসে, প্রভাত আমার নতুন জীবন দিয়েছে। কি ভাবে যে ভুলিয়ে রাখে! সকাল বেলা কাগজ পড়িয়ে শোনায়, অন্য সময় বই পড়ে, কত রকম বই পড়ে। সন্ধ্যেবেলা তাস খেলে, কি অন্য কিছু। অবশ্য এ-সব প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। প্রভাত নতুন করে ধরিয়েছে, খুব ভালো লাগছে।

—প্রভাতবাবুর মনটার কোন তুলনা পাই না। সকলকেই এত ভালোবাসেন, বেলারাণী অরুণার গাল ধরে আদর করে বলে, বিয়ে কবে, অগ্রহায়ণ মাসে তো?

অরুণা মাথা নীচু করে বসে থাকে।

অরুণার মা উত্তর দেন, হ্যাঁ, অঘ্রানের মাঝামাঝি। সামনের সপ্তাহে আমরা হাওয়া বদলাতে একটু বাইরে যাব।

—কোথায় ?

—জগদীশপুর। ওঁর বন্ধুর বড় বাড়ি আছে। আগেও আমরা গেছি। ডাক্তার বলছে, ঘুরে এলে অনেক উপকার হবে।

—চেঞ্জটা খুবই দরকার, আপনারা সকলেই যাবেন তো ?

—হ্যাঁ, প্রভাতও এক মাসের ছুটি পেয়েছে।

অনেকক্ষণ গল্প করে বেলারাণী বিদায় চায়, আমি এবার আসি। আপনারা ফিবে এলে আবাব দেখা করব।

নীচের ঘরে প্রভাত বসে চিঠির উত্তর দিচ্ছিল, অরুণা বেলারাণীকে নিয়ে এল !

—এই যে, বেলাদি চলে যাচ্ছেন।

প্রভাত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, এর মধ্যেই ?

—বাঃ, এক ঘণ্টার ওপর হয়ে গেছে।

—তাই নাকি ?

চেঞ্জে যাবার আগে একবার আসবেন, যদি কিছু অদল-বদল করার থাকে।

—পরশু-তরশু যাব !

বেলারাণী ঘর থেকে বেরিযে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করে, গৌরী মেয়েটি কে ?

—কেন বলুন তো ?

—দরকার আছে, চেনেন নাকি ?

প্রভাত বলে, চিনি, তবে বিশেষ নয়।

—ও ফিল্মে পার্ট করতে চায়।

প্রভাত বিস্মিত হলেও মুখে কিছু বলে না। বেলারাণী চলে যেতেই অরুণা জিজ্ঞেস করে, কে গৌরী ?

—তোমায় বলেছিলাম, সেই কেষ্ট, যার সঙ্গে পুজোর প্যাণ্ডেলে তোমার আলাপ করিয়েছিলাম ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ভোরবেলা একদিন যে মেয়েটিকে নিয়ে তোমার বাসায় গিয়েছিল ?

প্রভাত সায় দেয়, সেই-ই গৌরী। আমাকে বোঝালে, মেয়েটাকে বিয়ে করবে, এখন দেখছি সিনেমায় নামিয়ে রোজগার করার মতলব। আশ্চর্য !

ফেলে-আসা দিনের অনেক ঘটনা খুঁটিয়ে দেখতে গেলে অনেক গলদ হয়তো চোখে পড়ে—যা সে সময় নজর এড়িয়ে গিয়েছিল। বেহালা থেকে বেরিয়ে পুজোর মণ্ডপে আসা পর্যন্ত কেষ্ট সারাক্ষণ শ্যামলের কথাই ভেবেছে। যে শ্যামলকে প্রথম দিন সিনেমার সামনে থেকে টেনে বার করে এনে নিজের পথে চালিয়েছিল, যাকে দিয়ে স্বার্থসিদ্ধির অনেক উপায় বের করেছিল, সেই শ্যামলকে নিজের অজান্তে কেষ্ট ভালোবেসেছিল। তা না হলে সব সময় শ্যামলের কথা কেন সে চিন্তা করেছে ? কেন বাড়ি থেকে তাকে তাড়িয়ে দিলে ? কেন নিঃসঙ্কোচে সে গৌরীর সঙ্গে থাকতে দিয়েছে ? কেন তার দোকানের সমস্ত ভার শ্যামলকে দিয়ে সে খুশি হয়েছে ? আজ রাগের মাথায় শ্যামলকে মেরে তাড়িয়ে দিল, শুধু সে কেষ্টর কাছে মিথ্যে কথা বলেছিল বলে। শ্যামলের অভিযোগ হয়তো সত্যি, কেষ্টই তাকে মিথ্যে কথা বলতে শিখিয়েছিল। কিন্তু সে শুধু অর্থ উপার্জনের কৌশল হিসেবে। মনুষ্যত্বকে বিক্রি করার জন্যে নয়। ব্যবসায় মিথ্যে কথা কে না বলে, কেষ্ট তাকে ব্যবসা করতেই শিখিয়েছে, গুরুমারা বিদ্যে আয়ত্ত করতে নয়। সেই জন্য

সে শ্যামলকে এত নির্মম ভাবে প্রহার করতে পেরেছে। তবে এ কথাও সে ভেবেছে, শ্যামল এসে তার পায়ে হাত দিয়ে মাপ চাইলে সে আবার তাকে কাছে টেনে নেবে।

পূজার মণ্ডপে পৌঁছে ক্লান্ত অবসন্ন কেষ্ট আশুদার কেবিনের এক কোণে বসে গরম চায়ের অর্ডার দেয়। প্রদর্শনী ভেঙ্গে গেছে, দোকানের মাল বাক্স বন্ধ করে ঠেলাগাড়ীতে চাপিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছে। ডেকরেটারের লোক এসে কাপড় খুলে ফেলেছে, একদিনের মধ্যেই পুজোর মণ্ডপ আবার ছেলেদের খেলার মাঠে রূপান্তরিত হবে।

আশুদা নিজের দোকানে ছিলেন। স্টলে এসে কেষ্টকে দেখে বললেন, সারারাত ঘুমোওনি নাকি? এত রুক্ষ দেখাচ্ছে কেন?

কেষ্ট বিরক্তিমাখা গলায় বলে, আর বলবেন না আশুদা! শুধু ঝুটো ঝামেলা—

—কি হোল আবার?

—শ্যামলটাকে আজ বড় মেরেছি।

আশুবাবু বিস্মিত হন, শ্যামল আবার কি করল?

—ক'দিন থেকে আমার কাছে মিথ্যে কথা বলছে। তার বাবার সঙ্গে দেখা করে কথা বলে এই সব, অথচ একদিনও সে তার বাবার কাছে যায়নি। তাছাড়া কাল নেশা করে বাড়ি ফিরেছিল, গৌরী ভয় পেয়ে গেছে।

—এ তো মারাত্মক কথা?

—রাগের মাথায় ছেলেটাকে খুব মেরেছি।

আশুবাবু চুপ করে থেকে বললেন, এবারে গৌরীর কথা একটু ভাবো।

কেষ্ট মুখ তুলে তাকায়।

—আমি বলছি বিয়ে-থা করে ফেল। মেয়েটাকে আর ঝুলিয়ে

রেখো না। প্রভাতরা তো অঘ্রানে বিয়ে করছে, ওই সঙ্গে তোমাদেরও হয়ে যাক।

কেষ্ট মৃদুস্বরে বলে, আমিও তাই ভাবছি।

—অত ভাবনার কি আছে? ক'মাস থেকেই তো দেখছি শুধু ভাবছ, পুরুত ডেকে একটা দিন ঠিক কর, আমরা পাঁচজন তো আছি!

—আপনাদের ওপরই তো ভরসা আশুদা!

আশুদা বলেন, তুমি বরং বাড়ি যাও, চান-টান করে এসো।

কেষ্ট উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙ্গে, তাই যাই।

অপমানিত লাঞ্ছিত শ্যামল বেহালার বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা রিক্সা নিয়ে চলল জলিলের বাড়ি। জলিলের বাড়ি কাছেই। কাল রাত্রে কি কি ঘটেছিল তার কাছে শোনা না অবধি কিছুতেই মনে শান্তি পাচ্ছে না। মামার বাড়ি থেকেও তাকে একদিন এঁমনি ভাবে চলে আসতে হয়েছিল সত্যি কথা, কিন্তু সেদিন তার নিজেরই দোষ ছিল বেশি। কিন্তু আজ কোন রকম দোষ না থাকা সত্ত্বেও কেষ্টদা তাকে বিশ্রী ভাষায় গাল দিয়েছে, নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন করেছে। আর যাই করুক, কেষ্টর কাজে তো শ্যামল কোন দিন অবহেলা করেনি, তবে সে শ্যামলকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে কেন এরকম দুর্ব্যবহার করল? মনে মনে ভাবল, কাল নেশার ঘোরে যদি কোন রকম অন্যায় করে থাকে, জলিল হয়ত তার হদিশ দিতে পারে।

জলিল ঘুম থেকে উঠে দাওয়ায় বসে দাঁতন করছিল। শ্যামলকে রিক্সা চড়ে আসতে দেখে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলে, কি রে, নেশা ছুটেছে?

সে-কথার উত্তর না দিয়ে রিক্সা থেকে নেমে ভাড়া চুকিয়ে শ্যামল জলিলের কাছে এসে বসল। শ্যামলের ছিন্ন-ভিন্ন পোষাক, ফোলা-ফোলা চেহারা দেখে জলিল আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে রে?

শ্যামল গম্ভীর গলায় উত্তর দেয়, সে অনেক কথা, পরে বলছি। আগে বলতো, কাল আমি কি বেশি মাতলামি করেছি ?

—না, তুই তো খালি ঘুমিয়ে পড়েছিলি। কোন রকমে তোকে বাড়িতে পৌঁছে দিলাম।

—তাহলে তুই কি কাউকে কিছু বলেছিলি ?

—আমি বলবো কেন ?

শ্যামল চিন্তিত হয়, তাহলে ?

—কি বলছিস, বুঝতে পারছি না। আমি ঘরে ঢুকে দেখলাম, তোর গৌরী একটা অন্য লোকের সঙ্গে বসে আছে।

—অন্য লোক কে ?

—আমি কি করে চিনবো ? দেখে তো বেশ মালদার বলে মনে হল।

—চোখে চশমা ছিল ?

—হ্যাঁ, বাড়িতে ঢোকার আগে সাদা রঙের গাড়ী দেখলাম।

—তবে শালা বিনোদ।

—লোকটা ঘুঘু, চোখ টিপে আমার হাতে দুটো টাকা দিলে, যাতে না তোকে এ-সব কথা বলি। শ্যামল চুপ করে থাকে, জলিল নিজে থেকেই বলে, তোকে বলে রাখছি শ্যামল, ও-সব মেয়ে মানুষের সঙ্গে ঘর করিস না। তোকে শুধু ধোঁকা দেবে।

শ্যামল বোঝে, জলিল এখনও ভুল করছে গৌরীকে তার পোষা পাখি ভেবে। আস্তে আস্তে সব কথা সে খুলে বলে, কি ভাবে কেষ্টদার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, কেমন করে মামার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে এখানে এসে ওঠে। গৌরীর সঙ্গে কেষ্টদার সম্বন্ধ বা কি।

জলিল সব শুনে বলে, এতদিন আমায় এসব কথা বলিসনি কেন ?

—মজা দেখার জন্যে, ভাবতাম, তোরা আমায় গৌরীকে নিয়ে রগড় করিস। তাতে আর এসে-যাচ্ছে কি ?

জলিল গম্ভীর স্বরে বলে, তোর কেষ্টদা শালা বেইমান, আজ থেকে আমার এখানেই থাকবি।

—এখানে আর কে কে আছে?

—আমি, রাজীব ও মানকে। দুটো কামরা আছে, দু'জন দু'জন এক ঘরে থাকা যাবে।

—আমার জিনিসপত্র আনতে হবে যে।

—ওরা আসুক। এক সঙ্গে গিয়ে নিয়ে আসব।

শ্যামল স্নান করে জলিলের পাযজামা পাঞ্জাবী পরে নেয়। সামনের দোকান থেকে গরম তেলেভাজা আর চা এনে দু'জনে খেতে বসে।

জলিল জিজ্ঞেস করে, মোটর চালাতে জানিস?

—না।

—চটপট শিখে ফেল।

—তুই শিখিযে দিস।

—সে সব তালিম দিযে দেব। এখন শুধু ঐ কাজটাই ভাল চলছে। গাড়ী সরাতে হবে—

—তোরা সরিয়েছিস?

জলিল হাসে, রাজীবটা ওস্তাদ আছে।

—কি রকম?

—ব্রেবোর্ন রোডে একটা অফিসের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। ড্রাইভার গাড়ী রেখে ওপরে চলে গেল। রাজীব সেই ফাঁকে গাড়ীতে উঠে স্টার্ট করলে। বুদ্ধু ড্রাইভার চাবিটা সঙ্গে নিয়ে গেছে। ভেবেছিস স্টার্ট করতে পারব না। ইঞ্জিন খুলে শেলফের তার টেনে স্টার্ট করে আমরা চম্পট দিলাম।

—পুলিস ধরতে পারল না?

—ধরবে কি, তার আগেই সব পার্টস খুলে বিক্রি করে দিয়েছি।

বডিটা শুধু রাত্রে ঠেলে রেখে দিয়ে এসেছিলাম এক গলির মধ্যে, পুলিস সেটা নিয়ে গেছে। কালীর এই তো এখন সবচেয়ে বড় কাজ। আমরা তিন জন, তুইও এই দলে ভিড়ে যা।

খানিক বাদে রাজীব আর মানুকে ফিরল। কোন দোকানে গাড়ীর পার্টস বিক্রি করেছিল, আজ গিয়েছিল দাম আদায় করতে। জলিলের হাতে পঁচিশটা টাকা দিয়ে বলে, বাকীটা সামনের সপ্তাহে দেবে বলেছে।

জলিলদের নিয়ে শ্যামল গেল বেহালার বাড়ি থেকে মালগুলো উদ্ধার করতে। চিনু ছাড়া আর কেউ ছিল না।

শ্যামল হাঁক দিয়ে বললে, আমার মালগুলো নিয়ে যাবো, আপনার কাছে চাবি আছে ?

চিনু কোন কথা না বলে চাবিটা বার করে দেয়। শ্যামল দরজা খুলে জলিলের সাহায্যে বাক্সগুলো বারান্দায় বের করে আনে। জলিল ফিস-ফিস করে, ও ছুঁড়ীটা কে রে ?

—গৌরীর বন্ধু।

—খাসা জায়গায় তুই ছিলি মাইরি, জলিল চোখ টিপে ইঙ্গিত করে।

শ্যামল আর কথা না বাড়িয়ে চাবিটা চিনুর হাতে দিয়ে বেরিয়ে আসে।

কেষ্ট নিজের বাড়িতে এসে অনেকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইল। এক সময় ঘুমিয়েও পড়েছিল। জেগে উঠে দেখে, প্রায় বারোটা বাজে। তাড়াতাড়ি চান করে নেয়। আজ আশুদার কথাগুলো তার মনে নতুন চিন্তা এনে দিয়েছে। সত্যিই তো, এ ক'মাস গৌরীর কোন ব্যবস্থাই সে করেনি। উচিত ছিল এরই মধ্যে বিয়ে করা। সকালবেলা শ্যামলের সঙ্গে এই অপ্রীতিকর ঘটনার ফলে গৌরীর সঙ্গে ভালো করে কথা বলারও সময় পায়নি। এমন কি, খেতে আসবে কি না তাও

বলে আসতে ভুলে গেছে। তবে একথা ঠিক, গৌরী তাকে দেখলে নিশ্চয় খুশি হবে। প্রয়োজন হলে নতুন করে ভাত চাপিয়ে তাকে খাওয়াবে, এরকম তো আগে কত বারই হয়েছে।

কিন্তু আশ্চর্য, বেহালায় পৌঁছে কেষ্ট দেখলে, আজও গৌরী বাড়ি নেই। ঘর তালাবন্ধ। তাড়াতাড়িতে কেষ্ট নিজের চাবি আনতে ভুলে গিয়েছিল। বাড়িওয়ালার চাকরকে ডেকে জিজ্ঞেস করে এঘরের চাবি আর আছে কি না জান ?

চাকরের উত্তর দেবার আগেই চিনু ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, হ্যাঁ কেষ্টদা, গৌরী আমায় চাবি দিয়ে গেছে।

চিনুর কাছ থেকে চাবি নিয়ে দরজা খুলতে খুলতে কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, গৌরী কোথায় গেল ?

—জানি না।

—বলে যায়নি ?

—না। শুধু শ্যামল এলে জিনিসপত্র দিয়ে দিতে বলেছিল, সে নিয়ে গেছে।

কেষ্ট গম্ভীর স্বরে বলে, ও !

চিনু কেষ্টর পিছু-পিছু ঘরের মধ্যে ঢোকে, আপনার নিশ্চয় এখনও খাওয়া হয়নি ? আমি খাবার নিয়ে আসি—

—কোথা থেকে ?

চিনু হাসে, কেন, আমি রান্না করি না বুঝি ?

—তা বলিনি। গৌরী বাড়িতে খাবে না ?

—বোধ হয় না। এখনও যখন রান্না করেনি।

চিনু কেষ্টকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কেষ্ট জামা খুলে বিছানায় শুয়ে পড়ে। পাশে একটা পাঁজী ছিল, পাতা উল্টে বর্ষফল দেখে। লেখা রয়েছে অনেক রকম কথা, কিছু

ভাল কিছু মন্দ। পড়তে বেশ লাগে। দশ মিনিটের মধ্যে চিনু গরম ভাত ডাল আর মাছের ঝোল নিয়ে এল। কেষ্ট রসিকতা করে বলে, তুমি যে দ্রৌপদী দেখছি, রান্না সব সময় মজুত।

—রোজই থাকে। বলতে গিয়ে চিনুর গলা ভারী হয়ে যায়।

—কেন?

—ওর জন্যে করে রাখতে হয়।

—কে, পিনাকী? এখনও ফেরেনি?

—না। আজ আর আসবে না। চিনুর চোখ সজল হয়ে ওঠে।

কেষ্ট চিনুর দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারে ওদের মধ্যে কোন গোলমাল হয়েছে। খাওয়া শেষ হয়ে গেলে চিনু থালা-বাসন তুলে নিয়ে চলে যায়। কেষ্ট হাত ধুয়ে এসে মোড়ার ওপর বসে। একটু পরে চিনু ফিরে এল দু' খিলি পান নিয়ে। কেষ্ট হেসে বলে, ওইটেরই অভাব বোধ করছিলাম। পান দুটো মুখে পুরে সিগরেট ধরায়।

—আপনি শুয়ে পড়ুন, গৌরী হয়ত এখনি ফিরবে।

কেষ্ট মৃদুস্বরে বলে, এবার সামনের অঘ্রানে বিয়েটা করে ফেলব ভাবছি।

চিনুর চোখ চকচক করে ওঠে, খুব ভালো কথা। ঐ সময় শীত পড়বে। আমাদের কিন্তু খুব খাওয়াতে হবে কেষ্টদা।

—খাওয়াবার ভার আশুদা নিয়েছেন, সে দিক থেকে আমি নির্ঝঞ্ঝাট।

—কোথা থেকে বিয়ে হবে?

—আমার বাড়ি থেকে।

—এ জায়গাটা ছেড়ে দেবেন তাহলে?

—রেখে আর কি হবে? বলেই কেষ্টর মনে হল গৌরী চলে গেলে

সত্যি চিনু বড় একলা পড়ে যাবে। তাই বলে, তোমায় কিন্তু বেশির ভাগ সময় গৌরীর কাছে গিয়ে থাকতে হবে, নইলে ও একা থাকতে পারবে না।

চিনু কেমন যেন আনমনা হয়ে বলে, কেন পারবে না, ঠিক পারবে! যাই, ঘরে অনেক কাজ পড়ে আছে। কেষ্টর দিকে তাকিয়ে ম্লান হেসে চিনু ঘর থেকে চলে যায়।

কেষ্ট ঘুমিয়ে পড়েছিল। যখন ঘুম ভাঙলো সন্ধ্যে হয়ে গেছে। গৌরী কখন ফিরে এসে শাড়ী বদলে চায়ের জল বসিয়ে দিয়েছে, কেষ্ট জানতেই পারেনি। উঠে বসে জিজ্ঞেস করে, কখন এলে গৌরী?

—অনেকক্ষণ।

—দুপুরে খেলে কোথায়?

—গৌরী চট্ করে বলে, বেলাদির কাছে।

—কোন্ বেলাদি?

—বেলারাণী। ছবিতে খুব ভাল পার্ট করে?

—তোমার সঙ্গে আলাপ হ'ল কি করে?

—বাঃ, প্রভাতবাবু করিয়ে দিলেন যে।

মনে মনে কেষ্ট আশ্চর্য না হয়ে পারে না। গৌরীর সঙ্গে কেষ্টর কি সম্বন্ধ প্রভাত ভাল করেই জানে। তবু কেষ্টকে না জানিয়ে গৌরীকে বেলারাণীর কাছে নিয়ে গেল কি করে তাই ভাবে। মুখে বলে, বেলারাণী শুধু তোমাকেই খেতে বলেছিল, চিনুকে ডাকে নি?

গৌরী মুখে আঙুল চাপা দেয়, চুপ! এ সব কথা চিনুকে বোল না, বেচারী দুঃখ পাবে। ওর পার্ট বেলাদির পছন্দ হয়নি।

চায়ের জল ফুটে গিয়েছিল। কেষ্ট সুযোগ খোঁজে কখন গৌরীর

কাছে বিয়ের কথা পাড়বে। চা খেতে বসেই বলে, জান ত অঘ্রান মাসে প্রভাতের বিয়ে?

—শুনেছি।

—আমাদের ঐ সময়ে হলেই ভাল হয়।

—বিয়ের এত তাড়া কিসের?

কেষ্ট চোখ তুলে তাকায়, তাড়া মানে, এ ভাবে আর ক'দিন থাকা চলবে?

—মন্দ কি?

—আশ্চর্য! একটা থিয়েটারে পার্ট করেই নাটকের ভাষায় কথা বলছ।

কেষ্ট গৌরীকে লক্ষ্য করে। তার চাল-চলনে বৈচিত্র্য এসেছে। চুল বাঁধা, শাড়ী পরার ধরন, চোখে-মুখে রঙের প্রলেপ। গৌরীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কেষ্ট বলে, তুমি অনেক বদ্‌লে গেছ, শুধু কথায় নয়, সাজ-পোশাকেও।

গৌরী হেসে বলে, তুমিই তো চাইতে আমি সেজে-গুজে থাকি।

—যখন চাইতাম তখন তো করনি?

—সুযোগ পাইনি।

—এখন পাচ্ছো?

—হ্যাঁ। বেলাদির কাছে প্রায়ই যাই।

—একথা তো আমায় বলনি?

—তুমি তো জানতে চাও নি?

কেষ্টর মুখ কঠিন হয়ে ওঠে, আমি ব্যস্ত ছিলাম।

গৌরী তরল গলায় বলে, তাই বিরক্ত করিনি।

—আমি বুঝতে পারছি না গৌরী, তোমার বেলাদি কি চায়?

—আমি ছবিতে নামি।

—ছবিতে, সিনেমায়! কেষ্টর বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

—হ্যাঁ, অনেক টাকা পাওয়া যাবে।

—টাকা, টাকাটাই কি সব?

—অন্তত, তুমি তো তাই বুঝিয়েছিলে।

কেষ্ট আর কোন কথা বলতে পারে না। অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি পাকা কথা দিয়েছ?

গৌরী কেষ্টর গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে থতমত খেয়ে বলে, না, তোমার মত না নিয়ে কি আমি কথা দিতে পারি?

—তাহলে না করে দিও।

—বেশ।

কেষ্ট উঠে জামা পরে। পকেট থেকে শ্যামার চিঠিটা পড়ে যায়। কুড়িয়ে নিয়ে বলে, শ্যামা অনেক করে বলেছে ওদের গ্রামে যাবার জন্যে।

—চিনুর কাছে শুনছিলাম। ঘুরে এসো না ক'দিন।

—ভাবছি সামনের সপ্তাহে দু'-তিন দিনের জন্য যাব।

—শ্যামা তোমায় পেলে সত্যিই খুব খুশি হবে।

কেষ্ট নিজের মনেই বলে, লিখেছে ওরা সুখী হয়েছে, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না।

কেষ্ট ঠিক করেছিল সোমবার দিন শ্যামার কাছে কিশোরপুরে যাবে। মাঝে শুধু একদিন, তাও রবিবার। দোকান হাট সবই প্রায় বন্ধ। তাই গৌরীকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। যেখানে যা খোলা আছে, তারই মধ্যে পছন্দ করে কয়েকটা জিনিস কেনার জন্যে। বিশেষ করে পুজোর পর যাচ্ছে। শ্যামার জন্যে শাড়ী, জামাইয়ের জন্যে ধুতি সবই নিতে হবে। গৌরী মনে করিয়ে দেয়, ওদের বাচ্চা দুটির জন্যে কয়েকটা শার্ট-প্যাণ্ট নিয়ে নাও।

—কত বড়, মাপ তো জানি না।

আন্দাজ-মত নিয়ে নাও না।

বাজার করতে এত সময় লাগবে কেষ্ট ভাবেনি। গৌরীর জন্যে একটা শাড়ী কেষ্টর পছন্দ হয়েছিল। গৌরী কিন্তু কিনতে দিলে না। বলে, এইতো সেদিন অতগুলো শাড়ী কিনলে আমার জন্যে, আবার কেন?

বাজার সারা হলে কেষ্ট গৌরীকে নিয়ে একটা ছোট দোকানে খেতে গেল। দোকানটা পাঞ্জাবীর। ভাত, ডাল, মাংস সবই পাওয়া যায়। গৌরীর কিন্তু মোটেই ক্ষিদে ছিল না। নেড়ে-চেড়ে রেখে দিলে। কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, কি হোল, কিছু খাচ্ছ না? আগে তো বাইরে খেতে খুব ভালবাসতে।

—আজকাল আর ভাল লাগে না।

কিশোরপুর যাবার দিন কেষ্ট গৌরীকে বিশেষ করে বারণ করে যায়, আমি দু-তিন দিনের মধ্যেই ফিরব। এর মধ্যে বেলাদির কাছে তুমি যেও না। যা বলতে হয় ফিরে আসার পর হবে।

গৌরী বলে, অত বার করে বলতে হবে না। একবার না করেছ, সেই যথেষ্ট।

কেষ্ট চিনুকে বলে, গৌরী একলা রইল, তোমরা দুজনে মিলে থেকো।

চিনু উত্তর দেয়, আমি তো সব সময়েই বাড়ি থাকি।

—তা তো জানি। তাই বলছি গৌরীকে একটু দেখো।

—দেখতে দিলে তো? বলে চিনু গৌরীর দিকে তাকিয়ে হাসে। গৌরী কথাটা ঘুরিয়ে নেবার জন্যে বলে, চিনু আজকাল বড় হেঁয়ালী করে, তুমি বুঝতে পারবে না।

কেষ্ট হেসে ফেলে, তাই দেখছি দুই বন্ধুতে এমন নাটুকেপনা শুরু করেছ, আমার মাথায় ঢোকে না কিছু।

কিশোরপুর যেতে বালীচক স্টেশনে নেমে বাসে করে দশ মাইল সবং পর্যন্ত আসতে হয়। তারপর হাঁটাপথে গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে মাইল দুয়েক লাগে জানা ছিল বলেই কেষ্ট জামা-কাপড় সব-কিছু একটা বিছানার মধ্যে বেঁধে নিয়েছিল। ট্রেন বাস ছেড়ে বিছানা কাঁধে করে হাঁটতে হাঁটতে কেষ্ট সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ কিশোরপুর এসে পৌঁছয়। কেষ্ট যে আসবে চিঠি দিয়ে তা আগে জানায়নি। গ্রামে পৌঁছে ব্রজদুলালবাবুর নাম করতেই সকলে বাড়ি চিনিয়ে দিলে। কেষ্ট যে এভাবে আসতে পারে শ্যামা কোনদিনই আশা করেনি। বেরিয়ে এসে প্রণাম করে টানতে টানতে কেষ্টকে ঘরে নিয়ে যায়।

—সত্যি কাকু, তুমি এসেছ, আমি যে কি খুশি হয়েছি!

কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, ব্রজদুলাল কোথায়?

—ছেলে পড়াতে গেছেন। এখুনি আসবেন। উনি আমাদের বাড়ির সকলের কথা খুব জিজ্ঞেস করেন। কেউ একবারও এল না।

—সে কি, দাদা আসেনি?

—বাবা, মা কেউ না। তুমি প্রথম।

দুটি ছোট ছেলে ঝগড়া করতে করতে ঘরে ঢোকে, শ্যামার সঙ্গে অপরিচিত একজনকে দেখে চুপ করে যায়।

শ্যামা বলে, এ দুটি আমার ছেলে! ওরে, তোদের দাদু হয়, প্রণাম কর।

বলামাত্র ছেলে দুটি ঢিপ ঢিপ করে প্রণাম করে কেষ্টকে, কেষ্ট ব্যস্ত হয়ে বলে, বিছানাটা খুলি, দাঁড়া। এদের জন্যে জামা, কাপড়, খেলনা এনেছি। জামা গায়ে হয় কি না দেখো তো—

ছেলে দুটি উৎসাহভরে কেষ্টর সঙ্গে বিছানা খুলতে লেগে যায়।

কেষ্ট ছোট ছোট সার্ট-প্যাণ্ট বার করে বলে, প’রে দেখো তো তোমাদের হয় কি না।

বাচ্চা দুটো সেইখানেই উদোম হয়ে সার্ট-প্যাণ্ট পরতে থাকে। কেষ্ট শাড়ী-ধুতিগুলো শ্যামার হাতে দিয়ে বলে—এগুলো তোদের।

জিনিসগুলো নিতে গিয়ে শ্যামার চোখে জল এসে যায়। বলে, কাকু, তুমি আমার মুখ রেখেছ।

দাদা যে পুজোর তত্ত্বও পাঠায় নি সে-কথা বুঝতে কেষ্টর দেরি হয় না। বলে, আমার কোটের পকেটে লজেন্স আছে, ওদের দিয়ে দে।

ছেলে দুটি সহজেই কেষ্টর ভক্ত হয়ে পড়ে। জামা প’রে বলে, দেখুন কেমন দেখাচ্ছে।

কেষ্ট দেখে বলে, জামাগুলো আন্দাজ করে এনেছিলাম, বেশ গায়ে হয়েছে তো!

ব্রজদুলাল বাড়ি ফিরতে আসর আরও জমে উঠল। কোলাকুলি করে বলসে, কেষ্টবাবু, আপনার কথা শ্যামার মুখে সব সময় শুনি। আলাপ করার খুব ইচ্ছে ছিল।

শ্যামা এগিযে এসে বলে, দেখ না, কাকু কত জিনিস এনেছে।

ব্রজদুলাল মৃদুস্বরে বলে, এ সব আবার কেন? লৌকিকতা আমার ভালো লাগে না।

কেষ্ট বাধা দেয়, লৌকিকতা কি বলছো, পুজার সময় শ্যামার জন্যে শাড়ী দেব না?

—একশ’ বার দেবেন, কিন্তু আমার জন্য কেন?

শ্যামা বলে, কাকু এই এল, আর তুমি বক্তৃতা শুরু করলে?

ব্রজদুলাল হেসে ফেলে, না না বক্তৃতা দিইনি। তুমি কাকুকে বেশ কিছুদিন ধরে রাখো।

কেষ্ট আপত্তি জানায়, না না, এই বেস্পতি বারেই আমায় যেতে হবে।

শ্যামা জোর দিয়ে বলে, ছাড়লে তো। এক মাসের আগে তুমি এক পা-ও নড়তে পারবে না। ছেলে দুটিকে ডেকে বলে, মিঠু, কিটু, তোরা খবর্দার দাদুকে ছাড়িস না।

বলবামাত্রই তারা দুজন এগিয়ে এসে পল্টনের মত কেষ্টর হাত দুটো চেপে ধরে। একসঙ্গে চেঁচামিচি করে, আমরা গোরা পল্টন, কিছুতেই তোমায় ছাড়ব না।

তাদের কথার ভঙ্গিতে কেষ্ট, শ্যামা, ব্রজদুলাল তিন জনেই জোরে হেসে ওঠে।

কেষ্ট যেদিন কিশোরপুর গেল, সেই দিনই গৌরীর স্টুডিওতে যাবার কথা। বিনোদ সোমবার দুপুরে এসে গৌরীকে নিয়ে স্টুডিওতে গেছে। সেখানে বেশি সময় লাগেনি, খান কয়েক ছবি তুলে আর গলার স্বর পরীক্ষা করে বেলারাণী তাদের ছুটি দিয়েছে। তবু সন্ধ্যে না হতেই গৌরী বাড়ি ফিরে আসে। বিনোদের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তার সঙ্গে যায় না। বলে, আজকের দিনটা সাবধানে থাকি। কাল থেকে তো ফাঁকা আছি।

বিনোদ গৌরীর হাতটা ধ'রে বলে, তাহলে কিন্তু কাল ভোরেই আসব।

উত্তরে গৌরী বলে, সে তোমার যা খুশি।

বারান্দায় চিনু দাঁড়িয়েছিল। বিনোদের গাড়ী থেকে গৌরীকে নেমে আসতে দেখল, তবু কোন কথা বলে না। গৌরী নিজে থেকে বলে, জিজ্ঞেস করলি না কোথায় গিয়েছিলাম?

চিনু ঠোঁট ওলটায়; আমার কি দরকার।

—আয়, ঘরের ভেতর আয়।

—না থাক। অনেক কাজ বাকি।

—কেন, ঘরে কর্তা আছে নাকি?

চিনু দীর্ঘশ্বাস ফেলে, না।

আর কোন কথা না বাড়িয়ে গৌরী ঘরের মধ্যে ঢোকে। একবার ভাবে, বিনোদের সঙ্গে থাকলেই ভালো হত। একলা-একলা এ ঘরে কাঁহাতক বসে থাকবে। আবার রান্না করতে হবে, খেতে হবে, ভাবতেই বিশ্রী লাগে। শুধু এইটুকুই আনন্দ যে কাল থেকে সে যেখানে খুশি যেতে পারে, যতক্ষণ খুশি থাকতে পারে। এ তিন দিন কারো কাছে কৈফিয়ৎ দেবার নেই।

কেষ্টর একটা পাঞ্জাবী পেরেকে ঝুলছিল। পকেটের কাছে ছিঁড়ে গেছে, গৌরী সেটা নিয়ে সেলাই করতে বসে। মনে পড়ল তার বাবার কথা। এমনি করে সে তাঁর জামা সেলাই করে দিয়েছে। কতখানি নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি দেশে টোল চালাতেন। এতটুকু পাণ্ডিত্যের অভিমান ছিল না। অথচ কি নিদারুণ কষ্টে তাঁর শেষ জীবনটা কাটল! চোখের সামনে গৌরীর মার মৃত্যু দেখে কেমন যেন পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলেন। সে ভাবেও হয়তো দিন কেটে যেত যদি-না দেশ ভাগ হবার পর বিধর্মীরা এসে বাড়ির গৃহদেবতাকে অশুদ্ধ করার চেষ্টা করত. তিনি নিজে হাতে নারাযণকে জলে ফেলে দেন। সেই দিন থেকেই বদ্ধ পাগল হয়ে গেলেন। ক'দিন বাদেই তাঁর মৃতদেহ পাওয়া গেল নদীর ধারে, তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। পুরোন কথা ভাবতে গিয়ে গৌরীর গা ছমছম করে ওঠে। বাবার কথা ভাবলে এখন তাঁর শেষ-জীবনের অপ্রীতিকর ঘটনাগুলোই চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সেই জন্যে গ্রামের কথা, শৈশবের কথা সে জোর করে সরিয়ে রাখে। রাজেনের কথা এখনও তার মাঝে মাঝে মনে পড়ে। ছেলেটা তাকে দিয়েছিল অনেক। কিন্তু কেমন যেন অদ্ভুত! গৌরীর ভাইকে সে দুচক্ষে দেখতে পারত না। তাই উপায় থাকলেও তার অসুখের সময় কিছু সাহায্য করেনি। তা না হলে গৌরীও হয়ত ভাসতে ভাসতে এতদূর চলে আসত না!

কেষ্টর কথা মনে হতেই গৌরী অস্বস্তি বোধ করে। মানুষটা অসৎ,

কোন দিন সত্যি কথা বলে না। মুখোস খসে না পড়লে গৌরী কোন দিন ভাবতে পারত না যাকে সে এতদিন দেবতা বলে ডেকেছিল সে এতখানি হতে পারে! অথচ একথাও সত্যি, গৌরীর প্রতি সে কোন দিন অসদ্ব্যবহার করেনি। এমন কি তার জন্যে স্বার্থত্যাগও করেছে যথেষ্ট। তা না হলে দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ভাগ করল কেন? গৌরীর নিজেকে অসহায় মনে হয়। সে কেষ্টকে ঘৃণা করতে চায়, মনে-প্রাণে দূরে সরিয়ে দিতে চায়, কিন্তু পারে না। এ না পারার কারণ যে কি তা অনেক বিচার করেও গৌরী স্পষ্ট বুঝতে পারে না। তবে একথা সত্যি, কোথা থেকে কৃতজ্ঞতার ক্ষীণ সুর বেজে ওঠে, যাকে উপেক্ষা করবার সাধ্য তার নেই।

রাত্রে আর গৌরীর রান্না করা হল না। ঘরে যা সামান্য মিষ্টি ছিল তাই দিয়ে জল খেয়ে শুয়ে পড়ে।

পরদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে গৌরীব নিজেকে খুব হাল্কা মনে হয়। তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে তৈরি হয়ে নেয়। বিনোদ কখন এসে পড়বে তার ঠিক কি! চায়ের জল চাপিয়েছিল কিন্তু খাওয়া হল না, তার আগেই বিনোদের গাড়ী এসে পড়ে। গৌরী ছুটে এসে বলে, আমি কিন্তু এখনও চা খাইনি, দুমিনিট সময় দাও তো খেয়ে নিই।

—কিচ্ছু দরকার নেই, চলো, আমার সঙ্গে সব-কিছু আছে।

গৌরী আর দ্বিধা করল না, যদিও বুঝলো চিনু জানালার পর্দা ফাঁক করে সেই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। তবু ইচ্ছে করে হাসতে হাসতে তার সামনে দরজা খুলে বিনোদের পাশে গিয়ে বসলো।

গাড়ী ছুটলো জোরে, হাওড়া ব্রীজ পেরিয়ে। গৌরী জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাচ্ছি আমরা?

—চল না।

—আমার যে খিদে পেয়েছে।

—এক জায়গায় গাড়ী থামিয়ে খাবো।

গাড়ী এসে দাঁড়ালো এক বিরাট বাগানের মধ্যে।

— বাঃ, সুন্দর তো, কাদের বাগান?

—সকলের, যারা বেড়াতে আসে।

ছায়া দেখে বিনোদ জায়গা ঠিক করলো, দু'জনে মিলে ধরাধরি করে গাড়ী থেকে খাবার নামিয়ে আনে।

—একি করেছ, এত খাবার কে খাবে?

—আমরা।

—আমরা কি রাক্ষস?

কথা বলতে বলতে তারা বিলাতী দোকানের ছোট ছোট কাগজের বাক্স খুলে কেক প্যাটি বার করে খেতে শুরু করে। বিনোদ নিজেকে ঘাসের উপর এলিয়ে দিয়ে বলে, কত দিন বাদে এখানে এলাম। এর নাম বোটানিক্যাল গার্ডেন।

—কেষ্টদা একদিন এখানে আনবে বলেছিল।

—গাড়ী না থাকলে এসে কোন লাভ হয় না।

সারা দুপুর কোথা দিয়ে কেটে গেল গৌরী বুঝতে পারেনি। মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়িয়েছে, কখনও হেঁটে, কখনও গাড়ীতে, কত ফুল কত গাছ, কি সুন্দর পুকুর! বেলা চারটে নাগাদ বিনোদ বলে, চল ফেরা যাক।

—না, আর একটু থাকি।

—চল, বিকেলে একটা সিনেমায় যাবো।

—একদিনে সব করলে ফুরিয়ে যাবে যে!

—উপায় কি, তিন দিনের তো মেয়াদ, তারপর তো আবার জেলখানা।

বিনোদের পার্ক সার্কাসের বাড়িতে তারা সন্ধ্যার সময় এসে পৌঁছাল। উপরের ঘরে গৌরীকে নিয়ে গিয়ে বিনোদ বললে, তুমি শাড়ী বদলে নাও, আমি চান করে নিচ্ছি।

—এখানে শাড়ী কোথায় পাবো ?

—ডান দিকের দেরাজটা খুলে দেখো। বলে বিনোদ ঘর থেকে চলে যায়।

গৌরী দেরাজ খুলে দেখে, একটা বড় কাগজের প্যাকেট, তার উপর গৌরীর নাম লেখা, ভেতরে তিনটে সুন্দর শাড়ী। হাত দিয়েই বোঝে খুব দামী সিল্ক। তাড়াতাড়ি দরজা ভেজিয়ে লাল শাড়ীটা পরে ফেলে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখতে অবাক্ লাগে!

বিনোদ এসে দরজায় ধাক্কা না দিলে গৌরীর খেয়াল হত না, তবু আরও আধ ঘণ্টা লাগে গৌরীর সেজেগুজে বেরুতে। সত্যিই তাকে ভালো দেখাচ্ছিলো। বিনোদ বলে, কেমন মানিয়েছে বলো ত ? গৌরী আরক্ত মুখে মাথা নীচু করে থাকে।

সিনেমা দেখে ওরা গেল দোকানে খেতে, সেখানেও খুব হৈ-হৈ করে কাটলো, এক সময় গৌরী বললে, এত দামী শাড়ী পরে আমি কিন্তু বাড়ি ফিরতে পারবো না। শাড়ী বদলে তারপর যাবো।

—তোমার যা ইচ্ছে।

—সাড়ে ন'টা বাজে, চল এবার যাওয়া যাক। তোমার বাড়ি হয়ে বেহালা ফিরতে রাত হয়ে যাবে।

—তাতে কি হয়েছে ?

—বাবা ! চিন্ময়ী দেবী আছেন যে, নোট বই-এ টাইম টুকে রাখবেন।

—ওকে একটা শাড়ী দিয়ে দিও, খুশি হয়ে যাবে।

পার্ক সার্কাসের বাড়িতে ফিরে এসে বিনোদ লম্বা হয়ে খাটের উপর শুয়ে পড়ে। গৌরী মৃদুস্বরে বলে, তুমি উঠে পাশের ঘরে যাও, আমি এবার কাপড় ছেড়ে নি।

বিনোদ হাই তোলে, আমি আর পারছি না উঠতে।

—আঃ রাত হয়ে যাচ্ছে।

বিনোদ গৌরীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বলে, গৌরী, শোনো।

—কি ?

—এখানে এসো।

—লক্ষীটি, আমি কাপড়টা ছেড়ে নিই, তারপর আসছি।

বিনোদ আবদারের সুরে বলে, এসো না, তাহলেই আমি ঘর থেকে চলে যাবো।

অগত্যা গৌরী বিনোদের কাছে আসে, বিনোদ বলে, বসো।

গৌরী খাটের উপর বসতেই বিনোদ তাকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করে, গৌরী ক্ষীণস্বরে বলে, ছেড়ে দাও, রাত হয়ে যাবে।

—তাতে কি হয়েছে, একটা রাত তো ?

গৌরী আর প্রতিবাদ করতে পারে না, বিহ্বল হয়ে যায়, দেহের যে এতখানি আকর্ষণ আছে তা সে আগে কোনদিন উপলব্ধি করে নি। নিজেকে অসহায় ভাবে বিনোদের কাছে ধরা দেয়। তারই মধ্যে একবার গৌরী জিজ্ঞেস করে, আর কখন বাড়ি ফিরবো !

বিনোদ ধীরস্বরে বলে, আজ ফিরতে হবে না।

—সে কি ?

—কি হয়েছে। খুব ভোরে তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসবো, কেউ জানতে পারবে না।

সেদিন রাত্রে যে গৌরী বাড়ি ফেরেনি, সত্যিই তা কেউ বুঝতে

পারেনি। এমন কি চিনুও না। পরদিন দেখা হতে গৌরীকে বলেছিলো, কাল সারা দিন দেখা হয়নি, খুব ঘুরেছিস বুঝি ?

—তা ঘুরেছি বৈ কি।

—ভালো। চিনু আর কোন কথা বলে না, আজকাল ও গৌরীকে এড়িয়ে চলতে চায় যতদূর সম্ভব !

গৌরীর সাহস এতে বেড়েছে বৈ কমেনি। বিনোদের সঙ্গে দেখা হতেই বলেছিলো, কেউ বুঝতে পারেনি।

—সে আমি জানতাম।

—আজ কিন্তু আর নয়। যদি ধরা পড়ে যাই ?

—পড়বে কেন ? একটু থেমে বলে, সত্যি আমি আর একলা থাকতে পারছি না গৌরী !

এর পর থেকে রোজই বিনোদ গৌরীকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। সারা দিন সারা রাত কাটিয়ে ভোরবেলা বাড়ির কাছে ছেড়ে দিয়ে গেছে। এর মধ্যে কিসের যেন এক উন্মাদনা আছে। গৌরী কিছুতেই বিনোদকে বাধা দিতে পারে না।

ইতিমধ্যে কেষ্টর একটা চিঠি এসেছিল, ক'দিন আসতে তার আরও দেরি হবে। শ্যামা কিছুতেই ছাড়ছে না। বিনোদ মন্তব্য করে, শ্যামা একেবারে না ছাড়লেই তো ভালো।

গৌরী মৃদুস্বরে বলে, অন্তত দিন কয়েক তো ধরে রাখুক।

—তারপর ?

—এলে তো একদিন বোঝাপড়া হবেই।

এরই মধ্যে একদিন বেলারাণীর বাড়িতে প্রভাতের সঙ্গে দেখা। গৌরী একটা পার্ট পেয়েছে ছবিতে কাজ করার জন্য। গৌরী আজ লাল শাড়ীর সঙ্গে কালো ব্লাউজ পরে সুন্দর সেজে এসেছে। বেলারাণী

তারিফ করে বলে, বাঃ সুন্দর দেখাচ্ছে। বিনোদ, এ তো তোমার পছন্দ করা দেখছি।

বিনোদ হাসে, তোমার অজানা আর কি!

ড্রইংরুমে বসে তারা গল্প করছিলো। এমন সময় প্রভাত এসে হাজির। হাত তুলে নমস্কার করে বলে, কাল জগদীশপুরে যাচ্ছি, তাই দেখা করতে এলাম।

বেলারাণী চেষ্টা করে হাসে, কালই ?

—হ্যাঁ।

—কবে ফিরছেন ?

—এক মাস বাদে।

—তার পরই বিয়ে, বেশ আছেন। আপনারা বসুন, আমি চা আনতে বলি।

বেলারাণী উঠে গেলে প্রভাত বিনোদের সঙ্গে আলাপ করে, আপনার কি খবর বিনোদবাবু ?

—ভালোই।

—ছবি কেমন উঠছে ?

—বেলা তো সারাক্ষণই আপনার তারিফ করছে। ছবি ভালো উঠলে নাকি আপনারই লেখার কৃতিত্ব।

প্রভাত জোরে হেসে ওঠে। তাই নাকি ?

এতক্ষণে গৌরীর দিকে তার নজর পড়ে, নিখুঁত সাজে প্রথমে তাকে চিনতে পারেনি। এখন জিজ্ঞেস করে, ভালো আছেন ?

গৌরী মাথা নেড়ে সায় দেয়।

—কেষ্ট কোথায় গেছে ?

—কিশোরপুর, শ্যামার কাছে।

—কবে ফিরবে ?

—ঠিক নেই।

বেলারাণী ফিরে আসে। খানিকক্ষণ মামুলি কথাবার্তা হয়। প্রভাতের যাবার সময় হলে বেলারাণী তাকে নিয়ে বাইরের দরজার কাছে এসে কথা বলে। পার তো চিঠি দিও।

—দেবো, অরুণাকেও দিতে বলবো।

বেলারাণী অন্যমনস্ক ভাবে জিজ্ঞেস করে, তোমার নাটকের রিহার্সাল বিনোদের কোন্ বাড়িতে হ'ত। পার্ক সাকাসে কি?

—হ্যাঁ, কেন?

—গৌরীর সঙ্গে বিনোদের ঐখানেই আলাপ।

—যত দূর মনে হয়, কেন?

—পরে বলবো। গৌরীকে মুক্তার পার্ট দিলাম।

—পারবে?

—বুঝতে পারছি না, তবে চেষ্টা আছে, তাছাড়া বিনোদের তদ্বির। আমি টাকা দেবো না বলেছি। ঐ বোধ হয় দেবে আমার নাম করে। হাঁ করে কি ভাবছো?

প্রভাত দীর্ঘশ্বাস ফেলে, না কিছু না, চলি।

প্রভাত চলে গেলে বেলারাণী আবার বিনোদের সঙ্গে যোগ দেয়।

কিশোরপুরে এসে কেষ্ট উপলব্ধি করে এ ক'দিন তার বড় বেশি খাটনি গেছে। কলকাতার ব্যস্ত জীবন থেকে চলে এসে এখানকার শান্তিপ্রিয় অলস দিনগুলি তার কাছে বড় মধুর মনে হয়। সকালে ঘুম থেকে উঠে জলখাবার খেয়ে কেষ্ট ছিপ নিয়ে পুকুরপাড়ে গিয়ে বসে। কত কথা ভাবে, গৌরীর কথা। হয়তো মাছ ওঠে, হয়তো ওঠে না। ব্রজদুলাল দুপুরের দিকে এসে খবর নেয়, কিছু উঠল না কি? কেষ্ট মুখ তুলে বলে, বিশেষ কিছু নয়।

—এ পুকুরে ছিপে ধরবার মাছ নেই, জাল ফেললে রুই কাতলা উঠতে পারে। পুকুরপাড়ে বসে দুজনে গল্প করে, গায়ে তেল মেখে জলে সাঁতার কাটতে নামে। পুকুরের জল খুব পরিষ্কার না হলেও একেবারে পানা-পড়া নয়। অনেক দিন বাদে এভাবে চান করতে পেয়ে কেষ্ট খুশি হয়। বলে, কলকাতায় আর সাঁতার কাটব কোথায়, যাও-বা দু-একটা জায়গা আছে সময়ের অভাবে আর যাওয়া হয় না।

ব্রজদুলাল সায় দিয়ে বলে, বটেই তো, কলকাতা কত ব্যস্ত শহর।

—আপনি কলকাতায় বেশি যান না ?

—ন'মাসে, ছ'মাসে একবার। তাও খুব দরকার না পড়লে নয়।

—কেন ?

—ভালো লাগে না।

মিঠু আর কিটু পাড়ে বসে খেলা করছিল, জিজ্ঞেস করে, বাবা, যে কটা মাছ উঠেছে নিয়ে যাবো ?

—এখনও যাস্ নি, শীগগিরি মার কাছে নিয়ে যা।

ওরা দৌড়তে দৌড়তে চলে যায়। কেষ্ট বলে, যাই বলুন, গাঁয়ে দিনকতক বেশ লাগে। কিন্তু চিরকাল থাকতে বড় কষ্ট।

—যার যেমন অভ্যেস।

ব্রজদুলাল কথা বলে খুব শান্ত ভাবে। পাড়ে উঠে গামছা দিয়ে গা-হাত মুছে ভিজে গামছাটা পাট করে মাথায় দিয়ে বলে, চলুন এবার যাওয়া যাক।

বাড়ি ফিরে কেষ্ট দালানে বসে অর্ধসাপ্তাহিক আনন্দবাজারের উপর চোখ বুলায়। পুরোন খবর, তবু সময় কাটাবার জন্যে পড়া।

ব্রজদুলাল রান্নাঘরে চলে গিয়েছিল, খানিক বাদে বেরিয়ে এসে ডাকে, আসুন, আহার প্রস্তুত।

ভিতরের দালানে শ্যামা আসন পেতে ঠাঁই করে রাখে, দুজনে

পাশাপাশি বসে, শ্যামা নিজের হাতে পরিবেশন করে। শ্যামা বলে, তোমার ধরা মাছ রেখে দিয়েছি কাকু, রাত্রে রেঁধে দেবো।

ব্রজদুলাল বলে, সে না হয় রেঁধো। এখন কাকুকে একটু ঘি দাও না, গরম ভাতে মেখে খাবেন।

কেষ্ট তৃপ্তি করে খায়। পদের বাহুল্য না থাকলেও, আন্তরিকতা আছে। খাওয়া শেষ করে ঢেকুর তুলে বলে, খুব খেয়েছি!

শ্যামা বলে, তোমার নিশ্চয় কষ্ট হয়েছে, এখানে তো বেশি জিনিস পাওয়া যায় না। আমি ভেবেই পাই না কি দিয়ে খাবে!

ব্রজদুলাল হেসে ওঠে, খিদে দিয়ে খাবেন, ওর চেয়ে আনন্দ আর কিছুতে পাবেন না।

খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরে কেষ্ট একটু গড়িয়ে নেয়। কলকাতায় তার শোয়ার অভ্যেস না থাকলেও এখানে শুতে ইচ্ছে করে। তবে বেশিক্ষণ পারে না। দুপুরের রোদ নরম হলেই মিঠু আর কিটু এসে ঠেলা মারে, ওঠো না, বেড়িয়ে আসি। এখুনি সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

কোন রকমে এক কাপ চা খেয়ে কেষ্টকে বেরুতে হয়। শ্যামাকে জিজ্ঞেস করে, তুই যাবি না কি?

শ্যামা জিভ কেটে বলে, তুমি পাগল হয়েছ না কি কাকু, বউমানুষ বুঝি বেড়াতে যায়?

কেষ্ট হাসে, খুব গিন্নী হয়েছিস এ ক'দিনে।

মিঠু আর কিটু টানতে টানতে কেষ্টকে নিয়ে যায়। একটা শুকনো খালের ওপর দিয়ে ডিঙ্গে মেরে চলতে চলতে কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, এখানে কোন নদী নেই?

মিঠু বলে, আছে তো। কেলেঘাই নদী, বাবা, বরষায় কি বান ডাকে!

খাল পেরিয়ে অল্প দূরে যেতেই কিশোররাজার গড়। ছেলেরা

বুঝিয়ে দেয়, এই রাজার নামেই গ্রামের নাম কিশোরপুর। জায়গাটি বড় সুন্দর! কেষ্ট তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। এখান থেকে সমস্ত গ্রাম দেখা যায়। কেলেঘাইতে বান এলে ঐ জায়গাটা আরও কত সুন্দর দেখায় কেষ্ট তা সহজেই অনুমান করতে পারে। মিঠু আর কিটু খুশিমত এক-একটা জায়গা দেখিয়ে বলে, এখানে রাজার বাড়ি ছিল, এখানে মন্দির ছিল।

একটা ঢিবির উপর বসে কেষ্ট সিগারেট ধরায়। ভাবে, হয়তো সত্যিই এখানে একদিন সমারোহের অন্ত ছিল না। রাজা রাণী মন্ত্রী, সামন্তের উপস্থিতিতে এই গড় গমগম করত। আজ সেখানে ঝিঝি পোকার ডাক ছাড়া কিছুই শোনা যায় না। মিঠু বলে, জানো দাদু, এখানকার রাণী ভীষণ গরীব হয়ে গিয়েছিল। পাল্কী চড়ে ভিক্ষে চেয়ে বেড়াত।

কেষ্ট হো-হো করে হাসে, রাণী কখনও ভিক্ষে চায়, তাহলে আর তাকে রাণী বলবে কেন?

মিঠুর অভিমান হয়, তুমি তো আমার কোন কথাই বিশ্বাস করছ না। যাকে খুশি জিজ্ঞেস করে দেখো।

সারাদিন কেষ্টর বেশ ভাল ভাবেই কেটে যায়। মাছ ধরে, সাঁতার কেটে, ঘুমিয়ে, বেড়িয়ে এই অলস মন্থর দিনগুলি সে উপভোগ করে। কিন্তু সন্ধ্যে হলে কেষ্টর আর ভালো লাগে না। চারদিক অন্ধকার হয়ে আসে, হ্যারিকেন বাতি জ্বালিয়ে দাওয়ায় বসে থাকা ছাড়া উপায় থাকে না। যেদিন ব্রজদুলাল তাড়াতাড়ি ছেলে পড়িয়ে বাড়ি ফেরে, সেদিন তবু খানিকটা গল্প হয়। শ্যামা থাকে রান্নাঘরে, রাত্রের খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাইরে আসতে পারে না। মিঠু, কিটু অবশ্য কেষ্টর নিত্যসঙ্গী কিন্তু সন্ধ্যে হলে তাদের ঘুম পায়। নতুনমার কাছে খেয়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। ব্রজদুলালের

ব্যবহার কেষ্টর ভাল লেগেছে। সরল, অমায়িক, ভদ্রলোক। তবে তার জন্যে করুণা হয় এই ভেবে পৃথিবীর অর্ধেক আনন্দ থেকে সে বঞ্চিত। কূপমণ্ডুকের মত কিশোরপুরের এই ছোট্ট গাঁয়ের মধ্যে সে আবদ্ধ। এই তার পৃথিবী, এই তার সব। এক একবার কেষ্ট ভাবে, জোর করে এদের কলকাতায় টেনে নিয়ে গেলে হয়। বৃহত্তর জীবনের সাড়া পেয়ে হয়তো এদের ঘুম ভাঙতে পারে।

এক সন্ধ্যেবেলা কেষ্ট দাওয়ায় বসে এমনি কত কথা ভাবছে। ব্রজদুলাল ফিরল মাস্টারী করে। জামা খুলে কেষ্টর পাশে বসে হাঁপাতে থাকে। বলে, ওঃ, আজ বড় পরিশ্রম হয়েছে।

—কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, স্কুল তো এখন বন্ধ, এত কি টিউশানী করেন?

—আমার একটা কোচিং ক্লাশের মত আছে। যে সব ছেলেরা উঁচু ক্লাশে পড়ে, কোন কোন বিষয়ে কাঁচা, তাদেরই পড়িয়ে দিই।

—সে রকম ছাত্র ক'জন?

—অনেকগুলি আছে। শুধু আমাদের স্কুলের তো নয়, অন্য স্কুলের কয়েকটি ছেলে আসে।

—এ থেকে রোজগার ভাল হয়?

—এমনিই পড়াই। এরা গাঁয়ের ছেলে, ইস্কুলেরই মাইনে দিতে পারে না তো আবার আমায় কি দেবে?

—তবে আর ব্যাগার খাটছেন কেন?

ব্রজদুলাল হাসে, যদি এ বাঁদরগুলো মানুষ হয়।

এই ধরনের কথা শুনলে কেষ্ট বিরক্ত হয়, কি যে বুদ্ধি আপনাদের বুঝি না! পাস করে এরা করবে কি, চাকরী তো জুটবে না।

—আজকাল তাই হয়েছে বটে।

—আজকাল কেন, চিরকালই তাই। যার বুদ্ধি আছে সেই করে খাচ্ছে। এম-এ, বি-এ-দের সব চাকর রাখছে। ধরুন না একটা

ড্রাইভার, লেখাপড়া শিখেছে না ঘণ্টা! একশ' টাকার ওপর মাইনে পায়, আর পাসকরা কেরানীর মাইনে ষাট টাকা। বলিহারী লেখাপড়ার ফল—

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

—যত ব্যাটা ব্যবসাদার, সব দেখবেন বুদ্ধি খাটিয়ে রোজগার করছে! পেটে লাথি মারলে কোঁক বলবে, ক বলবে না। তবু আপনারা রাত্রি-দিন লেখাপড়া শিখিয়ে কেরানী তৈরি করবেন।

ব্রজদুলাল উত্তর দেয় না। ম্লান হাসে। কেষ্ট ভেবেছিল, হয়তো সে প্রতিবাদ করবে, না করায় নিজের মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে ওর রোখ চেপে যায়। বলে, আজকের দিনে কাকে লোকে খাতির করে, যার টাকা আছে, সে চোর হোক, জোচ্চোর হোক, চরিত্রহীন, হোক, তবু লোকে তাকে মাথায় করে নাচবে। টাকা না থাকলে আপনি যত সৎই হন, যত ভাল লোকই হন কেউ পুঁছবে না। আমাদের পাড়ায় রঘু বাঁড়ুজ্যে বলে এক শয়তান আছে। হতভাগা সব রকম ব্যবসা করে, কোনটা সৎপথে নয়। তবু তার কি খাতির, সমাজের একজন মাথা-বিশেষ।

—এ কথা তো আমি অস্বীকার করছি না—

কেষ্ট গলা চড়িয়ে বলে, অস্বীকার করবে কি, এ যে খাঁটি সত্য কথা। আজকে যারা লেখক, তারা দেখে কি করে বই বিক্রি হবে। কি করে বেশি টাকা পাবে। তার জন্যে যত রকম অশ্লীল লেখা তারা দিতে রাজী আছে। যে ডাক্তার, তার ভিজিট পেলেই হল, রুগী বাঁচল কি মরল সেদিকে দৃষ্টি নেই। উকীল ব্যারিস্টার বিধবা অসহায়দের সম্পত্তি মেরে টাকা করার চেষ্টা করছে। যে দেশনেতা সে কি করে নিজের পেটোয়া লোকদের চাকরী করে দেবে, কি করে নতুন কণ্ট্র্যাক্ট পাবে, সেই সুযোগ খুঁজছে। খবরের কাগজ কতগুলো

অবিবেচক টাকাওয়ালা লোকদের হয়ে ড্রাম পেটাচ্ছে, সিনেমায় শুধু যৌন আবেদন। এই হচ্ছে আজকের সভ্যতা, এর বাইরে থাকলে আপনি অসভ্য।

ব্রজদুলাল উঠে পড়ে, দেখি শ্যামা আজ খাবার দিতে এত দেরি করছে কেন?

কেষ্ট বোঝে, ব্রজদুলালের মত লোককে যুক্তি দিয়ে বোঝান অসম্ভব। কতকগুলো ধারণা এদের মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে, যা কিছুতেই উপড়ে ফেলা যায় না।

বৃহস্পতিবার। কেষ্ট ফেরার সব তোড়জোড় করছিল। কিন্তু শ্যামা কিছুতেই যেতে দিলে না। বলে, আবার কবে আসবে কে জানে, আরও কিছুদিন থেকে যাও।

কেষ্ট চলে আসতে চাইলেও পারেনি। মনে মনে ভাবে, সত্যিই তো, এতদিন বাদে শ্যামার সঙ্গে দেখা হল, আরও দু-একদিন থেকে গেলে যদি সে খুশি হয়, তাহলে ভালই। শুধু শ্যামার জন্যে নয়, ব্রজদুলাল আর বাচ্চা দুটির যুগপৎ পীড়াপীড়িতে কেষ্ট আরও ক'দিন থেকে যাওয়াই স্থির করল। সেই দিনই গৌরীকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেয় তার কলকাতায় ফিরতে আরও দু-একদিন দেরি হবে।

ভীমেশ্বরী বাজারের কাছে যে অস্থায়ী সিনেমা হল আছে, সেখানে দু-একদিনের জন্যে পৌরাণিক ছবি 'ধ্রুব' এসেছে। শ্যামা ধরে বসল, এই ছবিটা আমাদের দেখাও কাকু, কত দিন বায়স্কোপ দেখিনি!

কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, কেন, তোরা যাস না?

—উনি তো সময়ই পান না।

সেই দিনই শ্যামা আর বাচ্চাদের নিয়ে কেষ্ট বাজারে ছবি দেখতে গেল। খড়ের চালের সিনেমা-হল। সামনে সতরঞ্চি, তারপর বেঞ্চি। পেছনে চেয়ার। আট আনা দামের টিকিট করে কেষ্টরা চেয়ারে বসে।

মামুলী পৌরাণিক ছবি, তবু দেখতে মন্দ লাগে না। এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। শ্যামা দূরে থেকে চিনিয়ে দেয়, ওর নাম নিতাই দাস। এই সিনেমাটা ওর—

—তাই না কি? বড়লোক বুঝি?

—হ্যাঁ! কি করে টাকা পেয়েছিল পরে বলব।

ছবি শেষ হলে বাড়ি ফেরার পথে শ্যামা নিতাই দাসের পরিচয় দেয়, বলে, ওর বাবা যখের ধন পেয়েছিল।

—সে আবার কি?

—নিতাই দাসের বাবা বুড়ো দাস মশাই একদিন ভীমা মায়ের পুকুর থেকে এক যক্ষকে উঠতে দেখলেন। শুনলেন বড় বড় ঘড়ার শব্দ। উনি তো খুব বিচক্ষণ লোক ছিলেন, বুঝতে পারলেন নিশ্চয় ওখানে যখের ধন আছে। তাড়াতাড়ি কাছে পিঠে যা নোংরা জিনিস ছিল তাই ছুঁড়ে ছুঁড়ে ঘড়াগুলোকে অপবিত্র করে দিলেন। যক্ষ তখন ঘড়া ফেলে জলের মধ্যে চলে গেল। দাস মশাই সারা রাত ধরে এক একটা ঘড়া মাথায় করে বাড়িতে নিয়ে এলেন। সত্যি কাকু, বুড়োর মাথায় নাকি একদিনে টাক পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরদিন সকালবেলাই মুখে রক্ত উঠে বুড়ো ম'ল! এই নিতাই দাস। পেল যক্ষের ধন, সেই থেকে এরা বড়লোক।

কেষ্ট হাসে, যত সব গাঁইয়া গল্প।

মিঠু ফোড়ন কাটে, নতুনমা, দাদু কোন কথা বিশ্বাস করে না, সব তাতে হাসে।

গল্প করতে করতে তারা যখন বাড়ি ফিরল তখন ব্রজদুলাল খাতা কলম নিয়ে কি লিখছিল। জিজ্ঞেস করে, কেমন লাগল? ছেলেরা ছুটে গিয়ে বাবাকে গল্প শোনাতে শুরু করে। এক সময় কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, নিতাই দাসের বাবা যখের ধন পেয়েছিল?

—ওই রকম কিংবদন্তী আছে।

—আসল ব্যাপারটা কি ?

বুড়ো নুনের ব্যবসা করে টাকা করে। গান্ধীজি যখন বিলাতী নুন 'বয়কট' করলেন ও তখন মাথায় করে নুন নিয়ে বিক্রি করে বেড়াত! লোকটা ছিল এক নম্বর সুবিধাবাদী, একই সঙ্গে বিলিতী কাপড় আর দিশি নুনের ব্যবসা চালিয়েছিল বেনামে।

—তাইতেই ওর টাকা। তবে নিতাইটাও লোক ভাল নয়।

—কেন ?

—টাকা টাকা করে পাগল। সিনেমা খুলে রাজ্যের খারাপ বই এনে দেখায়, জমিদার হিসেবেও দুর্নাম করেছে যথেষ্ট! সেদিন আপনি যে সুবিধাবাদী কৃতী লোকদের কথা বলছিলেন, তাদেরই একজন।

—লেখাপড়া শিখেছিল ?

—না।

—তবেই দেখুন, পয়সা করেছে তো ?

—বদনামও।

—তাব মানে ?

—পঞ্চাশের কোঠা পেরিয়ে গেছে, তবু লিপ্সার শেষ নেই। গাঁয়ের কত কুমারী এবং বিবাহিতা মেয়ের সর্বনাশ করেছে, তার ইয়ত্তা নেই।

—তবু তো লোকে তাকে খাতির করে ? তবু তো সে সুখে আছে।

ব্রদদুলাল উঠে পায়চারী করতে করতে বলে, লোকে তাকে খাতির করে নিশ্চয়, যত দিন টাকার খাতির থাকবে ও খাতির পাবে। কিন্তু সুখে আছে বলা যায় না।

—কেন ?

—ওর একটি ছেলে আর একটিই মেয়ে। মেয়েটির পনের বছর বয়সে অবৈধ সন্তান হয়, সে আত্মহত্যা করে। তারপর থেকে ওর

স্ত্রী পাগল। ছেলেটা বদসঙ্গে মেশে, এখনই কত রকম রোগে ভুগছে—এ থেকে কি সুখ-শান্তি থাকে?

কেষ্ট উত্তর দিতে পারে না। ব্রজদুলাল বলে যায়, কেষ্টবাবু, একেই বলে ভগবানের চাবুক। মোক্ষম মার, কেউ এড়াতে পারে না।

—আপনাদের ভগবানও তো কম খোসামুদে নয়, সেই যে বিপদ! তাঁকে ঘুষ দিয়ে নিতাই দাসরা বেশ মার এড়িয়ে যায়। আর ভগবানের চাবুক গিয়ে পড়ে নিরীহ মানুষদের ওপর, এর দৃষ্টান্তও কম নেই।

ব্রজদুলাল খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, যে রকম চোখের সামনে দেখা যায় তাতে আপনার কথাগুলো খুব সত্যি সন্দেহ নেই। মিথ্যেরই যেন জয়জয়কার আমাদের দেশে। কিন্তু কেন তা ভেবেছেন কি? আমরা মনুষ্যত্ব হারিয়েছি, আমরা আর মানুষ নই।

—তার মানে?

ব্রজদুলাল ঘন ঘন মাথা নাড়ে, ইংরেজ রাজত্বে আমরা শিক্ষা পাইনি। তখন দু'পাতা ইংরিজী পড়তে শিখে লোকে বড় পণ্ডিত বলে পরিচিত হত, এর চেয়ে মিথ্যে আর কি থাকতে পারে? আমি জানি, আমার ঠাকুর্দা টোলের পণ্ডিত ছিলেন, লোকে তাকে মুখ্যু ঠাওরালে, আর আমার কাকা শুনেছি ছোটবেলায় চিরকাল বখামি করে ইংরিজী বুলি আউড়ে এই গাঁয়েরই মস্ত পণ্ডিত ব্যক্তি হয়ে উঠলো। এইখানেই যে সবচেয়ে বড় গলদ, সেদিনের বিষ প্রয়োগের ফল আজ ফলেছে। আজকের ছেলেরা না জানে বাংলা, না জানে ইংরিজী। লিখতে শেখেনি। ময়নার মতো কতকগুলো বুলি আওড়ায়।

কেষ্ট কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে শোনে।

—এদের মনুষ্যত্ব বলে কিছু নেই। তাই এরা ওষুধে বিষ মেশায়, খাবার চালে কাঁকর দেয়। সব রকম উপায়ে লোক ঠকায়, কারণ তারা বুঝতেই পারে না ভবিষ্যতের ফল। আপনি

ঠিক বলেছেন তারা বোঝে টাকা, কিন্তু এদের ভরসায় থাকলে তো চলবে না—

কেষ্ট এবার হেসে ওঠে, এরাই তো আমাদের চালাচ্ছেন, আমরা ভেড়ার পালের মত এদের ইঙ্গিতে চলেছি।

ব্রজদুলালের মুখ কঠিন হয়ে ওঠে, এ চলবে না। সব ভাঙ্গবে, ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।

কেষ্ট ব্রজদুলালের মুখে এ ধরনের কথা শুনবে আশা করেনি। নির্বাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে, উত্তেজনায় তার মুখ কেঁপে কেঁপে উঠছে।

—মানুষ চোর, জোচ্চোর, সুবিধাবাদী এমনিতে হয় না কেষ্টবাবু, মনুষ্যত্ব হারালে তবে হয়। আমাদের দেশের সমস্যা খাদ্য নয়, বস্ত্র নয়; সমস্যা হল মানুষ কমে যাচ্ছে, পশুর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। তাই আমাদের আজ মানুষ তৈরি করতে হবে।

মিঠু আর কিটু দুজনে কেষ্টর পেছন থেকে উঁকি মেরে বাবাকে দেখছিল। ব্রজদুলাল তাদের দেখিয়ে বলে, এদের বয়সী ছেলেরাই এখন আমাদের ভরসা। মিঠু কিটুদের যদি মানুষ তৈরি করতে পারেন আজ থেকে বিশ বছর বাদে দেখবেন দেশের চেহারা বদলে গেছে। এদের সত্যিকারের শিক্ষা দিতে হবে, তার জন্যে চাই যথেষ্ট আত্মত্যাগ। আসবেন আপনারা শহর ছেড়ে গাঁয়ের মধ্যে?

কেষ্ট এতক্ষণে কথা বলে, আমাদের দিয়ে আর কি হবে? লেখাপড়া করিনি, বিদ্যে-বুদ্ধি কিছুই নেই।

—ঐখানেই তো ভুল করছেন। পাস করলেই জ্ঞান হয় না, আপনি যা বলেন খুব কম পাস-করা লোকের মুখে একথা শুনেছি। যদি সত্যি আজকের দেশের অবস্থা দেখে প্রাণ কাঁদে, চলে আসুন এখানে। আমাদের এই ছোট্ট শিক্ষায়তন-এর আদর্শে যা পারেন যোগ দিন। এখনো এখানে ড্রিল শেখানো হয় না। দরকার তাদের স্বাস্থ্যের

দিকে নজর দেওয়ার। তাদের খেলাধুলো শেখান কোনদিন হবে না।

শ্যামা এসে না পড়লে কথা হয়তো আরও চলতো। বলে, আবার বক্তৃতা শুরু হয়েছে তো, অমন করলে কাকু পালিয়ে যাবে।

ব্রজদুলাল নিজেকে সামলে নেয়, মাস্টারী করে এই বদ অভ্যাস হয়েছে, বড় বকবক করি।

লেকের পাড়ে সাঁতার কেটে উঠে জলিল আর রাজীব জামা-কাপড় পরছিল। সন্ধ্যে হয়ে গেছে, শ্যামল রেলিং-এর ওপর বসে সিগারেট টানে। একটা গাড়ী পার্কিংএ দাঁড়ায়, হেড লাইটের আলো ওদের গায়ের উপর এসে পড়ে।

জলিল দাঁত চেপে বলে, এ শালাদের জ্বালায় কাপড় ছাড়া আর যাবে না দেখছি।

রাজীব ফোড়ন কাটে, ওদিকে নজর না দিলেই হল। আমাদের যা খুশি করব, লেকটা তো কারুর বাপের সম্পত্তি নয়।

শ্যামল ইচ্ছে করে চেঁচিয়ে বলে, এই রাজীব, ভদ্রলোকের বাপ তুলছিস কেন মিছিমিছি।

—বেশ করেছি, তোর কি?

গাড়ীর চাবি বন্ধ করে ভদ্রলোক একটি মেয়েকে নিযে সাঁতারের ক্লাবের দিকে যান। শ্যামল আড়চোখে দেখে মন্তব্য করে, স্বামী-স্ত্রী না কি?

—সে খোঁজে তোর দরকার কি? ব্যাগ নিয়ে গেল, এখুনি বোধ হয় জলে নামবে—

জলিল এতক্ষণে কথা বলে, পয়সাওয়ালা লোক রে, নতুন হিলম্যান চেপে এসেছে।

তিনজনে গাড়ীটা দেখে। শ্যামল হঠাৎ বলে, চাকার হাফ ক্যাপ-গুলো খুলে নেব ?

—নে না। আমরা নজর রাখছি।

মিনিট পাঁচেকের বেশি লাগে না। শ্যামল পকেট থেকে একটা চাড় দেবার যন্ত্র বের করে হাফ ক্যাপ চারটে খুলে নেয়। পাশেই জলিলদের পুরাতন মডেলের ভাঙ্গা স্ট্যাণ্ডার্ড গাড়ীটা দাঁড়িয়েছিল। তারা জিনিস নিয়ে গাড়ীতে করে চম্পট দেয়।

রাজীব বলে, বেশ রগড় হবে মাইরি! ভদ্রলোক তো খুব চাল মেরে মেয়ে নিয়ে জলে সাঁতার কাটতে গেল। ফিরে এসে দেখবে হাফ ক্যাপ গন্, একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসবে।

জলিল গাড়ী চালাতে চালাতে বলে, কিছুই নয়। ইন্সিওরেন্সের থেকে কান মুলে টাকা আদায় করবে।

শ্যামল দুটো হাফ ক্যাপ দু'হাতে নিয়ে খঞ্জনীর মত বাজাচ্ছিল। জিজ্ঞেস করে, এখন কোথায় যাবি ?

—গ্যারেজে, কালী থাকবে।

—মিটিং না কি ?

—হ্যাঁ। দেবেনের সঙ্গে সাফ কথা বলতে হবে।

গাড়ী গিয়ে ঢুকলো ঢাকুরিয়ার এক মেঠো রাস্তার ভেতর। গাছপালায় ঢাকা ভাঙ্গা গ্যারেজ। বাইরে থেকে পোড়ো জমি বলে সন্দেহ হয়। ইটের উচু পাঁচিল, মরচে-পড়া টিনের গেট।

শ্যামলরা ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। কালী আগে থেকে এসেই খাটিয়ায় বসে ছিল। জিজ্ঞেস করে এত দেরি যে ?

জলিল উত্তর দেয়, লেকে চান করে নিলাম।

রাজীব বলে, শ্যামল হিল্‌ম্যানের চারটে হাফ ক্যাপ খুলে এনেছে।

—নতুন ?

—হ্যাঁ।

—ভালো দাম পাওয়া যাবে। এ জায়গাটা কেমন রে জলিল?

—ভালো, রাজীব তো এখানেই থাকে। বলছে, কোন গোলমাল নেই।

—পাড়ার লোকরা কেমন?

রাজীব উত্তর দেয়, বেশি আলাপ হয়নি। দূরে দূরে বাড়ি, সবাই চুপচাপ থাকে।

—তা হলেও বেশি দিন থাকা ভালো নয়। দু' মাসের মধ্যে নতুন জায়গা ঠিক কর। গন্ধ পেলেই পুলিস আসবে।

জলিল তাচ্ছিল্যভরে বলে, গন্ধ পেলে তো! সেই শোভ্রলে গাড়ীটা মনে আছে? রং পাল্টে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিলাম—

—তবু সাবধান হযে থাকা ভালো।

দেবেনদা এসে ঢোকেন। সকলে খাতির করে খাটিয়ায় বসতে দেয়। দেবেনদা জুতো খুলে ভালো করে বসেন। শ্যামলকে দেখে বলেন, কি খবর, তোমাকে তো বহুদিন বাদে দেখছি।

কালী উত্তর দেয়, কেন, এখন তো ও আমার কাছেই রয়েছে।

—তাই নাকি? আমার ওখানে তো যায় না।

শ্যামল ব্যাজার মুখে বলে, সময় পাইনি। অনেকগুলো ঝামেলায় ছিলাম।

—একদিন চুণীলাল আর মদন এসে কি বলছিল।

—কি?

—তোমাকে না কি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

চুণীলাল ও মদনের নাম শুনেই শ্যামল তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে, আমাকে তাড়িয়েছে তো ও শালাদের কি?

এত বিশ্রী ভাষায় তাঁর মুখের উপর কথা বলবে দেবেনদা ভাবেন নি। বলেন, সংযত হয়ে কথা বল, শ্যামল!

কালী মাঝখান থেকে চেঁচিয়ে ওঠে, ওর কথা পরে হবে দেবেনদা, এখন কি ঠিক করেছেন বলুন।

দেবেনদা একটু চুপ করে থেকে বলেন, কিছুই ঠিক করিনি!

—তাহলে পার্টি ভেঙ্গে দিন।

—কেন?

—কি করে চলবে, টাকা চাই, টাকা—

—হুঁ, ভাবছি চাঁদা তুলে—

—কে চাঁদা দেবে?

দেবেনদা বিস্ময় প্রকাশ করেন, তবে কি করবে?

কালী অম্লান বদনে হাসে, গয়নার দোকানে এত গয়না আছে, ব্যাঙ্কে এত টাকা আছে।

দেবেনদা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, না, না, অসম্ভব!

—কেন অসম্ভব? দেশের ভালোর জন্যেই তো খরচা করা হবে।

—তোমার কি ইচ্ছে ঠিক স্পষ্ট করে বলো।

—সামনের ইলেকশানে দাঁড়াবেন বলেছিলেন। আমরা ভাবলাম, আপনি দাঁড়ালে আমাদেরও সুবিধে হবে, সে সব গেল—

দেবেনদা বাধা দেন, কেন, ইলেকশানে তো আমি দাঁড়াবো।

—দাঁড়াবেন তো টাকা কোথায়?

—টাকা কি হবে? দেশের লোকের কাছে আমি আবেদন করব। এত বছর যাদের জন্যে জেল খেটেছি, সারা জীবন যাদের জন্যে উৎসর্গ করেছি, তুমি কি ভাবছো তারা আমায় ভোট দেবে না?

কালী মুখ বিকৃত করে, ওরকম জেলখাটা লোক রাস্তায় অনেক ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ইলেকশানে টাকা দিয়ে ভোট কিনতে হয় দাদু, এমনিতে হয় না।

—তাহলে আমি দাঁড়াবো না—

—তাই তো বলেছি। আপনাকে ঘড়া ঠিক করে কি বুদ্ধুই বনেছি। শালা পয়সা ঢাললে আপনাকে সব চেয়ে বেশি ভোট পাইয়ে দিতাম, গাড়ী বাড়ি নিয়ে হাঁকিয়ে বসতেন, এমন চটী পায়ে ঘুরে বেড়াতে হত না—

দেবেনদা অস্থির হয়ে ঘন ঘন পায়চারী করেন, তাই বলে এই হীন উপায় ?

—সব সময় সাধু হলে চলে না। জেলে ঘুরলেই যদি ইলেকশান জেতা যেত, তাহলে ইদ্রিস তো দশ বারের বেশি জেল খেটেছে—

দেবেনদা ছাড়া সকলে হো হো করে হেসে ওঠে। এই ক'দিন আগেই ইদ্রিসকে পকেট মারার জন্য পুলিসে ধরেছে। দেবেনদা ঘন ঘন মাথা নাড়েন, ঠাট্টা নয় কালী, এসব বিষয় নিয়ে ঠাট্টা করা উচিত নয়।

—তাহলে একটা ব্যবস্থা করুন। আমি তো আপনাকে গরীবের টাকা কাড়তে বলছি না ! যারা দেশের টাকা নিয়ে মজা লুটছে তাদের টাকা নিয়ে যদি দেশের কাজ করেন তো আপনাকে সকলেই জয়জয়কার করবে।

নিরুপায় দেবেনদা ক্ষীণস্বরে বলেন, মনে রেখো আমার আদর্শ—

—সে বলতে হবে না। আপনি দেখুন—

দেবেনদা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন, তাহলে আমার বলার কিছু নেই।

—আপনি ভোটে জিতবেনই। দেবেনদার মত জোর করে আদায় করে কালী নিশ্চিত হয়। জলিলকে বলে; গাড়ী করে দেবেনদাকে বাড়ী পৌঁছে দিতে।

দেবেনদা চলে গেলে রাজীবকে জিজ্ঞেস করে, মেয়ে ঠিক হয়েছে ?

—হ্যাঁ, রাজীব উত্তর দেয়।

—কাল দেবেনদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে হবে। ওকে সামনে রেখে কাজ হাসিল করব, কিন্তু মেয়েটা ঠিক তো ?

—দেখলেই চিনতে পারবে।

—ঠিক আছে।

শ্যামল এতক্ষণ এদের আলোচনায় যোগ না দিয়ে নিজের কথাই ভাবছিল। দেবেনদা চুণীলালের কথা বলতে সে বোঝে, চুণীলালই ওঁর কাছে চুকলী কেটেছে। তবে কি মামার বাড়িতেও ওরা গিয়েছিল! আশ্চর্য নয়, চুণীলাল ছেলেটা একরোখা আর বদরাগী, হয়তো ও গিয়ে মামার কাছে লাগিয়েছিল। মনে মনে ভাবে, মদনের বাড়ি গিয়ে এর ফয়শালা করে আসবে।

সেইদিনই বিকেলে শ্যামল মদনের পাড়ায় যায়। আড্ডা-সঙ্ঘের পাথরে মন্থুদা বসেছিল। শ্যামলকে দেখে হেসে জিজ্ঞেস করে, কত দিন বাদে, কি খবর তোমার?

—ভালো। মদন কোথায়? ওর কাছেই এসেছি।

—ভালোই করেছো, কার কাছে শুনলে?

—শ্যামল বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে যায়।

—শোনো নি, মদনের বাবা মারা গেছেন?

—কবে?

—পরশু।

শ্যামল শুধু বলে, ওঃ।

—বাড়িতে বোধ হয় মদন নেই, একটু আগেই গাড়ীতে করে বেরিয়ে গেল।

—তবে আর এখন গিয়ে কি করব?

—পার তো সকালের দিকে এসো।

—তাই আসবো।

শ্যামল মন্থুদা'র পাশে বসে পড়ে, আপনার কি খবর মন্থুদা?

—ভালো নয় ভাই!

—কি হল ?

—নন্দিতার বাবা ওর বিয়ের সব ঠিক করে ফেলেছেন।

—তাই না কি ?

—দোসরা অঘ্রান বিয়ে।

—সে কি, তারিখ ঠিক হয়ে হয়ে গেছে ? কার সঙ্গে ?

মন্টুদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কে জানে, বড় লোক কেউ হবে !

—নন্দিতা চিঠি দেয়নি ?

—ক'দিন তাও বন্ধ। নন্দিতা বাড়ি থেকে বারই হয় না। এদিকের জানালা-দরজা দেখছো না, সব বন্ধ থাকে। শ্যামল সমবেদনা প্রকাশ করে, তবে তো খুব মুস্কিল !

—তোমরা কখনো প্রেমে পড়ো না ভাই! এ বড় বিশ্রী কষ্ট, সবাইকে জ্বালিয়ে মারে। আমাদের মতো লোকের জন্যে এ-সব নয়। বাড়ি গাড়ী থাকলে দেখতে নন্দিতার বাবা আমার পেছনে ছুটে বেড়াতো। সবই টাকা ভাই !

মন্টুদার কথা শুনে শ্যামলের সত্যি মন খারাপ হয়ে যায়। বলে, আমাদের দিয়ে যদি কিছু হয়তো জানাবেন।

মন্টুদা ম্লান হাসেন, বলেন, এসো মাঝে মাঝে।

বেলারাণীর কাছে কনট্রাকট পেয়ে অবধি গৌরী দু'দিন স্টুডিওতে গিয়েছে কাজ করতে। কেষ্ট এখনও ফেরেনি। হয়তো দু'চার দিনের মধ্যে ফিরবে। গৌরী কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। মন থেকে কেষ্টকে সে জোর করে সরিয়ে দিয়েছে। বিনোদের সঙ্গে পা মিলিয়ে তাকে চলতেই হবে। যদি সে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চায়, নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। বেলারাণীই এখন তার আদর্শ। এক একবার মনে হয়েছে বটে, এমন ভাবে চললে কেষ্ট হয়তো দুঃখ পাবে।

হয়তো গৌরীর প্রতি ঘৃণায় তার মন ভরে যাবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নতুন জীবনের অদ্ভুত উন্মাদনায় তার মন আশা-আকাঙ্ক্ষায় ভরে ওঠে। বিনোদ যে জীবনের স্বাদ তাকে একদিন দিয়েছে কেষ্ট তা কোন দিনই দিতে পারবে না। গৌরী স্টুডিওতে যায়, বিনোদের সঙ্গে নতুন নতুন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়, তারই সঙ্গে রাত কাটায়। বেহালার বাড়িতে সে কোন দিন ফেরে, কোন দিন ফেরে না। চিনুর সঙ্গে তার খুব কম দেখা হয়। আগে যাও-বা দু-একটা মৌখিক আলাপ হত, এখন সেটা শুধু হাসিতে দাঁড়িয়েছে। তবে তারই মধ্যে একদিন সামান্য আলাপ হয়েছিল। চিনুর মুখটা গৌরীর সামনে ভেসে ওঠে, তুমি শুনলাম স্টুডিওতে যাচ্ছো ?

—হ্যাঁ, একটা ছোট কাজ পেয়েছি।

—কনগ্র্যাচুলেশান !

—ধন্যবাদ।

—কেষ্টদা কবে ফিরবে ?

—জানি না।

—তুমি কোন চিঠি লেখনি ?

—না।

গৌরী যে আজকাল প্রায়ই রাত্রে বাড়ি ফেরে না সে নিয়ে চিনু কিছু বলেনি। একবার বলেছিল, তোমায় আজকাল আগের চেয়ে আরও সুন্দর দেখতে হয়েছে।

গৌরী হেসে বলে, আমার কোন কৃতিত্ব নেই, সব এই শাড়ি আর ব্লাউজের।

—অনেক দাম, না ?

—তা তো হবেই, বিনোদের পছন্দ।

—সে তো বুঝতেই পারছি।

সেদিন গৌরী নিজের থেকেই বলে, একটা কথা রাখবি চিনু—

—কি বল্‌।

কেষ্টদা ফিরলে তুই ওকে সব কথা খুলে বলিস—

—তোমার বলাই তো ভাল—

গৌরী মাথা নাড়ে, আমি বলবো না। ও কি বলে আমায় জানাস।

চিনু অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, তোমার যা ইচ্ছে।

কেষ্ট মাত্র তিন দিনের জন্যে শ্যামার কাছে কিশোরপুর গিয়েছিল বটে, কিন্তু বারো দিনের আগে কিছুতেই সেখান থেকে বেরুতে পারল না। রোজই একবার করে সে কলকাতা ফেরার তোড়জোড় করেছে কিন্তু মিঠু, কিটু এবং তাদের নতুনমার জন্যে হয়ে ওঠেনি। শেষ পর্যন্ত ব্রজদুলালই তার ফেরার পথ সুগম করে দেয়। বলে, সত্যিই যদি ওনার কলকাতায় কাজ থাকে, মিছিমিছি আটকে রাখা উচিত নয়।

শ্যামা বলেছে, আমি মিছিমিছি ধরে রেখেছি না কি? কাকু কলকাতায় ফিরে গেলে আর কি আসবে ভেবেছো?

—কেন আসবেন না, নিশ্চয়ই আসবেন, দরকার হলে আমরাও যাবো।

কেষ্টকে বিদায় দেবার সময় শ্যামার চোখ ছলছল করে, পরেরবার কিন্তু খুড়িমাকে সঙ্গে নিয়ে আসবে। ব্রজদুলাল ছাড়লে না, কেষ্টর বিছানা ঘাড়ে করে নিয়ে বাস-স্টাণ্ডে তুলে দিতে চললো। কেষ্ট অনেক আপত্তি করেও তাকে নিরস্ত করতে পারেনি। এ ক'দিনেই কেষ্ট বুঝতে পেরেছিলো শ্যামার কথা কতখানি সত্যি। এ গ্রামের ছেলে বুড়ো সকলেই ব্রজদুলালকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। রাস্তায় দেখা হলেই হাত তুলে নমস্কার করে। বলে, কোথায় চললেন মাস্টার মশাই?

— কোথাও যাইনি ভায়া, এঁকে বাসে তুলতে যাচ্ছি। ব্রজদুলাল

নিজের মনেই বলে, এদের ছেড়ে কি শহরে যাবার উপায় আছে? কেষ্ট কোন উত্তর দেয় না। ব্রজদুলাল এক সময় জিজ্ঞেস করে, মনে আছে তো সেদিন যা বললাম?

—কি?

—একজন মাস্টার খুঁজছি, যে শরীরচর্চা শেখাবে, অথচ নীচু ক্লাসে পড়াতে পারবে।

—মাইনে?

—বলেছি তো, মোটা-ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না।

অন্যমনস্ক স্বরে কেষ্ট উত্তর দেয়, দেখবো।

ট্রেনে সারাক্ষণ কেষ্টর কলকাতার কথা মনে হয়েছে। পূজার হিসাব মেলানো, ব্যবসায় আবার মন দেওয়া, বাড়িতে রান্নার সুব্যবস্থা করা, কত কাজ পড়ে রয়েছে। মনে মনে ভাবে, শ্যামাটা আব্দার করে অনেক দিন ধরে রেখেছিলো, আগে চলে এলেই ভালো হ'ত। অথচ কি আশ্চর্য, কিশোরপুরে থাকতে একদিনও একথা মনে হয়নি। কলকাতার কথা ভাবতেই কেমন যেন ব্যস্ততা আপনা থেকেই এসে যায়। সকলের চেয়ে বড় কথা—কলকাতায় গিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। গৌরীর কথা মনে হতেই কেষ্ট অস্বস্তি বোধ করে, ও নিশ্চয় খুব অভিমান করেছে। তিন দিনের জন্যে বেরিয়ে, বারোদিন হয়ে গেলে কোন্ মেয়ে না রাগ করবে? কেষ্ট কিশোরপুর থেকে তিনখানা চিঠি লিখেছিলো কিন্তু গৌরীর কাছ থেকে কোন উত্তর পায়নি।

কল্পনার জাল বুনে আর মিথ্যে স্বপ্ন দেখে যে ছেলেরা আনন্দ পায়, কেষ্ট মোটেই সে দলের নয়। তবু বিয়ে সম্বন্ধে কেমন যেন তার দুর্বলতা আছে! আর-কিছু না হোক, রসুনচৌকি না বাজলে বিয়ে বলে মনেই হয় না। তাছাড়া পাত পেড়ে খাওয়ার ব্যবস্থা। এ দুটো তাকে করতেই হবে।

কলকাতায় পৌঁছে কেষ্ট রিক্সা করে বাড়ি ফেরে। বলরামদের দরজা খোলা ছিল। কি মনে হল, কেষ্ট দাদার বাড়িতে ঢুকে ডাকাডাকি করে। বৌদি শুকনো মুখে বেরিয়ে আসে, কি হয়েছে ঠাকুরপো!

কেষ্ট হাসে, আমাকে দেখলেই ভয় করে বুঝি? না, হয়নি কিছু।

—তবে?

—এই মাত্র শ্যামার কাছ থেকে আসছি।

—কিশোরপুর থেকে?

—হ্যাঁ, ক'দিনের জন্যে গিয়েছিলাম, দিন-বারো কাটিয়ে এলাম। শ্যামা কিছুতেই আসতে দেবে না।

বৌদির মুখে হাসি ভরে ওঠে, ও যে তোমায় খুব ভালোবাসে।

—পুজোর কাপড়-জামা নিয়ে গিয়েছিলাম।

বৌদির চোখে জল আসে, বড় ভালো করেছ ঠাকুরপো, আমাদের কিছুই পাঠানো হয়নি। তোমার দাদা যে এ-সব বোঝেন না।

বৌদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শ্যামাদের সব কথা শোনে, মিষ্টি, ফল না খাইয়ে কেষ্টকে ছাড়ে না। বলে, পুজোর ক'দিনই শ্যামার জন্যে যে কি রকম মন কেমন করেছে, বলতে পারি না।

বাড়ি গিয়ে মুখ-হাত-পা ধুয়ে জামা-কাপড় বদলে কেষ্ট বেহালার বাস ধরে। না জানিয়ে আনন্দ আছে, গৌরী কি ভাবে, তার সঙ্গে কথা বলবে ভাবতেই কেষ্টর মজা লাগে। দোকান থেকে বেলফুলের মালা কিনেছে, গৌরী খোঁপায় জড়াতে ভালোবাসে।

কিন্তু বাইরে থেকে গৌরীর ঘর অন্ধকার দেখে কেষ্ট অনেকখানি দমে যায়। বারান্দায় উঠে চিনুকে ডাক দেয়। চিনু ঘরে আছ নাকি?

—কে, কেষ্টদা, বলে সাড়া দিয়ে চিনু বেরিয়ে আসে, কখন এলেন?

—এই মাত্র। গৌরী কোথায়?

—বেরিয়েছে। দাঁড়ান, দরজাটা খুলে দিই।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে আলোর তলায় চিনুর মুখ দেখে কেষ্ট বিস্মিত হয়, কি হয়েছে চিনু?

—না, ভালোই আছি।

—চোখের তলায় কালি, শুকনো চুল?

কথা ঘোরাবার জন্যে চিনু জিজ্ঞেস করে, কি আনবো বলুন না?

—শুধু চা খেতে পারি! আর কিছু না। তবে ব্যস্ত হচ্ছ কেন, গৌরী ফিরুক।

—তখন না হয় আর-এক কাপ খাবেন। বলে চিনু চা করতে চলে যায়।

কেষ্ট হাতের মালাটা তাকের উপর রাখে, মনে মনে ভাবে, গৌরী ফিরে এলে পর খোঁপায় নিজ হাতে পরিয়ে দেবে। চিনু চা করে নিয়ে এলো, সেই সঙ্গে গল্প চলল অনেকক্ষণ। সবই কিশোরপুরের—শ্যামার ছেলেদের কথা, ব্রজদুলালের কথা।

চিনু সব কথা শুনে সজল চোখে বলে, বড় আনন্দের কথা। শ্যামারা সুখী হয়েছে।

—সত্যি চিনু, বড় ভাবনা ছিল। ভেবেছিলাম, দাদা কোন এক বুড়োর সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে দিয়েছে। এখন দেখছি, ঐ একটা কাজই দাদা ভালো করেছে।

কথা বলতে বলতে প্রায় সাড়ে ন'টা বেজে যায়। কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, কৈ গৌরী তো এখনও ফিরল না?

প্রশ্ন শুনেই চিনুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়, বলে, কি জানি।

—ও কোথায় গেছে?

—জানিনে, বলতে গিয়ে চিনুর গলা কেঁপে ওঠে। কেষ্টর তা নজর

এড়ায় না। বোঝে, চিহ্নু কিছু গোপন করার চেষ্টা করছে। জোর দিয়ে বলে, কি হয়েছে চিহ্নু, ঠিক করে বলো।

চিহ্নু আর চুপ করে থাকতে পারে না, হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে; কেষ্ট ধমকে ওঠে, খুলে বলো কি হয়েছে গৌরীর।

চিহ্নু অনেক কষ্টে গলা পরিষ্কার করে বলে, ক'দিন থেকে গৌরী ফিরছে না।

—মানে ?—সে কি কথা ? কোথায় থাকে ?

—বিনোদের কাছে।

কেষ্ট পাথর হয়ে যায়। চিহ্নু তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে নিয়েছে। বেশ কয়েক মিনিট কোন কথা বলতে পারে না। পরে অন্য দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, ক'দিন থেকে ?

—দিন পাঁচেক।

—তোমায় কিছু বলেছিলো ?

—শুধু আপনাকে জানিয়ে দিতে যে ও সিনেমায় কাজ নিয়েছে।

কেষ্ট দাঁতে দাঁত চেপে বলে, সিনেমায় নেমেছে ! ও !! অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করে, প্রভাতের বই-এ ?

—বোধ হয়। আমায় বলেনি।

—বিনোদের বাড়ির ঠিকানা জানো ?

—না, তবে পার্ক সার্কাসে থাকে। চিহ্নু ইচ্ছা করেই ঠিকানা গোপন করে গেল।

—বড় ক্লান্ত লাগছে। আমি একটু শুয়ে পড়ি চিহ্নু, তুমি আলোটা নিবিয়ে দিয়ে যাও।

—খাবেন না ?

—না। চিহ্নু আলো নিবিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে যায়।

কেষ্ট বিছানায় শুয়ে পড়ে কিন্তু ঘুমুতে পারে না। বুকের ভেতরটা

কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠছে। এক ফোঁটা জল তার চোখ দিয়ে পড়লো না, শুধু জ্বালা চোখে-মুখে, সমস্ত শরীরে কি অসহ্য জ্বালা! যে গৌরীর জন্যে সে সব ছেড়ে এই ভাবে হাফ-গেরস্থ হয়ে দিন কাটিয়েছে, যাকে নিজের দোসর বলে গ্রহণ করেছে, যার অপমান এক মুহূর্তের জন্য সহ্য করতে পারেনি, সে তাকে এভাবে ঠকিয়ে বোকা বানিয়ে চলে গেল! এ চিন্তা কেষ্টর মাথায় আগুন ধরিয়ে দেয়। গৌরীকে হাতের কাছে পেলে বেদম মারতে ইচ্ছা করে। যে মার সে জীবনে ভুলতে পারবে না। চুলের মুঠি ধরে মুখখানা দেওয়ালে ঘষে ভোঁতা করে দেবে, তবে বোধ হয় বুকের জ্বালা কমবে।

. আবার তার নিজেকে একা নিঃস্ব অসহায় মনে হয়, কোথায় গেল গৌরী, কোথায় গেল শ্যামল, আগে নিজেকে ভাবতে সে গর্ব অনুভব করতো! কিন্তু আজকে সে একা, সবাই ফেলে চলে গেছে। নিজেকে তার প্রতারিত মনে হয। এ অন্তর্দাহের শেষ কোথায়?

কিসের জন্যে গৌরী চলে গেল? টাকা। টাকা ছাড়া আর কি? গাড়ী বাড়ি শাড়ী—এর প্রলোভন সে সামলাতে পারলো না। বিনোদ তাকে নিশ্চয় বিয়ে করবে না। শখ মিটলেই ওকে সরিয়ে আর-একটা গৌরীকে নিয়ে যাবে। কি লাভ হল গৌরীর?

কেষ্ট সারারাত ছটফট করেছে। বার বার জল খেয়েছে! বারান্দায় বেরিয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস নিয়েছে। মানুষের উপর খুব বেশি বিশ্বাস কোন দিনই কেষ্টর ছিল না। যেটুকুও অবশিষ্ট ছিল গৌরী তা সমূলে বিনষ্ট করে গেল। সংসারের প্রতি পুঞ্জীভূত ঘৃণায় তার সমস্ত শরীর বিষিয়ে ওঠে।

ভোর না হতেই কেষ্ট বেহালা থেকে বেরিয়ে পড়ে। বাড়ি ফিরে জিরোবার চেষ্টা করে, পারে না। অনন্ত-কেবিনে গিয়ে গরম চা খায়। আগুদা দোকানে আসার আগে পয়সা মিটিয়ে বেরিয়ে আসে।

পার্কের বেঞ্চে গিয়ে বসে। সারাদিন ট্রেনে করে এসে ক্লান্ত হয়েছিলো, তার উপর রাত্রে ঘুম হয় নি, ফলে খোলা মাঠের মাঝখানে শুয়ে অবসন্ন দেহে ঘুমিয়ে পড়ে।

যখন ঘুম ভাঙলো প্রায় দুপুর। সারা দেহে কেষ্ট বেদনা অনুভব করে, মাথাটাও ধরেছে, একবার ভাবে বাড়ি ফিরে যাবে, পরক্ষণে মনে হয় বেহালায় যাওয়াই ভালো, চিনুর কাছ থেকে হয়তো আরও খবর পাওয়া যাবে।

ঘর খোলা ছিল, ভেতরে চিনু ঝাড়পোঁছ করছে, কেষ্ট গিয়ে বিছানায় ধপ করে বসে পড়ে।

চিনু চমকে ওঠে, কি হয়েছে কেষ্টদা, অমন করে শুলেন কেন ?

—কিছু না, এমনি।

—কোন ভোরে উঠে চলে গেছেন বলুন তো ?

কেষ্ট চোখ খুলে তাকালো, জবাব দিতে পারলো না। চিনু কেষ্টর লাল চোখ দেখেই ভয় পেয়েছিল। কাছে গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে বলে, গা যে পুড়ে যাচ্ছে, আপনার জ্বর হয়েছে ?

কেষ্ট সে কথা শোনে না, চিনুর হাতটা ধরে বলে, তোমার হাতটা কি ঠাণ্ডা, বুকের উপর একটু রাখবে ? এখানে বড় জ্বালা।

কেষ্টর জ্বর ছাড়তে পাঁচদিন লাগলো। ঐ ক'দিনই চিনু অবিরাম সেবা করেছে, বার্লি সাবু করে এনে খাইয়েছে। মাথার কাছে বসে কপালে হাত বুলিয়ে দিয়েছে, সান্ত্বনা দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছে।

কেষ্ট সুস্থ হয়েই বলে, তুমি আমার জন্যে এত করলে চিনু, অথচ আমি কার জন্যে এত করলাম ?

চিনু থামিয়ে দেয়, ওসব কথা এখন ভাববেন না।

—কখন ভাববো ?

—সুস্থ হয়ে উঠুন।

কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠছে। এক ফোঁটা জল তার চোখ দিয়ে পড়লো না, শুধু জ্বালা চোখে-মুখে, সমস্ত শরীরে কি অসহ্য জ্বালা! যে গৌরীর জন্যে সে সব ছেড়ে এই ভাবে হাফ-গেরস্থ হয়ে দিন কাটিয়েছে, যাকে নিজের দোসর বলে গ্রহণ করেছে, যার অপমান এক মুহূর্তের জন্য সহ্য করতে পারেনি, সে তাকে এভাবে ঠকিয়ে বোকা বানিয়ে চলে গেল! এ চিন্তা কেষ্টর মাথায় আগুন ধরিয়ে দেয়। গৌরীকে হাতের কাছে পেলে বেদম মারতে ইচ্ছা করে। যে মার সে জীবনে ভুলতে পারবে না। চুলের মুঠি ধরে মুখখানা দেওয়ালে ঘষে ভোঁতা করে দেবে, তবে বোধ হয় বুকের জ্বালা কমবে।

. আবার তার নিজেকে একা নিঃস্ব অসহায় মনে হয়, কোথায় গেল গৌরী, কোথায় গেল শ্যামল, আগে নিজেকে ভাবতে সে গর্ব অনুভব করতো! কিন্তু আজকে সে একা, সবাই ফেলে চলে গেছে। নিজেকে তার প্রতারিত মনে হয়। এ অন্তর্দাহের শেষ কোথায়?

কিসের জন্যে গৌরী চলে গেল? টাকা। টাকা ছাড়া আর কি? গাড়ী বাড়ি শাড়ী—এর প্রলোভন সে সামলাতে পারলো না। বিনোদ তাকে নিশ্চয় বিয়ে করবে না। শখ মিটলেই ওকে সরিয়ে আর-একটা গৌরীকে নিয়ে যাবে। কি লাভ হল গৌরীর?

কেষ্ট সারারাত ছটফট করেছে। বার বার জল খেয়েছে! বারান্দায় বেরিয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস নিয়েছে। মানুষের উপর খুব বেশি বিশ্বাস কোন দিনই কেষ্টর ছিল না। যেটুকুও অবশিষ্ট ছিল গৌরী তা সমূলে বিনষ্ট করে গেল। সংসারের প্রতি পুঞ্জীভূত ঘৃণায় তার সমস্ত শরীর বিষিয়ে ওঠে।

ভোর না হতেই কেষ্ট বেহালা থেকে বেরিয়ে পড়ে। বাড়ি ফিরে জিরোবার চেষ্টা করে, পারে না। অনন্ত-কেবিনে গিয়ে গরম চা খায়। আশুদা দোকানে আসার আগে পয়সা মিটিয়ে বেরিয়ে আসে।

পার্কের বেঞ্চে গিয়ে বসে। সারাদিন ট্রেনে করে এসে ক্লান্ত হয়েছিলো, তার উপর রাত্রে ঘুম হয় নি, ফলে খোলা মাঠের মাঝখানে শুয়ে অবসন্ন দেহে ঘুমিয়ে পড়ে।

যখন ঘুম ভাঙ্গলো প্রায় দুপুর। সারা দেহে কেষ্ট বেদনা অনুভব করে, মাথাটাও ধরেছে, একবার ভাবে বাড়ি ফিরে যাবে, পরক্ষণে মনে হয় বেহালায় যাওয়াই ভালো, চিনুর কাছ থেকে হয়তো আরও খবর পাওয়া যাবে।

ঘর খোলা ছিল, ভেতরে চিনু ঝাড়পোঁছ করছে, কেষ্ট গিয়ে বিছানায় ধপ করে বসে পড়ে।

চিনু চমকে ওঠে, কি হয়েছে কেষ্টদা, অমন করে শুলেন কেন?

—কিছু না, এমনি।

—কোন ভোরে উঠে চলে গেছেন বলুন তো?

কেষ্ট চোখ খুলে তাকালো, জবাব দিতে পারলো না। চিনু কেষ্টর লাল চোখ দেখেই ভয় পেয়েছিল। কাছে গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে বলে, গা যে পুড়ে যাচ্ছে, আপনার জ্বর হয়েছে?

কেষ্ট সে কথা শোনে না, চিনুর হাতটা ধরে বলে, তোমার হাতটা কি ঠাণ্ডা, বুকের উপর একটু রাখবে? এখানে বড় জ্বালা।

কেষ্টর জ্বর ছাড়তে পাঁচদিন লাগলো। ঐ ক'দিনই চিনু অবিরাম সেবা করেছে, বার্লি সাবু করে এনে খাইয়েছে। মাথার কাছে বসে কপালে হাত বুলিয়ে দিয়েছে, সান্ত্বনা দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছে।

কেষ্ট সুস্থ হয়েই বলে, তুমি আমার জন্যে এত করলে চিনু, অথচ আমি কার জন্যে এত করলাম?

চিনু থামিয়ে দেয়, ওসব কথা এখন ভাববেন না।

—কখন ভাববো?

—সুস্থ হয়ে উঠুন।

কেষ্ট চুপ করে যায়, এক সময় জিজ্ঞেস করে, গৌরীর আর কোন খবর পাওনি ?

চিনু চুপ করে থাকে। কেষ্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে, বলে, ফিরে এসে বিয়ে করবো তারই ঠিক করছিলাম। শ্যামা বলছিলো, পরের বার খুড়িমাকে সঙ্গে নিয়ে এসো। কি আশ্চর্য, যখন আমি প্রস্তুত হলাম ও চলে গেল !

চিনু কি ভেবে নিয়ে হঠাৎ বলে, যদি গৌরীর সঙ্গে দেখা করতে চান, আমি নিয়ে যেতে পারি।

—তুমি যে সেদিন বললে, ঠিকানা জান না ?

—নিজে গিয়ে চিনিয়ে দিতে পারি।

—চলো, তার সঙ্গে বোঝাপড়া করে আসি।

—আজই ? এখনও আপনি দুর্বল !

—এখুনি। ট্যাক্সি নেবো।

চিনু শাড়ী বদলে ফিরে এসে দেখে, কেষ্ট আগের মতোই শুয়ে আছে।

—কি হল, যাবেন না ?

কেষ্ট চিনুর দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, না থাক।

—কেন ?

—কি দরকার। ওর যা ইচ্ছে তাই করেছে, আমার বলার কি দরকার?

চিনু চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে, একটা কথা বলবো ?

—বলো।

—গৌরী কোন দিনই আপনাকে ভালোবাসেনি।

—তুমি কি করে জানলে ?

—জানি।

কেষ্ট কোন কথা বলে না।

—সত্যি বলছি কেষ্টদা, আপনার প্রতি এতটুকু দরদ থাকলে সে এভাবে আপনাকে ফেলে চলে যেতে পারতো না।

কেষ্টর চোখ-মুখ কঠিন হয়ে ওঠে। মেয়েদের উপর আমার তেমন কোন বিশ্বাস নেই। ওরা—

চিনু থামিয়ে দেয়। এক গৌরীকে দেখে মেয়ে জাতের কথা ভাবলে ভুল করবেন। হাতের পাঁচ আঙুল তো কোন দিনই সমান হয় না। বলেই চিনু ঘর থেকে চলে যায়।

কেষ্ট বোঝে, চিনুর সামনে মেয়েদের সম্বন্ধে এ ধরনের উক্তি করা উচিত হয়নি।

গৌরী যেদিন চিনুকে বলেছিল, কেষ্ট ফিরলে জানিয়ে দিতে যে সে ছবিতে কাজ করছে, সেই দিন থেকেই সে আর বেহালায় ফেরেনি। বিনোদের পার্ক সার্কাসের বাড়িতেই থেকে গেছে। এখানে ঠাকুর চাকর দারোয়ান কিছুরই অভাব নেই। নিজের হাতে কাঠি ভেঙ্গে কুচো করতে হয় না। গল্পের বই পড়া, রেডিও শোনা আর বিনোদের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া। এই নতুন জীবন তার বেশ ভালো লাগে। এর মধ্যে যথেষ্ট মাধুর্য আছে।

কত রকম বিনোদ জানে, কি ভাবে মেয়েদের সুন্দর দেখায়। সাহেবী দোকানে নিয়ে গিয়ে চুল ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে কি সুন্দর করে সাজিয়ে এনেছে। মোটা ভুরুকে সরু করিয়েছে, মুখে কত রকম রং মাখিয়েছে। আয়নায় নিজের চেহারা দেখে গৌরীর আশ্চর্য লাগে। সে যে এত সুন্দরী, কোন দিন তা ভাবেনি।

বিনোদ বলে, হলদে শাড়ী আর কালো ব্লাউজ, এতে তোমায় সবচেয়ে বেশি মানায়।

মার্কেট থেকে পাড়-না-ওয়ালা কত রকম হলদে রঙের শাড়ী এনে দিয়েছে। গৌরী পরতে গিয়ে বলে, দেখো, লোকে না ভাবে স্থাবা হয়েছে। বিনোদ হো-হো করে হাসে।

গৌরী পার্ক সার্কাসে আসা অবধি রোজই ভয় পেয়েছে কেষ্ট হয়তো যে কোন দিন এসে পড়বে কিন্তু সে আশঙ্কা যখন কেটে গেল, কেষ্ট এলো না, গৌরী মনে মনে মুষড়ে পড়ে। সে ভেবেছিল, কেষ্ট নিজে না এলেও চিনুকে অন্তত পাঠাবে। কিন্তু চিনুও না আসাতে তার বিস্ময়ের সীমা থাকে না। তবে কি বিনোদের কথা ঠিক যে গৌরী চলে যাওয়ায় কেষ্ট খুশিই হয়েছে? প্রথম প্রথম ভেবেছিল, কেষ্ট বোধ হয় ফেরেনি কিন্তু দিন দুই আগে গাড়ী করে স্টুডিওতে যেতে কেষ্টকে ভিড়ের মধ্যে দেখতে পেয়ে সে ধারণাও বদলাতে বাধ্য হয়েছে।

এরই মধ্যে বেলারাণীর বাড়িতে একদিন নেমন্তন্ন ছিল। গৌরী আর বিনোদের। বিনোদ আগেই বেলারাণীর বাড়ি গিয়েছিল। গৌরী দোকান থেকে চুল ঠিক করে সেখানে এলো প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে। বেলারাণী বাইরের ঘরে বসেছিল। বলে, এসো গৌরী, এখানে বসো।

—বিনোদ কোথায়?

—ওপরে আছে।

গৌরী বেলারাণীর পাশে বসে। বেলারাণী তারিফ করে বলে, খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। ক'দিনে চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছে বিনোদ।

গৌরী মুখ টিপে হাসে।

বেলারাণী ফুলদানীতে ফুল সাজাতে সাজাতে বলে, আমি তোমার চেয়ে অনেক বড়। আমি আর বিনোদ একবয়সী। আমাকে বেলাদি বলেই ডেক। সারা দিন কি করো, যেদিন স্টুডিও থাকে না?

—কি আর করি। রেডিও শুনি কি গল্প করি।

—একটু পড়াশুনো ক'রো। অন্তত ইংরিজিটা এ লাইনে খুব দরকার। চটপট কথা বলা চাই। বিনোদকে ব'লো একটা মাষ্টার রাখতে।

গৌরী মাথা নিচু করে বলে, বলে দেখবো!

—ওকে বললেই রাখবে। আমার বেলা তো রেখেছিল।

—আপনি কি বলছেন বেলাদি! আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

এবার বেলারাণীর বিস্ময়ের পালা, বলে, তুমি কি জান না আগে আমি বিনোদের সঙ্গে থাকতাম?

—আপনি?

—সে কি, বিনোদ তোমায় বলেনি বুঝি? ঠিক তুমি যেমন আজ আছ, আমিও একদিন ওর সঙ্গে ছিলাম, ঐ পার্ক সার্কাসের বাড়িতে। লোকটা ভাল। ওর টাকা আছে, হৃদয় আছে। নেই শুধু বুদ্ধি। ঐটে তোমার থাকা চাই। নিজের উপর দাঁড়াতে গেলে যা যা দরকার, সব এই বেলা করে নাও। পরে সুবিধে হবে।

—আপনি কত দিন ওখান থেকে চলে এসেছেন?

—বছর কয়েক। প্রথম প্রথম ও চেঁচামেচি করেছিল। তারপর যখন দেখলো আমি ছবিতে নাম করে ফেলেছি, তখন ও আর কিছু বলে না। এখানে আসে, যায়, দেখা করে।

—ও এখন কোথায় থাকে রাত্রে?

—বেশির ভাগ নিজেদের বাড়ি। মাঝে মাঝে পার্ক সার্কাসে। ও বিশেষ তোমায় জ্বালাতন করবে না। কারুর সঙ্গে মিশলেও বারণ করে না।

গৌরী বেলারাণীর সঙ্গে আর এ প্রসঙ্গ আলোচনা করতে চাইছিল না। জিজ্ঞেস করে—বিনোদ এখন কি করছে ওপরে বেলাদি?

—চলো, দেখিগে। ওপরে উঠতে উঠতে বেলারাণী একটা চোখ ছোট করে খাটো গলায় জিজেস করে, তোমার পিরীতের লোকটি কে?

গৌরী বুঝতে পারে না। মুখ তুলে তাকায়।

বেলারাণী হাসে, নেকা সেজো না। এ লাইনে আমি পেট থেকে পড়েই আছি। বিনোদকে নিয়ে তো আর পেট ভরবে না? আমার

পিরীতের লোক আসতো রোজ রাত্রে। তাই বিনোদকে রোজ সকাল সকাল বাড়িতে পাঠিয়ে দিতাম।

—যদি জানতে পারতো ?

বেলারাণী গৌরীর হাতে চিমটি কাটে—পাগলী কোথাকার! বিনোদ যখন বাড়ি যেত ওর কোন হুঁস থাকতো নাকি! তাছাড়া দারোয়ান চাকররা বকশিস পেত বলে, সময় বুঝে তাকে আমার ঘরে নিয়ে আসতো।

গৌরীর কৌতূহল হয়—তিনি কে ?

—কেউ না। রাস্তার একটা লোক। আগে থিয়েটারের সিফ-টার ছিল। পরে আমি তাকে টাকা দিতাম। লোকটা ছিল সত্যিকারের পুরুষ মানুষ। কি সুন্দর স্বাস্থ্য।

—এখন আসেন ?

—না, মারা গেছেন। বলতে গিয়ে বেলারাণীর চোখে জল এসে পড়ে, তার মুখের আদলটা ছিল অনেকটা প্রভাতবাবুর মত।

দুজনে উপরে উঠে এসে দেখে, বিনোদ তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে আছে! একেবারে মাতাল। গৌরী বিনোদকে আগে কখনও এত বেশি মত্ত অবস্থায় দেখেনি। জিজ্ঞেস করে, ও কি ? এ রকম করে বসে আছ কেন ?

বিনোদ জড়ান-গলায় বলে, আমি তো বেশি পান করিনি। মাথা আমার ঠিক আছে। দেখবে, আমি হেঁটে দেখিয়ে দেব। বলে, বিনোদ উঠবার চেষ্টা করে। না পেরে আবার ফরাসে বসে পড়ে।

বেলারাণী গৌরীর খোঁপাটা নেড়ে দিয়ে বলে, যত চায় খেতে দিও। খবরদার নেশা ছাড়িও না। তাহ'লে তোমারও দিন ফুরাবে।

বেলারাণী যে সব কথাই সত্যি বলেছে, তা বিনোদকে জিজ্ঞেস না করেও চাকরের বউ-এর কাছ থেকেই গৌরী সহজে জানতে পারে। সে বলে, আমার দেখতা আপনার আগে তিন জন। তবে বেলা দিদির

মত কেউ নয়। কি টাকাই আমাদের দিয়েছে। এখনো বাড়ি গেলে ছবি দেখার পাশ দেয়। বিনোদের সম্বন্ধে বলে, এ বাবুর নতুন কিছুই নয়। ওঁর বাবা তাঁর বাবা তিন পুরুষে পয়সা হ'য়ে অবধি এই করছে। পাখি পোষে, পাখি উড়ে যায়, আবার পোষে।

কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ক্লাইভ স্ট্রীট। এখন যার নাম হয়েছে—নেতাজী সুভাষ রোড। যেখানে সকাল ন'টা থেকে সন্ধ্যে ন'টা পর্যন্ত ভিড়ের অন্ত নেই। সেখানেই কালীর দলের বেশির ভাগ লোকের দিন কাটে। কেউ বিক্রি করে চোরাই মাল। কেউ ডিসপোজালের জিনিস। কেউ নতুন রকম খেলনা। যা প্রথম চোটে টাকায় একটা করে বিক্রি হয়ে পরে নেমে আসে জোড়া দু'আনায়, দু'রাস্তার মোড়ের কাছে ব্যাঙ্কের বিরাট বাড়ির তলায় পানওয়ালী ছাতা মাথায় করে পান বিক্রি করে। এলোচুলে গেঁট বাঁধা। কপালে সিঁদুরের টিপ। দু-একটা ছোট পেঁটরা। তার পান সাজার সরঞ্জাম। এর সঙ্গে ভাব গাড়ীর ড্রাইভারদের। সারাদিন গাড়ী পার্ক করে রেখে তারাই বা কি করে? মাঝে মাঝে পানওয়ালীর সামনে উবু হয়ে বসে পান কিনে খায়। ঠাট্টা-তামাসা করে।

শ্যামল এসে পান সাজতে বলে—দু'পয়সার ভালো পান দাও।

পানওয়ালী পান সাজতে সাজতে মৃদুস্বরে জানায়, কাল এসেছিল। তোমরা যাবার ঘণ্টাখানেক বাদে।

—শালা হয়রান করে মারছে।

—সাড়ে সাতশো টাকা চায়। বলছে তার কমে হবে না।

—সব ঠিক করে রাখবে। কোন গোলমাল হবে না। আমি আজ তোমার বাসায় দুশো টাকা নিয়ে যাব।

পানওয়ালী চোখ না তুলেই বলে, ও পুরো টাকা আগে চায়।

শ্যামল গম্ভীর হয়ে যায়।—তাহলে অন্যদের জিজ্ঞেস করতে হবে।

—জিজ্ঞেস করে যদি মত হয়, তাহলে টাকা নিয়ে এসো। আমি তো থাকবো।

শ্যামল পানওয়ালীর কাছ থেকে সোজা যায় রয়াল এক্সচেঞ্জের মোড়ে। জলিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্টীলের মাপবার গজ বিক্রি করছে। আড়াই টাকার মাল দেড় টাকায়।

শ্যামল সামনের দোকানে গিয়ে একটা সিগারেট ধরায়, সাড়ে সাতশো চাইছে।

জলিল চোখটা ছোট করে বলে, ঠিক আছে। আমি রাতের মধ্যে টাকা জোগাড় করে রাখবো।

জলিল অভ্যাস-মত হাঁটতে শুরু করে, আড়াই টাকার মাল দেড় টাকায়। দু'একজন এসে দেখে, তবে দাম না বলেই চলে যায়। সেদিকে জলিলের বড় খেয়াল নেই। বলে, দেবেন শালার মতলবটা কি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—কেন ?

—কৈ এখনও তো এলো না।

—আসবার কথা ছিল ?

—তা না হলে আর দাঁড়িয়ে আছি কেন ? সেই মেয়েটাকে নিয়ে আসবার কথা। রাজীব গাড়ী চালিয়ে নিয়ে আসবে।

—কোথায় যাবে ? বউবাজারের গয়নার দোকানে ?

—হ্যাঁ, মেয়েটা ঠিক গুছিয়ে কাজ করবে। কিন্তু দেবেন শালাকে নিয়ে মুস্কিল ! জেল খেটে খেটে মাথাটা মোটা হয়ে গেছে। কালী ভুল লোক ধরেছে। ওকে কি আর খাড়া করা যায় ?

শ্যামল এ কথার কোনও উত্তর দেয় না। বলে, ঠিক আছে, আমি এখন বাড়ি চললাম। সন্ধ্যে বেলায় মঙ্গলার কাছে একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

মঙ্গলা যে বাড়িতে থাকে তা পুরনো হলেও পাকা দেওয়াল। মাথায় টালি-দেওয়া আড়াইখানা ঘর। তারই মধ্যে বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে। বাড়িতে তার চেহারা অন্য রকম। ভাল করে খোঁপা বেঁধে রঙ্গীন শাড়ী পরে চোখের কোণে কাজল টানে। উত্তর-কলকাতার যে অঞ্চলে তার বাসা, সেখানে বেশির ভাগ জানা-শোনা লোকেরই আনাগোনা, উটকো লোকের উপদ্রব বেশি নেই।

শ্যামল ও জলিল এল সন্ধ্যার ঝোঁকে। মঙ্গলা দরজা খুলে বসতে দেয়। জলিল সরাসরি কাজের কথা পাড়ে।

—অনেক টাকা দিলাম। দুটো চাবিই চাই। গাড়ীর আর গ্যারেজের।

—দেবে বলেছে।

—কবে?

—কাল এই সময় এসো। রাতে গাড়ী সরিয়ে ফেলো। কিন্তু আমার টাকা।

—কত চাও?

—আমি গরীব মানুষ। আড়াই শো।

—পাগল না কি? হাজার টাকা তো এইখানেই বেরিয়ে যাবে।

—আর তো কোন খরচ নেই! তোমরা যে কত হাজার টাকা পাবে!

—ধরা পড়লে যে কত বছর, সে হুঁস আছে? যাক গে, সব ঠিক মতো হ'লে একশো দেড় শো টাকা পাইয়ে দেব।

কাজের কথা এইখানেই শেষ হল। শুরু হল আমেজের কথা। মঙ্গলা দেশী পানীয় তিনটি গ্লাসে পরিবেশন করে। জলিল তারিফ করে বলে, বহুত আচ্ছা।

শ্যামল জলিলদের সঙ্গে থাকার পর থেকে মাঝে মাঝে নেশা করে। মাতাল সে হতে চায় না। কিন্তু রঙীন ঘোরটা বেশ উপভোগ করে! একদিন হয়তো কেষ্টর কাছে লাঞ্ছিত হ'য়ে বিতৃষ্ণায় সে পান করতে শুরু করেছিল। কিন্তু এখন নিছক আনন্দের জন্যে পান করতে কুণ্ঠিত হয় না।

আজও মঙ্গলার অনুরোধে শ্যামল পান করলো। এত কড়া জিনিস আগে সে খায়নি! তাই একটুতে নেশা ধরে যায়। বুঁদ হ'য়ে বসে বসে কত রকম ভাবে। মঙ্গলার দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থেকে তার মনে হয়, বেলারাণী বসে আছে। উঃ, কি পালিশকরা চকচকে চেহারা, কালো সিল্কের মতো চুল। সঙ্গে সঙ্গে গৌরী, চিনু অনেকের কথা তার মনে পড়ে। আশুদা, প্রভাত, মামার বাড়ি! শ্যামলের চোখে জল আসে। কেষ্টর কথা মনে হ'তেই তার চোখ জ্বলে ওঠে। বিড়-বিড় করে বলে, তুমি খুব অন্যায় করেছ, খুব অন্যায়।

এ ভাবে কতক্ষণ কেটেছে শ্যামলের খেয়াল ছিল না। কার গরম নিশ্বাসে তার চেতনা ফিরে এল। অন্ধকার ঘরের মধ্যে মঙ্গলা তাকে নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ করেছে। শ্যামলের জীবনে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা! সে উন্মুখ হ'য়ে ওঠে। মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করে, জলিল!

মঙ্গলা উত্তর দেয়, পাশের ঘরে শুয়ে আছে।

শ্যামল আর কথা বলে না। মঙ্গলার কাছে সম্পূর্ণরূপে ধরা দেয়। মঙ্গলা তার কানে কানে বলে, তুমি আমার কাছে এসো, প্রায়ই এসো, রোজ এসো। তোমায় টাকা দিতে হবে না, কিছু দিতে হবে না, তুমি শুধু এসো। যৌবনের প্রথম ধাপে পা দেওয়া শ্যামল কিছুতেই এ আমন্ত্রণকে অস্বীকার করতে পারে না।

চিনুর অক্লান্ত সেবায় কেষ্টর শরীর সুস্থ হয়ে উঠলেও ভাঙ্গা মন তার

জোড়া লাগলো না। বেশির ভাগ সময় গুম হ'য়ে বসে থাকে, আবোল-তাবোল ভাবে। চিনুকে সব সময় বলে, তুমি কেন এত খেটে মরছ চিনু, আমি তো ভালো আছি। চিনু হেসে উত্তর দেয়, কোথায় ভালো! আগের মত তো হননি।

—সে কি আর হবে?

—যত দিন না হবে, আমাকেও খাটতে হবে।

—পিনাকী কি ভাবছে বলো তো?

—কি আবার!

—সারাদিনই তো তুমি আমার সেবা করছো।

চিনু হাসে, সেবা করাতে কোন দোষ নেই।

কেষ্ট আর কথা বলে না।

কেষ্ট নিজের বাড়িতে ফিরে দিন-দুই বেহালায় গেল না। বেশির ভাগ সময় বাড়িতে বসে থাকতো, তবে এরই মধ্যে একদিন আশুদা খবর নিতে এসেছিলেন। কেষ্টর ক্লিষ্ট শীর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি, কিশোরপুর থেকে ফিরে তো আর দেখা করলে না।

—জ্বর হয়েছিল।

—তাই নাকি? আমাকে জানাও নি কেন?

কেষ্ট ম্লান হেসে বলে, মিছিমিছি ব্যস্ত করিনি।

আশুদা পাড়ার খবর দিয়ে গেলেন। পুজোর খরচপত্র সব মিটে গেছে। কোনও রকম গোলমাল হয়নি। এবারে যে পাড়ার পুজো সবচেয়ে সমারোহ করে হয়েছে সে-বিষয়ে কারুর সন্দেহ নেই। প্রভাতরা সামনের সপ্তাহে ফিরছে। চিঠিতে জানিয়েছে, ওর ভাবী শ্বশুর অনেক ভালো। আর সব চিঠিতেই তো তোমার খবর করে।

—আমারও দরকার ওকে। এলেই আমায় জানাবেন।

প্রভাতের প্রসঙ্গে কেষ্টর মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। আশুদা বিস্মিত হন, কি হ'য়েছে বলতো? আজকাল তোমাদের দুজনের মধ্যে সদ্ভাব নেই না কি? দুজনেই দুজনের নাম শুনলে কেমন হয়ে যাও।

কেষ্ট সোজা উত্তর দেয়, প্রভাত আমাকে না জিজ্ঞেস করে একটা কাজ করেছে, আমি তার কৈফিয়ত চাই।

আশুদা আর ও বিষয়ে বেশি কথা না বলে দু'চারটে কথাবার্তার পর উঠে পড়েন।

প্রভাতের কথা মনে পড়লেই কেষ্টর কেমন যেন ঈর্ষা হয়। বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। ভাল চাকরী, শ্বশুরের বাড়ি-গাড়ী সবই তো ও পাবে। তার উপর অরুণা, খাসা মেয়েটি।

শ্যামলটা হতভাগা। সেই যে চলে গেল আর-একবারও দেখা করে গেল না। কেষ্ট দু'চারজনকে জিজ্ঞেস করে দেখেছে, কেউ জানে না শ্যামল এখন কোথায়। এক একবার ভাবে, খবর নিলেও হয় মদনের কাছে। সে হয় তো বলতে পারবে।

সেদিন সকালবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে কেষ্ট ঘুরতে ঘুরতে মদনদের পাড়ায় আসে। বাড়ি না চিনলেও খুঁজতে হয় না। মোড়ের মাথায় আড্ডা-সঙ্ঘের জোর আসর বসেছিল, সেখানে খোঁজ করতেই তারা মদনের বাড়ি দেখিয়ে দিলে।

মদন নেড়ামাথায় নেমে এল। আর যাকেই হোক কেষ্টদাকে সে মোটেই আশা করেনি। বৈঠকখানার দরজা খুলে বসতে দিয়ে জিজ্ঞেস করে, কি খবর কেষ্টদা?

কেষ্ট গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করে, বাবা কবে গেলেন?

—এই তো মাসখানেক হবে।

—তোমার ওপর তো দাদা আছেন?

—হ্যাঁ, এখন দুজনেই কাজ দেখছি। তিন পুরুষের গয়নার দোকান, সারাদিন ওখানেই বসি।

কেষ্ট তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, মদন কত গম্ভীর হয়ে গেছে। সংসারের কতখানি চাপ সে সহসা উপলব্ধি করেছে। শ্যামলের বন্ধু মদন স্কুলপালানো বেহিসেবী ছেলে আর নেই। বাড়ির ঐতিহ্য বজায় রেখে পুরো মাত্রায় হিসেবী হয়ে উঠেছে। কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, শ্যামলের সঙ্গে তোমার দেখা হয়?

—না তো, কেন?

—ওর কোন খবর পাচ্ছি না।

—সে কি, শ্যামল তো আপনার কাছেই ছিল।

—ছিল, তবে এখন নেই। কেষ্ট সংক্ষেপে বিজয়া দশমীর পরের দিনের কথা ব্যক্ত করে। মদন চিন্তিত হয়, তাইতো বসুন, আমি চুণীলালকে ডেকে আনি।

মদন অল্পক্ষণ পরেই চুণীলালকে ডেকে নিয়ে এল। চুণীলাল আক্ষেপ করে বলে, হতভাগাটা একেবারে গোল্লায় গেছে—

—আমি তো ভেবেছিলাম শ্যামল ফিরে আসবে।

—কালীর আড্ডায় গিয়ে পড়লে তাকে উদ্ধার করা শক্ত। দেবেনদাই পারলো না—

—দেবেনদার সঙ্গে দেখা—

—ক'দিন আগে হয়েছিল একটা গয়নার দোকানের সামনে। গাড়ীতে বসেছিলেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম, যে লোকটা চিরকাল কাটা-খদ্দরের পাঞ্জাবী প'রে কাটিয়েছে তার পরনে ধোপদুরস্ত শৌখিন ধুতি-পাঞ্জাবী, মানুষ কত বদলে যায়!

মদন চট করে জিজ্ঞেস করে, তোর সঙ্গে কথা হল?

—খুব অল্প। দোকান থেকে একটি মেয়ে এসে ওর গাড়ীতে উঠল,

আমিও সরে পড়লাম। তাইতো বলছি কালীর খপ্পরে পড়ে দেবেনদা যদি পাল্টে যেতে পারেন, শ্যামল তো কিছুই নয়।

কেষ্ট চলে গেলে মদন আর চুণীলাল নন্দিতাদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে। ঘরামীরা মেরাপ বাঁধছে, অঘ্রানের দু'তারিখে নন্দিতার বিয়ে। পাকা দেখা হয়ে গেছে। মদন নিজের মনেই বলল, মন্টুদার মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে।

—ভদ্রলোক বড় সেন্টিমেণ্টাল।

—তা আর বলতে! এক দিনে কি চেহারাই হয়েছে। বললাম, দিনকতক এখন ছুটি নিয়ে ঘুরে আসুন, তা কিছুতেই শুনবে না। বলে বিয়ের দিনটা কাটিয়ে যা হয় করবে।

—মেয়েটা এ ব্যাপারে সিরিয়াস্ কি রকম?

—ভগবান জানেন। তবে আমার মনে হয় বিয়ের আগে যেমন অনেক মেয়ের হয়, অল্প-স্বল্প ফষ্টিনষ্টি করে—

চুণীলাল দুঃখ প্রকাশ করে, বেচারী মন্টুদা!

কেষ্ট বেহালায় ফিরে নীচে না থেমে ওপরে উঠে যায় বাড়িওয়ালার কাছে। মদনের পাড়া থেকে আসবার পথে ট্রামে বসে সিদ্ধান্ত করেছে, ঘর সে ছেড়ে দেবে। এঘরের প্রয়োজন ফুরিয়েছে, মিছিমিছি পয়সা নষ্ট করে কি হবে। বাড়িওয়ালার আপত্তি করার কিছু ছিল না। বলে, দেখবেন আপনি, জানাশোনা কোন লোকের যদি এরকম ঘরের দরকার থাকে। জানেন তো, অজানা-অচেনা লোককে আমি ভাড়া দিতে চাই না। কথায় আছে, অজ্ঞাত কুলশীলস্য—

কেষ্ট থামিয়ে দেয়, খেয়াল রাখবে।

—এ মাসের ভাড়াটা তাহলে—

—এরই মধ্যে একদিন দিয়ে যাব, এখনও তো আমি যাই নাই।

ওপর থেকে নীচে নামতেই চিনুর সঙ্গে দেখা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে

সে ফেরিওয়ালার কাছে ফল কিনছিল। জিজ্ঞেস করে, কেষ্টদা কখন এলেন ?

—এই তো।

—ওপর থেকে ?

—বাড়িওয়লাকে নোটিশ দিয়ে এলাম।

চিনু আর উৎসাহ প্রকাশ করে না। বলে, ও !

কেষ্ট ঘর খুলে ভেতরে ঢোকে। মনে পড়ে গৌরীর সঙ্গে গিয়ে একটি একটি করে জিনিস কিনে এই খেলাঘরের সংসার পেতেছিল। আসবাবের বাহুল্য না থাকলেও প্রয়োজনীয় সব কিছুই আছে।

নিজের অজান্তে কেষ্টর দীর্ঘশ্বাস পড়ে। মোড়ায় বসে পড়ে একটা সিগারেট ধরায়। হাত ধুয়ে আঁচলে মুছতে মুছতে চিনু ঘরের ভেতর ঢোকে। জিজ্ঞেস করে, কি খাবেন কেষ্টদা ?

কেষ্ট ম্লান হাসে, আমাকে দেখলেই তোমার খাওয়াতে ইচ্ছে করে কেন বলতো চিনু ? আমি কি খুব বেশি খাই ?

চিনু উত্তর দেয় না। বাক্সের ওপর থেকে কতকগুলো কাগজ মেঝেয় পড়ে গিয়েছিল, সেগুলো গুছিয়ে রাখে। কেষ্ট হঠাৎ বলে, এ জিনিস-গুলোর কি করা যায় ?

—বলুন।

—ভাবছি কাউকে দিয়ে দেব।

—বেশ তো।

একটু থেমে কেষ্ট আবার প্রশ্ন করে, তোমাদের কোন কাজে লাগবে না ?

চিনু পরিষ্কার গলায় উত্তর দেয়, না। একটু পরে চিনু নিজে থেকেই জিজ্ঞেস করে, এ মাস থেকেই ঘর ছেড়ে দিচ্ছেন ?

—হ্যাঁ।

—এখানে আবার কে আসবে কে জানে ?

একথার উত্তর দেবার কিছু ছিল না, কেষ্ট চুপ করে বসে থাকে।

—এদিকের পালা উঠে গেলে আর কি এতদূর আসবেন ?

—যদি কাজ পড়ে।

বেশ ক'দিন একসঙ্গে থাকা গেল। জানতাম, একদিন গৌরীকে নিয়ে এ বাসা ছেড়ে যাবেন। কিন্তু যেখানেই সংসার পাতুন, আমার একটা অধিকার থাকত। মাঝে মাঝে গিয়ে আপনাদের জ্বালাতন করতাম। তা আর হ'ল না—

—যা ভাবা যায় সব সময় তা হয় না।

চিনু মৃদুস্বরে বলে, তাই দেখছি।

—আমার নামে কোন চিঠি আসে নি ?

—না।

—শ্যামারা নিশ্চয় চটে গেছে। এসে অবধি একটাও চিঠি দিইনি।

—লিখবেন ?

—তোমার কাছে পোস্টকার্ড আছে ?

চিনু হাসে, জানি আপনি নিজে চিঠি লেখেন না। আপনার মনে নেই বোধ হয় ? আগের চিঠিটাও তো আমি লিখে দিয়েছিলাম।

—তাহলে এবারও দু' লাইন লিখে দাও।

চিনু পোস্টকার্ড আর কলম নিয়ে আসে। যথারীতি ওপরে দুর্গা সহায় লিখে জিজ্ঞেস করে, শ্যামাকে লিখবেন তো ?

—না, ওর স্বামীকে।

—বলুন।

কেষ্ট বলে যায়: প্রিয় ব্রজদুলাল, তোমাদের কাছ থেকে এসে অবধি একটাও চিঠি দিই নি। কারণ আমার অসুখ করেছিল। এখন ভাল আছি। প্রায়ই তোমাদের সকলের কথা মনে পড়ে।

মিটু কিটু কেমন আছে? শ্যামা কেমন আছে সব কথা জানিও। কলকাতা বড় একঘেয়ে লাগছে, মনে শান্তি পাচ্ছি না। তোমার কথা ভুলিনি, তুমি যে বলেছিলে একজন ড্রিল-মাস্টার দরকার, যদি কোন ভালো লোক পাই জানাব। আমার মত মুখ্যু সুখ্যু মানুষ দিয়ে তো তোমার কাজ চলবে না, তাই ভাল লোকের সন্ধানে রইলাম। ভালো-বাসা নিও, ছোটদের আশীর্বাদ জানিও। ইতি তোমার কেষ্ট।

চিঠি লেখা শেষ হলে চিনু বলে, খুব তো বাহাদুরী করে লিখলেন, যেন কিশোরপুরে ড্রিল-মাস্টারী করার জন্যে আপনার মন ছটফট করছে। সত্যি সত্যি ডাকলে যাবেন সেখানে কলকাতা ফেলে?

—কি জানি, এক একবার মনে হয় গেলেই ভালো। এখানে পড়ে থেকে আর কি হবে?

চিনু কোন কথা না বলেই উঠে পড়ে। কেষ্ট জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাচ্ছো?

—রান্না চড়িয়ে দিই।

—আমিও উঠি চিনু!

—সে কি, আপনার জন্যেই তো রান্না করছি।

—না, না। আমি বাড়ি যাবো।

—সেখানে তো কেউ বাড়া ভাত নিয়ে বসে থাকবে না। হোটেলের চাইতে এখানে খাওয়া ভাল। ব'লে চিনু ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কেষ্ট কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে জামা খুলে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

গৌরী বিনোদের কাছে এসে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার সব রকম সুযোগ পেয়েছিল, পড়ার মাস্টার, নাচের মাস্টার, শাড়ী, গাড়ী, রূপসজ্জার নানারকম সরঞ্জাম কিছুই অভাব ছিল না, কিন্তু চিনুর সঙ্গে দেখা করার

আগ্রহ তার একটুকু কমেনি। মাঝে মাঝে হয়তো ভেবেছে, এর কি প্রয়োজন আছে? তবু তার মন কেষ্টর কথা জানার জন্যে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। এত দিনেও সাহস সঞ্চয় করে বেহালার বাসায় যেতে পারেনি। বিনোদ তাকে বলে, ও-সব কথা ভুলে যাও। কেষ্ট তোমার কে?

—কেউ না।

—তবে?

—তবে আর কি, এমনি জানতে ইচ্ছে করে, অনেক দিন একসঙ্গে ছিলাম তো।

—যেতে চাও আমি নিয়ে যেতে পারি।

গৌরী এ প্রস্তাবে রাজী হতে পারে না। কেষ্টর মেজাজের সঙ্গে সে অপরিচিত নয়। হয়তো বিনোদকে অপমান করে বসবে, কি দরকার সে ঝামেলার মধ্যে গিয়ে?

কিন্তু আশ্চর্য! আকস্মিক ভাবে চিনুর সঙ্গে গৌরীর দেখা হ'য়ে গেল এক থিয়েটারের রিহার্সালে। গৌরী গিয়েছিল বিনোদের সঙ্গে, বিনোদ সে ক্লাবের পেট্রন, চিনু এসেছিল টাকা নিয়ে অভিনয় করতে, দুজনের দেখা হতেই চিনু আড়ষ্ট হয়ে যায়। গৌরী সপ্রতিভ ভাবে এগিয়ে গিয়ে হেসে কথা বলে, কি খবর, কতদিন বাদে দেখা।

চিনু মুখ তুলে তাকায়, বলে, হ্যাঁ, প্রায় এক মাস হ'ল।

—এখানে পার্ট করছ বুঝি?

—হ্যাঁ।

গৌরী ভিড়ের মধ্যে থেকে চিনুকে টেনে এনে একান্তে বসে। জিজ্ঞেস করে, আমার কাছে আসো না কেন?

—যেতে তো বলিসনি কখনও?

গৌরী হাসবার চেষ্টা করে, বলবার কি আছে, তোমাকেও নেমন্তন্ন করতে হবে নাকি?

—আশা করেছিলাম একটা খবর দেবে।

—পারিনি, এত রকম ঝামেলা। বাইরে থেকে ভাবতাম ফিল্ম লাইন খুব সোজা, উঃ বাবা, সকাল থেকে রাত্রি, খাটুনির কি শেষ আছে?

চিনু একদৃষ্টে তাকিয়ে বলে, যাই বলো, চেহারা তোমার অনেক ভাল হয়েছে।

গৌরী আত্মপ্রসাদ অনুভব করে বলে, সবাই তাই বলছে। একটু থেমে জিজ্ঞেস করে, তোমরা কেমন আছো?

—আমরা? ভালোই।

—তবু?

চিনু অন্যমনস্ক ভাবে জিজ্ঞেস করে, তবু মানে?

—ঐ পিনাকীবাবু, তুমি—

—কেটে যাচ্ছে আর কি।

গৌরী ভেবেছিল চিনু নিজে থেকেই কেষ্টর কথা তুলবে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ না ওঠায় সরাসরি প্রশ্ন করে, আর কেষ্টদা? গৌরীর গলা কেঁপে ওঠে।

—বেশি দেখা হয় না।

—কেন? বেহালায় যায় না?

—বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছেন এ মাস থেকে।

—তাই নাকি? জিনিসপত্র সব?

—বলছিলেন কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দিয়ে দেবেন।

—ও! গৌরী চুপ করে যায়।

—শুনলাম কলকাতায় আর থাকবেন না।

—কোথায় যাবেন?

—কলকাতার বাইরে কোন গ্রামে।

—হঠাৎ?

—বলছিলেন, কলকাতা আর ভালো লাগছে না।

এ বিষয় নিয়ে বেশি আলোচনা করতে গৌরীর ভয় হয়! কেন যে কেষ্ট কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তা বুঝতে গৌরীর বাকী থাকে না। চিনু কিন্তু কোন কথাতে গৌরীকে এতটুকু খোঁচা দেয় না। স্টুডিওতে কি রকম সে কাজ করছে, বাড়িতে কি ভাবে দিন কাটায়—একে একে সব কথা জিজ্ঞেস করে বিনোদের কথা পাড়ে, বিনোদবাবু লোক খুব ভালো, না?

গৌরী উৎসাহিত হয়ে বলে, সত্যিই খুব ভালো। বাইরে থেকে ওকে কিছুই বোঝা যায় না।

গৌরী উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বিনোদের গুণ বর্ণনা করে। তার উদারতা, তার ভালোবাসা, অকৃত্রিম বন্ধুত্ব, সব কিছু।

চিনু মন দিয়ে সব কথা শুনে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, কেষ্টদার চেয়েও ভালো?

চিনুর এই একটি প্রশ্নে গৌরী হতবাক হয়ে যায়। কোনও উত্তর সে দিতে পারে না। যে মনকে সে এই ক'দিনে রাত্রে, স্বপ্নে, জাগরণে সব সময় বুঝিয়েছি—বিনোদ ভালো, কেষ্টদার চেয়ে অনেক ভালো, সেই মন চিনুর প্রশ্নের সামনে মৌনী হয়ে যায়! বিনোদ এসে গৌরীকে বাঁচায়। চিনুকে দেখে হেসে জিজ্ঞেস করে, কি খবর? গৌরী তো সারাক্ষণই তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

বিনোদ বরাবরই চিনুকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করেছে। কিন্তু অনেক দিন পর আজকে দেখে 'তুমি' বলতে বাধে না।

—সত্যি নাকি? চিনু বলে।

—বিশ্বাস না হয় ওকেই জিজ্ঞেস কর না।

—আমাদের ভাগ্য বলতে হবে।

বিনোদ কথাটা গায়ে মাখে না। দরাজ গলায় বলে, এসো না এক-দিন স্টুডিওতে, গৌরী কেমন পার্ট করছে দেখবে।

—যাবো।

রিহার্সাল শুরু করার জন্যে সকলের ডাক পড়ে। চিনু 'মাপ করবেন', বলে বিনোদ ও গৌরীর কাছ থেকে চলে যায়।

এর মধ্যে আর কেষ্টর সঙ্গে চিনুর দেখা হয়নি। দেখা হলে হয়তো গৌরীর কথা উঠতো, কিন্তু কেষ্ট আজকাল বেশির ভাগই নিজের বাড়িতে থাকে, খুব কম বার হয়। বেহালায় বেশি যেতে চায় না। পাছে চিনু তাকে নিয়ে অযথা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মনে মনে ভাবে, পিনাকী মুখে কিছু না বললেও নিশ্চয় অন্তরে বিরক্ত হয়। তবু এরই মধ্যে একদিন সে বেহালায় গিয়েছিল, কিন্তু চিনু বাড়ি ছিল না, ক'দিনই সন্ধ্যার সময় তাকে রিহার্সাল দিতে বাইরে যেতে হয়।

কেষ্ট চেষ্টা করে গৌরীর কথা আর না ভাবতে, তবু অনেক সময় তার কথা মনে পড়ে। এতে নিজের উপর বিরক্তি বাড়ে, আর কোন লাভ হয় না। ক'দিন আগে কোন এক সিনেমা পত্রিকায় নবাগতা গৌরী দেবীর ছবি সে দেখেছে! পয়সা দিয়ে এক কপি সংগ্রহ করেও এনেছিল, কিন্তু কয়েক ঘণ্টার বেশি সে বইখানা কাছে রাখেনি। এ ছবিতে ছিল না গৌরীর সেই সহজ সুন্দর মুখখানি যা দেখে প্রথম দিন কেষ্টর মনে সহানুভূতির উদ্রেক হয়েছিল। যাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন তাকে পাগল করে দিয়েছিল, এ গৌরী নয়। কেষ্ট বার বার ছবিখানা দেখেছে, তার লোল কটাক্ষ, অতি-আধুনিক সাজ-পোশাক, ফাঁপানো মাথার চুল, কৃত্রিমতায়-ভরা একখানা মুখ। রাগে সমস্ত শরীর তার কেঁপে উঠেছিল। নিমেষের মধ্যে ছবিখানা ছিঁড়ে কুটি কুটি করেও সে মনে শান্তি পায়নি। ছাদে গিয়ে ছবির টুকরোগুলো জড়ো করে একটা দেশলাই জ্বালিয়ে দেয়। একদৃষ্টে সেই দিকে তাকিয়ে থেকে কেষ্টর চোখে জল এসে পড়ে। গৌরীর ভাইকে শ্মশানে পোড়াতে গিয়েও তার মনে

এতখানি অবসাদ আসেনি, যা আজ এল ছবির গৌরীকে অভিমানে চিতায় তুলতে।

আজ রোববার। প্রভাত কলকাতায় ফিরেই এসেছে আশুদার কাছে, পুরনো বন্ধু-বান্ধবের কাছে দেখা করতে। আশুদা জড়িয়ে ধরে বললেন, তোমার শরীর অনেক ভালো হয়েছে, প্রভাত।

আগের মতো প্রভাত হেসে পদপূরণ করে দেয়, কাঠির উপর আলুর দম আর নেই। এই তো?

—কি সব খবর বলো? অরুণা কেমন আছে? বিয়ে কবে?

প্রভাত ইচ্ছে করে কাসে, বিষম লাগিয়ে দিলেন যে। একসঙ্গে কটা প্রশ্নের উত্তর দেব?

—বেশ তো, একে একেই বলো না।

—অরুণা, অরুণার বাবা সবাই ভালো অছেন। অরুণার মা আমার মধ্যে রোজ নতুন নতুন গুণ দেখছেন। আমি নাকি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সৎচরিত্র, ধর্মভীরু—

—মানে স্কুলে মহাপুরুষদের জীবনী লিখতে ছেলেরা যে সব বিশেষণ ব্যবহার করেন, সেইগুলো তো? প্রভাত সায় দেয়, হুবহু ঠিক ধরেছেন। আশুদা প্রাণ খুলে হাসেন, এ নতুন কিছু নয় ভাই, শাশুড়ীর মুখে বরাবর শুনেছি, শুধু ওঁর কথামতো মেয়েকে বাপের বাড়ি আসতে না দিলে বিশেষণগুলো কম ব্যবহার করতেন।

—অরুণার বাবা এখন অনেক ভালো, বিয়ের ব্যবস্থা বলতে গেলে সব উনি নিজেই করছেন।

—হাঁটতে-ফিরতে পারছেন?

—অল্পবিস্তর। ওঁর বন্ধুভাগ্য খুব ভালো। সবাই এসে সাহায্য করছে।

—বিয়েটা কবে ?

—আট তারিখে।

—আটুই অঘ্রান, বল কি ? এ তো এসে গেল, একেবারে নাকের গোড়ায়। খ্যাঁটের ব্যবস্থা ভালো হচ্ছে তো ?

—অনুষ্ঠানের ত্রুটী হবে না আশুদা। আমার শ্বশুরের জিদ চেপে গেছে। উনি সুস্থ থাকলে যেভাবে মেয়ের বিয়ে হ'ত ঠিক সেই ভাবে ধুমধাম করে ব্যবস্থা করতে চান।

—এ তো খুব আনন্দের কথা, কি খাবে বলো ? আজ তুমি আমার গেস্ট।

—শুধু চা।

—ঐ নেশাটি তোমার গেল না !

প্রভাত হেসে বলে, যাবেও না। কেষ্ট কোথায় ?

—খবর পাঠিয়েছি, আসবে এখনি।

একটু থেমে আশুদা জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের কি হয়েছে বলতো ?

—কেন ?

—কি জানি, তোমার কথা হ'লেই কেষ্ট কেমন গম্ভীর হয়ে যায়, তুমিও ওর কথা শুনলে কি যেন ভাবো।

প্রভাত গম্ভীর ভাবে বলে, বিশেষ কিছু নয়। একটা কথা ওকে জিজ্ঞেস করার আছে।

—তোমার লেখাপত্তর চলছে কি রকম ?

প্রভাত চায়ে চুমুক দিয়ে বলে, খুব বেশি লিখিনি আশুদা ! আগে পয়সার জন্যে বিস্তর লিখেছি, এখন সে দরকার নেই। মনে ইচ্ছে আছে দু'একটা ভালো বই লেখার। অবশ্য যদি সময় আর সুযোগ পাই—

এমন সময় কেষ্ট এসে পড়ে। আশুদা চেঁচিয়ে বলেন, এসো কেষ্ট, প্রভাতের তো বিয়ে লাগল।

কেষ্ট শুকনো হেসে বলে, ভালোই তো।

প্রভাত প্রশ্ন করে, কি হয়েছে তোর কেষ্ট, এত শুকনো কেন ?

—কিছু না।

—এখানে বোস।

কেষ্ট বসেই আশুদাকে উদ্দেশ্য করে বলে, আশুদা, কিছু যদি মনে না করেন প্রভাতের সঙ্গে দু'একটা দরকারী কথা সেরে নিই।

আশুদা তাড়াতাড়ি উঠে পড়েন, নিশ্চয় নিশ্চয়! আমারও অনেক কাজ পড়ে রয়েছে, সেরে নিইগে।

আশুদা উঠে যেতেই কেষ্ট কঠিন গলায় বলে, প্রভাত, 'তোর কাছ থেকে এ ব্যবহার আমি আশা করিনি।

প্রভাত মুখ তুলে তাকায়। কেষ্টকে তারই প্রশ্ন করার কথা, সেই-জন্মেই তাকে এতদিন খুঁজেছে। হঠাৎ কেষ্টর কাছে এ অভিযোগে সে বিস্মিত হয়।

—গৌরীকে যদি তোমার ফিল্মে নামাবার ইচ্ছে ছিল, একবার আমাকে জিজ্ঞেস করাও তুমি দরকার মনে করলে না ?

—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না কেষ্ট, গৌরীকে আমি ফিল্মে নামাতে যাব কেন ?

—তার মানে ?

প্রভাত একে একে সব কথা বলে যায়, নাটকের রিহার্সালে চিনুর সঙ্গে গৌরীকে দেখার পর কি ভাবে, কবে স্টুডিওতে দেখেছিল, তারপর বেলারাণীর বাড়িতে গৌরীর সঙ্গে কথাবার্তা সব বর্ণনা করে বলে, আমি তো এতদিন তোরই উপর চটে ছিলাম। ভাবলাম বিয়ে করবি বলে আবার ফিল্মে কেন নামাতে গেলি। কেষ্ট নির্বাক-বিস্ময়ে প্রভাতের কথাগুলো শোনে। ধরা-গলায় বলে, আমায় মাপ কর প্রভাত, অমি ভুল বুঝেছিলাম।

কেষ্ট হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। তার চোখ দুটো জ্বলে ওঠে; দাঁতে দাঁত চেপে বলে, গৌরী যে এত বড মিথ্যেবাদী তা জানতাম না।

আর কোন কথা না বলে কেষ্ট দ্রুত পায়ে চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে যায়। বিস্মিত প্রভাত আশুদার কাছে এসে নীচু গলায় জিজ্ঞেস করে, কেষ্টর কি হয়েছে আশুদা?

আশুদা ততোধিক গম্ভীর হয়ে বলেন, জানি না ভায়া, বোধ হয় মেয়েটা ওকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

—গৌরী আর কেষ্টর কাছে থাকে না?

—সেই রকমই তো গুজব শুনছি।

প্রভাত অনন্ত-কেবিন থেকে বেরিয়ে সোজা গেল বেলারাণীর বাড়ি। কেষ্ট ও গৌরী দু'জনকেই সে জানে। তাই তাদের মধ্যে যদি কোন রকম বিচ্ছেদ এসে থাকে তা জানার কৌতূহল স্বাভাবিক। এবং বেলারাণী যে সে-সম্বন্ধে সব কথাই জানবে সে-বিষয়েও তার কোন রকম সন্দেহ ছিল না।

প্রভাতকে দেখে বেলারাণী সত্যিই খুশি হয়। ওপরে ডেকে এনে সোফায় বসিয়ে গল্প করে, বাবা কি ছেলে, একটা চিঠি দিলে না?

প্রভাত ম্লান হাসে, চিঠি দিয়ে বিরক্ত করে কি লাভ?

—অত লাভ তোমায় কে দেখতে বলেছে, বললাম লিখতে, তা একটা কথাও যদি শোনে।

প্রভাত উত্তেজিত গলায় বলে, একটা দরকারী কথা তোমার কাছে জানতে এলাম।

—কি বিষয়ে? ছবি কি উঠছে না উঠছে সব তো অরুণাকে লিখেছি!

—তা নয়, আমি জানতে চাই গৌরীর কথা।

বেলারাণী হাসে, তোমাকেও গৌরীতে পেয়েছে নাকি? মেয়েটার বরাত ভালো।

—না, না, ওর বিষয়ে কি জান তুমি বলো।

—বিশেষ কিছু জানি না, তবে ও এখন ছবিতে কাজ করছে, আর থাকে বিনোদের কাছে।

প্রভাত বিস্মিত হয়, বিনোদের কাছে!

—হ্যাঁ, পার্ক সার্কাসে। কেন কি হয়েছে?

—না। আমি বরং উঠি।

—আশ্চর্য, আমায় বলবে না?

—বলার কিছু নেই, আমার এক বন্ধু ওকে বস্তী থেকে এনে নিজের কাছে রেখেছিল, বিয়ে-থার ব্যবস্থা পাকাপাকি। হঠাৎ আজই শুনছি গৌরী সেখানে নেই। তাই ছুটে এলাম তোমার কাছে, যদি কোন হদিশ দিতে পার!

—এত কথা আমি কিছুই জানতাম না।

—ছেলেটা খুব শক্ পেয়েছে, প্রভাত উঠে পড়ে বলে, এসো না একদিন অরুণাকে সাহায্য করবে।

বেলারাণী হেসে বলে, আর তো বেশি দিন নেই, বেচারী অরুণা, ওর ওপর খুব চাপ পড়েছে নিশ্চয়, বরপক্ষ, কনেপক্ষ দুদিকের ব্যবস্থাই তো ওকে করতে হবে।

মামুলী কথাবার্তার পর প্রভাত বেলারাণীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে।

প্রভাত নিমন্ত্রণ করার অছিলায় গিয়েছিল বিনোদের বাড়ি পার্ক সার্কাসে। বিনোদ সেখানে ছিল না। প্রভাত সরাসরি গৌরীর সঙ্গে দেখা করে। গৌরী কি ভাবে অভ্যর্থনা করবে বুঝতে পারে না। যতদূর সম্ভব নিজেকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে বলে, বসুন প্রভাতবাবু, বিনোদ এখন বাড়ি নেই। প্রভাত বসে পড়ে হাসবার চেষ্টা করে, বিয়ের নেমন্তন্ন করতে এলাম—

—তাই নাকি? বিয়ে কবে?

প্রভাত হাত বাড়িয়ে চিঠিটা এগিয়ে দেয় গৌরীর কাছে। গৌরী যতক্ষণ চিঠি পড়ে প্রভাত ভালো করে গৌরীকে নিরীক্ষণ করে। দেখে কতখানি তফাৎ। কেষ্টর সঙ্গে যে স্বভাবভীরু লাজুক মেয়েটিকে সে দেখেছিল, তার কিছুই আর বেঁচে নেই এই সুবেশা গৌরীর মধ্যে। ইচ্ছে করেই জিজ্ঞেস করে, আপনার চিঠিটা কোথায় দিয়ে যাব? এখানে, না, কেষ্টর কাছে?

প্রভাতের খোঁচাটুকু গৌরী গায়ে না মেখে বলে, কেন এইখানেই, যদি নেমন্তন্ন করার ইচ্ছে থাকে।

প্রভাত পকেট থেকে আর-একটা চিঠি বার করে তাতে নাম লিখে গৌরীর হাতে দেয়।

গৌরী নিজে থেকেই প্রশ্ন করে, আপনি কি জানতেন না আমি আজকাল এখানে থাকি?

—কি করে জানবো?

—কেষ্টদা বলেনি?

—ওর তো বলে বেড়ানো স্বভাব নয়।

গৌরী বেশি কথা বাড়াতে চায় না। প্রভাতের উপস্থিতি তার অসহ্য লাগে অথচ প্রভাত ওঠবার নাম করে না।

—স্টুডিওর জীবন কেমন লাগছে?

—ভালোই।

—এ লাইনে পয়সা আছে, তবে লেগে থাকতে হয়। আপনার কি ইচ্ছে, বরাবর থাকবেন, না দু'দিনের জন্যে?

—দেখি।

প্রভাত হাসে, মেয়েদের তো ঐ মুস্কিল, কিছুতেই লেগে থাকবে না। আজ এটা পছন্দ তো কাল ওটা—

গৌরী কথা ঘুরিয়ে নেয়, নতুন নাটক কিছু লিখছেন নাকি ?

—না, সময় পাইনি। তবে লিখব।

—চিনুর সঙ্গে দেখা হয়েছে ?'

—না।

—কেষ্টদা ?

—হয়েছে। কেষ্টটা চিরকালই বোকা, একটু মুষড়ে পড়েছে।

—বোকা বলছেন কেন ?

প্রভাত অন্যমনস্ক ভাবে বলে, জীবনটাকে বড় বেশি সিরিয়াস্‌লি নিতে চায়, তাই এত দুর্ভোগ।

—আপনি নেন না বুঝি ?

—না। এসব ছেলেখেলা। নতুন শাড়ীর শখ যেমন আপনাদের মেটে না, তেমনি মেটে না আপনাদের নতুন জীবনের চেষ্টা।

গৌরী বিরক্ত হয়, বেলা অনেক হ'ল। এবার আমায় বাইরে যেতে হবে।

প্রভাত বাঁকা হাসে, উঠতে বলছেন, পরিষ্কার করে বললেই হয়, তাতে আমি কিছু মনে করি না। উঠে দাঁড়িয়ে চারদিক তাকিয়ে বলে, বেশ বাড়ি পেয়েছেন, কোথায় বেহালার পাখির বাসার মতো একটা ছোট খুপ্‌রী, আর তার বদলে এই বিনোদের সুসজ্জিত বাড়ি।

গৌরী মুখ ঘুরিয়ে নেয়। প্রভাত হাত তুলে নমস্কার করে, এখন তো প্রায়ই দেখা হবে স্টুডিওতে। চলি তবে। বিয়েতে আসবেন, আপনি আর বিনোদ দুজনেই।

গৌরী শুকনো গলায় বলে, চেষ্টা করব, কথা দিতে পারছি না।

সেখান থেকে বেরিয়ে প্রভাত গেল কেষ্টর বাড়ি। ভেবেছিল এ সময় দেখা পাবে না, নেমন্তন্নের চিঠিখানা দিয়ে আসবে। কিন্তু কড়া

নাড়তে কেষ্ট নিজে এসে দরজা খুলে দেয়। প্রভাতকে দেখে সাদরে অভ্যর্থনা করে, ভেতরে আয়।

—নেমন্তন্ন করতে এলাম।

কেষ্ট প্রভাতকে নিয়ে উপরে উঠতে উঠতে বলে, চিঠির আবার কি দরকার। তবু চিঠিখানা প্রভাতের হাত থেকে নিয়ে ভালো করে পড়ে বলে, বেশ লেখা হয়েছে, সাহিত্যিকের বিয়ে বোঝাই যাচ্ছে।

—তোকে কিন্তু আগে থেকে যেতে হবে, সব কিছু যোগাড়যন্ত্র করা।

—যখন বলবি যাবো।

—আজই চল না, বেশ হৈ-হৈ করা যাবে।

কেষ্ট মৃদুস্বরে বলে, আজ থাক, আর একদিন যাবো।

—বাড়িতে এরকম একলা-একলা বসে আছিস কেন বল্‌তো?

—এম্‌নি।

—এম্‌নি না হাতি, আমি শুনেছি সব। ও-সব মেয়ের যাওয়াই ভালো। তুই বেঁচে গেছিস্‌।

—গৌরীকে তুই চিনিস না—

—অনেক গৌরী দেখেছি ভাই, চিনতে আর বাকী নেই। যতদিন বয়সের জোর থাকবে কেউ এদের ধরে রাখতে পারবে না।

কেষ্ট চুপ করে থেকে বলে, এক এক সময় মনে হয়, হয়তো সে অনুতপ্ত, ভয়ে আমার কাছে আসতে পারছে না। পাছে আমি রাগারাগি করি।

কেষ্ট যে গৌরীকে কতখানি ভালোবাসে তা এই ক'টি কথায় প্রভাতের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। বলে, আমি গৌরীর কাছে গিয়েছিলাম।

—কোথায়?

—বিনোদের বাড়ি, পার্ক সার্কাসে—

—দেখা হ'ল?

—হ্যাঁ।

—কথা হ'ল?

—হ্যাঁ।

—কি?

—কত কথা। দেখলাম, পুরোদস্তুর ফিল্ম অ্যাক্ট্রেস হবার চেষ্টা করছে। সে গৌরী নেই, মরেছে।

কেষ্টর চোখ দুটো আবার জ্বলে ওঠে, সত্যি প্রভাত, তুই ঠিক বলেছিস। আমারও তাই বিশ্বাস, গৌরী মরেছে। কদিন আগে আমি তাকে দাহ করেছি।

প্রভাত দেখে, কেষ্ট যেন কেমন আবোল-তাবোল বকছে, জোর করে তাকে গাড়ীতে নিয়ে যায়। চল্ আমার সঙ্গে। একলা তোকে কিছুতেই রেখে যেতে পারবো না।

কেষ্ট প্রভাতের কথামতো অরুণাদের গাড়ীতে উঠল বটে কিন্তু কিছু দূর গিয়ে মোড়ের মাথায় জোর-জবরদস্তি করে নেমে পড়ে। মিনতিভরা গলায় বলে, আজকের দিনটা আমায় রেহাই দে প্রভাত! এ কদিনের মধ্যে নিশ্চয় যাবো।

প্রথম প্রথম জলিলদের সঙ্গে থাকতে শ্যামলের অসুবিধা হলেও ক্রমে তা গা-সওয়া হয়ে যায়। জলিলরা সেই শ্রেণীর লোক যাদের অনুভূতিশক্তি কম, শুধু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সুখ দুঃখ উপভোগ করে। যাদের মধ্যে নেই কোন কৃষ্টির বালাই, সব কিছুই বড় স্পষ্ট। লুকোচুরির মধ্যে যে আনন্দ আছে, তা তাদের অভিজ্ঞতার বাইরে। শ্যামল আর যাই হোক, এ ধরনের ছেলে ছিল না। তাই প্রথম ভাল না লাগলেও মুখ বুজে কাটিয়ে দিত। কিন্তু এখন মনে হয়, এ মোটা জীবনটার মধ্যে কিছুই অস্বাভাবিক নয়।

জলিলরা মেয়ে দেখলে চোখ দিয়ে গিলে খায়। শ্যামলের মনে হত এ বড় অসভ্যতা। কিন্তু এ কদিনে সে নির্লজ্জ ভাবে তাকাতে শিখে গেছে। এর মধ্যে যে একটা আনন্দ আছে তা সে এর আগে বুঝতে পারতো না। অবশ্য মঙ্গলা এসে পড়ায় শ্যামল এ কদিনে খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে উঠেছে! তাই প্রত্যেক দিন রাত্রে সে মঙ্গলার বাসায় যায়। সারা রাত কাটিয়ে ভোরবেলা জলিলদের কাছে ফিরে আসে।

জলিল টিটকিরি কাটে। মেয়েছেলে ছাড়া এক রাতও কাটাতে পারিস না! আচ্ছা ছেলে তুই। শ্যামল উত্তর না দিয়ে খাটিয়ার উপর শুয়ে পড়ে।

তোর বেহালার ছুঁড়িটা ভালো ছিল, তবু তাজা, মঙ্গলার মত বাজারের জিনিস নয়।

শ্যামলের গৌরীর কথা মনে পড়লো। এক ঘরে কত রাত তারা শুয়েছে। কিন্তু কোন দিন তার দেহের প্রতি শ্যামলের নজর পড়েনি। এখন যদি এক রাত সে ঐ রকম ভাবে কাটাতে পারতো, একথা ভেবে শ্যামল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আড়মোড়া ভাঙ্গে।

সত্যি মঙ্গলা তাকে হাতে ধরে কৈশোর থেকে যৌবনে উপনীত করেছে। মঙ্গলা তাকে বলে, দুষ্টু লোকের সঙ্গে বেশি মিশো না! আমি খবর দিয়ে দেব, তুমি জলিলদের কাছে ঐটুকু বলেই টাকা আদায় করে নিও।

শ্যামল হেসে বলে, তাতে কি হয়েছে। ওদের সঙ্গে ঘুরতে আমার বেশ ভাল লাগে। সেদিন যে তোমার কথামতো আমরা গাড়ী নিয়ে পালালাম, তার মধ্যে কি আনন্দ।

মঙ্গলা ভয় পায়—যদি ধরা পড়তে?

—কে ধরবে? অত ভয় পেলে দুনিয়ায় থাকা চলে না। শ্যামল মঙ্গলাকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করে বলে, কিছু ভয় নেই তোমার। রোজ রাত্রে দেখবে আমি ঠিক আসবো।

শ্যামলের সঙ্গে পুরোন বন্ধু-বান্ধবদের কারুরই দেখা হয় না। মদন আর চুনীলালের উপর যে আক্রোশ জমা হয়েছিল, তাও সে একরকম ভুলে গেছে বললেই হয়। প্রতিহিংসা নেবার কল্পনা আর নেই। এমন কি, বটুমামাকেও একলা পেলে সে হয়তো কিছু বলবে না, একমাত্র অভিমান তার কেষ্টদার ওপর। কেষ্টদা যে তার প্রতি অন্যায় করেছে, একথা সে চেষ্টা করেও ভুলতে পারে না। কেষ্টদার কথা সে শুনতো। তাকে সে সত্যিই ভালোবেসেছিল, অথচ সেই কেষ্টদা বেইমানী করলে।

আগে দুঃখ পেলে মার কথা তার মনে পড়তো, হয়তো নীরবে চোখের জল ফেলতো, কিন্তু মার সেই ছবিতে দেখা মুখখানা আর তার মনে পড়ে না। বাবা সম্বন্ধে অন্য কথা। শুধু ঐ বাবা শব্দটার সঙ্গেই সে পরিচিত! তাঁর অন্তরের কোন স্পর্শই সে পায়নি। মামার বাড়ি থেকে চলে আসার আগে একদিন মামার সঙ্গে বটুমামার টুকরো আলোচনায় সে শুনেছিল, তার বাবা মফঃস্বলে আবার বিয়ে করেছেন। সে-কথা শশধরবাবু শ্যামলকে আর কোন দিন বলেননি। কিন্তু কলকাতায় তার আগে তিনি মাসে একবার করে আসতেন। ক্রমে তা তিন মাসে একবার হয়ে দাঁড়াল। শ্যামল এ নিয়ে মনে মনে যথেষ্ট ব্যথা পেয়েছে। কোন দিন মুখ ফুটে তা বলেনি। আজ শ্যামলের মনে হয় সে চলে আসায় সবাই হয়ত সুখী হয়েছে। বাবা নতুন সংসার নিয়ে ব্যস্ত। শ্যামলকে মন থেকে মুছে ফেলেছেন। মামার বাড়িতে সে ছিল বাইরের ছেলে, এখন তারাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছে। সেই ফেলে-আসা দিনের কথা শ্যামল আর মোটেই ভাবতে চায় না। সব কিছুই তার দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়।

কালী একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, এখানে কি রকম লাগছে, তোর মন টিকবে? শ্যামল উৎসাহভরে বলে, নিশ্চয়।

—সাবাস। কালী শ্যামলের পিঠ চাপড়ায়। এখন তুই আমার পায়ের কড়ে আঙুল। হবি বুড়ো আঙুল। পরে বাঁ পা, ডান পা। শেষে বাঁ হাত, ডান হাত। ব্যস! হাজার টাকা রোজগার।

শ্যামল কালীর পায়ে প্রণাম করে। ভাবে, এ লোকটা খুব খাঁটি। এতটুকু ফাঁকি নেই এর মধ্যে, আজকের দিনে যারা কালীর হাত, পা, আঙুল, তাদের সকলের সঙ্গেই শ্যামল সুপরিচিত। একদিন সে তাদের মতো হবে এতে আর আশ্চর্য কি?

এরই মধ্যে একদিন সন্ধ্যের মুখে ছোট ভাঙ্গা দু'দরজার গাড়ী চালিয়ে শ্যামল বালীগঞ্জ স্টেশনের কাছে গ্যারাজ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল রাসবিহারী এভিনিউ ধরে। গড়েহাটা বাজারের কাছে গাড়ী থামিয়ে পান, সিগারেট কিনতে নামে। নজরে পড়ে অনেকগুলি মেয়ে ট্রাম থেকে নেমে রাস্তা পার হচ্ছে। তাদের মধ্যে একজনকে সে চিনতে পারে, সে নন্দিতা।

নন্দিতা রাস্তা পার হয়ে 'আলেয়া'র সামনে দিয়ে আসছিল। শ্যামল ইতস্তত করে এগিয়ে যায়; নমস্কার করে বলে, চিনতে পারছেন?

শ্যামলকে দেখে নন্দিতা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, চারদিক তাকিয়ে নীচু গলায় বলে, শুনেছেন তো সব? সামনের সপ্তাহে বিয়ে।

শ্যামল বলে, তাহলে মনুদা?

—আমি যে কি করব বুঝে উঠতে পারছি না। বাবা কিছুতেই রাজী হলেন না।

শ্যামল অন্যমনস্ক ভাবে বলে, মনুদা কিন্তু পাগল হয়ে যাবে। ও আপনাকে—

—আমি বুঝতে পারছি, সব বুঝতে পারছি। এই তো দু' একদিন

মাত্র বাড়ি থেকে বেরুতে পেরেছি বন্ধুদের নেমন্তন্ন করার জন্যে। মনুদাকে একটা খবর পর্যন্ত দিতে পারি না। আমার সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দেবেন ?

—নিশ্চয়।

—কবে ?

—আজই।

নন্দিতা খুশি হয়। ঘণ্টাখানেক আমার সময় আছে। তার মধ্যে হবে ?

—কেন হবে না ? আমার সঙ্গে গাড়ী আছে। বালীগঞ্জ স্টেশনের কাছে একটা বাড়ির কাছে আপনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি মনুদাকে নিয়ে আসি।

নন্দিতা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করে, কেউ জানতে পারবে না তো ?

—কোন ভয় নেই।

নন্দিতা শ্যামলের কথামতো ওর ভাঙ্গা গাড়ীর পেছনের সিটে বসে। শ্যামল জোরে গাড়ী চালিয়ে বালীগঞ্জের গ্যারাজে নিয়ে আসে। বড় দরজা বাইরে থেকে বন্ধ ছিল। ধাক্কা দিয়ে খুলে নন্দিতাকে ভেতরে নিয়ে যায়। জলিল তখন একটা গাড়ী মেরামত করছে।

শ্যামল আলাপ করিয়ে দেয়, এ আমার এক বন্ধু। জলিলকে বলে, তুই দেখিস ওঁকে, এখানে রেখে যাচ্ছি।

নন্দিতা ব্যস্ত হ'য়ে প্রশ্ন করে, আপনি কতক্ষণে ফিরবেন ?

—আধ ঘণ্টাও লাগবে না। যাবো আর আসবো।

জলিল তখন গাড়ীতে হাতুড়ি মেরে শব্দ করছে। নন্দিতাকে ঘরে খাটিয়ার উপর বসিয়ে শ্যামল সদর দরজা বন্ধ করে দ্রুত গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে যায়। প্রায় ল্যান্সডাউন মার্কেট পর্যন্ত কোন দিকে না তাকিয়ে সে হু-হু শব্দে গাড়ী ছোটায়। এক-একবার ভাবে, মনুদাকে যদি খুঁজে

না পায়, নন্দিতা বড়ই নিরাশ হবে। মনুদার কথা মনে পড়তে তার মুখখানা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বড় নিরীহ ভদ্রলোক। নন্দিতার বিয়ে হ'য়ে গেলে মনে বড়ই কষ্ট পাবে। তার পরই মনে হয় যদি মদনের সঙ্গে দেখা হয়, সেই মদন, চুনীলাল, তাদের আড্ডা-সঙ্ঘ বিতাড়িত শ্যামলকে কি ভাবে নেবে কে জানে। হয়তো পাঁচশো প্রশ্ন করবে। টিটকিরি কাটবে। ভাবতেই শ্যামলের গা গুলিয়ে ওঠে। এতদিনের স্নে পুঞ্জীভূত রাগ মদন ও চুনীলালের ওপর পোষা ছিল, তা আবার চাড়া দিয়ে ওঠে। হঠাৎ মনের মধ্যে বিপ্লব শুরু হয়। কেন সে মনুদার উপকার করবে? কে এই নন্দিতা? কে এই মনুদা? তার তো কেউ নয়? মানুষের উপকার করা যদি ধর্ম হয় তবে সে ধর্ম তো কোন দিন তার প্রতি কেউ পালন করেনি? দুনিয়ায় সকলের কাছে সে শুধু কেবল অধর্মের ভাগ পেয়ে থাকে। লাঞ্ছিত, অপমানিত হয়ে থাকে। তবে আজ হঠাৎ কেন সে উদার মহৎ হয়ে উঠবে? সবাই ভাবে, শ্যামল আজ অধম নীচ—সে তাই হোক।

নন্দিতা ষোড়শী, চেহারায় তার যথেষ্ট আকর্ষণ আছে, আজ যখন তাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছে, কেন তাকে উপভোগ করবে না? চিরকাল যাদের উচ্ছিষ্ট পেয়ে জীবন কাটাতে হবে, তাদের কি প্রসাদ পাবার কোন অধিকার নেই?

বিদ্রোহী শ্যামল গাড়ী ঘোড়ায়। জোরে, আরও জোরে ফিরতে থাকে। তার মন ছুটেছে তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য —তেকোণ পার্কের কাছে এসে গাড়ীর চাকা ফেটে গেল। শ্যামল বিরক্ত হ'য়ে নেমে চাকা বদলাতে থাকে। গাড়ীতে যন্ত্রপাতি ছিল না। দোকান থেকে যন্ত্র এনে চাকা পাল্টে বেরুতে অনেক দেরি হ'য়ে যায়।

বালীগঞ্জের গ্যারেজে যখন এসে পৌঁছল, বেশ রাত হ'য়ে গেছে। নিঝুম নিস্তব্ধ পাড়া, ধাক্কা দিয়ে দরজা খোলে। গাড়ী ভেতরে ঢুকিয়ে

আবার দরজা বন্ধ করে দেয়, মনে মনে তৈরি করে নেয় কি ভাবে নন্দিতার সঙ্গে কথা শুরু করবে। কেন মদুদার সঙ্গে দেখা হল না? কোথায় গেছে ইত্যাদি। বাইরের খাটিয়ায় জলিল উপুড় হ'য়ে শুয়ে রয়েছে, সারাদিন খেটে বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে, ইচ্ছে করেই তাকে জাগায় না। দ্রুত পায়ে ভেতর দিকে যায়, নিশ্চয় নন্দিতা সেখানে অধীর হ'য়ে বসে আছে। দরজা বন্ধ, ভেতর থেকে কোন রকম ভারী জিনিস দিয়ে আটকান হ'য়েছে, বন্ধ করার খিল বা ছিটকিনি কিছুই তো নেই। শ্যামল জোরে ধাক্কা দেয়, দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে, টেবিল চেয়ার হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ে। শ্যামল কিন্তু ভেতরে ঢুকতে পারে না! অন্ধকার ঘরের মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পায় কড়িকাঠের সঙ্গে কাপড় বাঁধা। তাইতে নন্দিতার প্রাণহীন দেহটা ঝুলছে। কি বীভৎস। কি ভয়ঙ্কর! মুখে হাত চেপে শ্যামল চিৎকার করে ওঠে। ভয়ে ভয়ে, পেছু ফিরে বেরিয়ে আসে। ছুটে গিয়ে জলিলকে ডাকে, জলিল, সর্বনাশ হয়েছে। ওঠ।

অনেক কষ্টে জলিল চোখ মেলে তাকায়। শ্যামল বোঝে, সে মাতাল।

শ্যামল ব্যস্ত হয়ে বলে, মেয়েটা গলায় দড়ি দিয়েছে। তুই জানিস কিছু?

জলিল বেমালুম মাথা নাড়ে।

—এখন কি হবে? শ্যামলের গলা কাঁপছে।

জলিল জড়ানো গলায় প্রশ্ন করে, একেবারে মরে গেছে?

—আমি কাছে গিয়ে দেখিনি।

—তাহলে লাশটা ফেলে দিয়ে আসতে হবে।

শ্যামলের বুক ধড়ফড় করে—কোথায়?

—যেখানে হোক, রাত হতে দে।

জলিল আবার শুয়ে পড়ে। একলা শ্যামলের ভয় লাগে, ঘরের দিকে তাকিয়ে চুপ করে সে জলিলের কাছে বসে থাকে, এতটুকু

নড়বারও সাহস হয় না। মন্টুদার প্রেম সার্থক। নন্দিতা তার জন্যে আত্মহত্যা করে, এর মূল্য মন্টুদা কি ভাবে দেবে, শ্যামল ভেবে পায় না।

অনেক রাত্রে নন্দিতার মৃতদেহটা কাপড়ে মুড়ে জলিল আর শ্যামল গাড়ীতে করে বেরিয়ে পড়ে। জলিল শুধু একবার বলেছিল, কোথা থেকে মেয়েটাকে জুটিয়েছিলি! কিছু বোঝে না। একদম আনকোরা নাকি। শ্যামলের এই প্রথম খেয়াল হয়, জলিলের মুখে, গলায় সব জায়গায় সে দেখেছে, নখ দিয়ে খামচান রক্তের দাগ। জলিলের দিকে তাকিয়ে সমস্ত শরীর তার ঘেন্নায় কুঁচকে ওঠে।

পরদিন খবরের কাগজে একটি কুমারী মেয়ের আত্মহত্যা-বিবরণী বার হয়। গলায় ফাঁস লাগিযে তাইতে ভারী পাথর বেঁধে জলে ডুবে ছিল। কি ভাবে কেমন করে, কিছুরই হদিশ পাওয়া যায়নি। রাত্রে নন্দিতাকে ফিরতে না দেখে বাড়ির লোক চারদিকে খুঁজতে বেরিয়েছিল। কাগজের খবর দেখে সনাক্ত করে এসেছে। মৃতা মেয়েটি আর কেউ নয়, নন্দিতা। বাড়িতে কান্নার রোল ওঠে। বিয়ে-বাড়িতে আনন্দ এক নিমেষে নিবে গেল। বরপক্ষ কলকাতায় বাড়ি ভাড়া করে এসেছিল, রাতারাতি অন্য জায়গায় বিয়ে ঠিক করে ফেলে। আত্মীয়েরা বললে, কি কেলেঙ্কারী, মরেও বাপ-মার মুখে কালি দিয়ে গেল। পাড়ার ছেলেরা সকলেই এই আকস্মিক ঘটনায় বেশ আঘাত পেয়েছে। আগের মত আড্ডা-সজ্যের পাথরে গিয়ে বসলেও হৈ-চৈ করে না।

চুনী আক্ষেপ করে বলে, মেয়েটা সত্যিই 'জেম্‌ইন' ছিল, আমি ভাবতাম বুঝি ইয়ার্কি করছে। মনের জোর না থাকলে কেউ আত্মহত্যা করতে পারে?

নন্দিতার মা'র চোখে অবিরল জলের ধারা। তাঁর দুঃখে কে সান্ত্বনা দেবে?

নন্দিতার বাবা নিজেকে অপরাধী মনে করেন, মন্টুর সঙ্গে বিয়ে দিলে এ অঘটন যে ঘটত না সে-বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ।

আর মন্টুদা? এক মুখ খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, চোখ বসে গেছে, পাগলের মত ঘোলাটে চাউনি। ক্লান্ত স্বরে বলে, অশৌচ শেষ হলে তীর্থে চলে যাবো।

মদনরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, নন্দিতা মরে বেঁচে গেছে। মন্টুদার ট্রাজেডী চোখে দেখা যায় না।

মন্টুদার মত আরেক জনও অশান্তিতে দিন কাটিয়েছে, সে শ্যামল। সমাজ, সংসার, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সবাইকে অগ্রাহ্য করতে পারলেও শ্যামল এখনও বিবেককে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিতে পারে নি। বিবেকের দংশনে বড় জ্বালা। সারা রাত সে ছটফট করেছে। ভোর থেকে মঙ্গলার কাছে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। কিছুতেই তাকে বাড়ি থেকে এক-পা বেরতে দেয় নি। সারাক্ষণ মদের বোতল আর গেলাস নিয়ে চোখ লাল করে বসে আছে।

মঙ্গলা ভয় পেয়ে বলে, কি করছ, মরে যাবে যে!

শ্যামল উত্তর না দিয়ে শুধু মাথা নাড়ে। ক'দিন এক-নাগাড়ে ঐ ভাবে বসে থাকে।

আড্ডায় ফিরতে না দেখে জলিল বুঝতে পেরেছিল, শ্যামল অনু-শোচনার আত্মগ্লানিতে কোথাও লুকিয়ে আছে। নিজে এসে মঙ্গলার বাসা থেকে শ্যামলকে টেনে বার করে নিয়ে যায়। বলে, ও কি করছিস?

শ্যামল নেশার ঝোঁকে কেঁদে ফেলে, আমি পাপ করেছি।

—দূর শালা, তুই পাপ করলি কিসে, যা করলাম তা তো আমি।

—তোমার ভয় করে না?

—কিসের ভয়?

শ্যামল এক কথায় উত্তর দিতে পারে না। ভয় যে অনেক কিছুর।

ইহকালের, পরকালের, ধর্মের, অধর্মের, পাপের, পুণ্যের। এত দিনের সংস্কারের বোঝা তার ঘাড়ের ওপর আজ চেপে বসেছে।

জলিল কিন্তু বেপরোয়া ভাবে বলে, ভয়? সে তো শুধু পুলিসের, আমি লাল পাগড়ির তোয়াক্কা করি না। ব'লে জলিল হাতের বুড়ো আঙুল নাড়তে থাকে

অনিচ্ছা সত্ত্বেও শ্যামলকে জলিলের সঙ্গে বেরিয়ে আসতে হয়। জলিল চাপা গলায় বলে, এখন কি আর নষ্ট করার সময় আছে? দেবেন শালা রাজী হয়েছে। কালীর হুকুম, এই সপ্তাহেই গয়না সরাতে হবে। খুব হুঁশিয়ার। তুই থাকবি আমার পাশে।

কেষ্ট যদিও প্রভাতকে কথা দিয়েছিল বিয়ের আয়োজন করতে তাদের বাড়ি যাবে কিন্তু এর মধ্যে একদিনও যেতে পারেনি। বার বার মনে হয়েছে তাদের আনন্দের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে না পেরে মিছিমিছি বিমর্ষ থেকে ছন্দপতন ঘটিয়ে লাভ কি?

প্রভাত ইতিমধ্যে দু'একদিন লোকও পাঠিয়েছিল, কেষ্ট বাড়ি ছিল না বলে তাদের এড়িয়ে যেতে পেরেছে। এদিকে পুঁজি ফুরিয়ে আসছে। এক একবার মনে করে আবার আগের মত টাকা রোজগার করতে বার হবে। পরক্ষণেই ভাবে, তারই বা কি প্রয়োজন? একেবারে হাতে পয়সা না থাকলে তখন দেখা যাবে। ঠিক এইরকম যখন মনের অবস্থা, নিজের কর্তব্য যখন নিজেই ঠিক করতে পারছে না, সেই সময় ব্রজদুলালের কাছ থেকে একখানা দীর্ঘ চিঠি এসে পৌঁছল।

"প্রিয় কেষ্টবাবু,

তোমার ছোট চিঠিটি যথাসময়ে পেয়েছি। পেয়েই উত্তর দিতে বসলাম। আমাদের কথা জানতে চেয়েছো, সকলেই ভাল আছি।

মিঠু, কিটু আর শ্যামা সারাক্ষণই তোমার কথা বলে। আমাকে চিঠি লিখতে দেখে ছেলেরা বলছে লিখে দাও, দাদু যেন তাড়াতাড়ি চলে আসে। ওরা তোমায় সত্যিই ভালোবাসে।

চিঠির এক জায়গায় লিখেছ, কলকাতা তোমার ভাল লাগছে না। এ তো অত্যন্ত স্বাভাবিক কথা। আমি তো দু'দিনের জন্য শহরে গিয়ে তিষ্ঠতে পারি না। গ্রামের সহজ সুন্দর জীবনের স্বাদ পেলে আর কি শহরের শুকনো জীবন ভালো লাগে? সকলের চেয়ে বড় অভাব ওখানে প্রাণ নেই। এখানে অনুভব করি মানুষের মধ্যে আন্তরিকতা আছে। এইটাই এখানকার সবচেয়ে বড় সম্পদ। কলকাতায় নিজের মতলব ছাড়া, স্বার্থ ছাড়া, কেউ কারুর জন্যে কোন কাজ করে না। প্রত্যেকটি দিন সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত নিজেদের আত্মরক্ষা করে চলতে হয়, সব সময় ভয়, কে কোথায় ঠকিয়ে দেবে, কে কোথায় ন্যায্য পাওনা দেবে না। যারা জন্মেছে কলকাতায়, মানুষ হয়েছে কলকাতায়, মারা যাবে কলকাতায়, তাদের জন্যই ওই শহর, আমাদের জন্য নয়।

অতএব এখান থেকে ফিরে গিয়ে তোমার যে শহর ভালো লাগছে না তাতে আমি এতটুকু আশ্চর্য হইনি। কিন্তু দুঃখ পেয়েছি আর-একটি কথায়।

তুমি লিখেছ, মনে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না। এইটাই খুব বেশি ভাববার কথা। আমি তো মনে করি সুখ ও শান্তির সুধার স্বাদে যে জীবন ধন্য হতে পারেনি তার জীবন ধারণের কোন সার্থকতা নেই। মনে আছে বোধ হয়, তুমি আমায় বোঝাতে চেয়েছিলে এ জগতে বড় হবার একমাত্র পথ লোক ঠকিয়ে টাকা রোজগার করায়। তোমার কথায় যুক্তির অভাব ছিল না। নিদর্শন দিয়ে দেখিয়েছিলে, আজকের দিনে অধিকাংশ পয়সাওয়ালা লোকেরাই অসৎ। বলেছিলে, ডাক্তার রোগীকে ফাঁকি দিয়ে, উকিল মক্কেলকে ফাঁকি দিয়ে, মাস্টার ছাত্রকে ফাঁকি দিয়ে,

ব্যবসাদার খদ্দেরকে ফাঁকি দিয়ে ব্যাঙ্কে জমার অঙ্ক বাড়াচ্ছে। একথা অস্বীকার করার কিছু নেই, কিন্তু তাই বলে আমরাও সেইপথ ধরব কেন?

একবার ভালো করে ভেবে দেখো। সুখ ও শান্তি যদি জীবনের কাম্য হয়, তাহলে এই পয়সাওয়ালা লোকগুলো কি বা পেয়েছে? পেলে এ ভাবে নিজেদের মধ্যে খাওয়া-খাওয়ি করত না। আমি বলছি বিশ্বাস কর, এরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। স্বামী স্ত্রীকে নয়, ভাই ভাইকে নয, বন্ধু বন্ধুকে নয়। এই যে অবিশ্বাস, সংশয়, সন্দেহ, এর মধ্যে দিয়ে কি সুস্থ জীবন গড়ে উঠতে পারে?

এ নকল সভ্যতা বাঁচতে পারে না। ভিৎ যার দুর্বল তা টিকে থাকবে কিসের জোরে? আমাদের চোখের সামনে আজ ভেজালে দেশটা ভরে গেল। তেল ঘি থেকে শুরু করে সাহিত্যে, শিল্পে, সামাজিক জীবনে। তুমি কি বলতে চাও, এই ভেজাল-মেশানো সভ্যতা বেঁচে থাকবে? ঘুনধরা ইমারতের ভিত্তি আলগা হবে না? পড়বে, সব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। কোথাও কোন দিন মিথ্যের রাজ্য কায়েমি হয়নি, এখানেও হবে না। তার জন্যে যুদ্ধ করতে হবে তোমাকে, আমাকে, শ্যামাকে, সবাইকে, যারা এখনও এই ভেজালের নেশায় মশগুল হয়নি।

আমি তোমায় অনুরোধ করছি কেষ্টবাবু, আর উদাসীন হযে থেকো না, ভালো ভাবে নিজেকে বিচার করে দেখো। সারা জীবনটাই কি আলেয়ার পেছনে ছুটবে? আজও কি সৃষ্টি করার সময় আসেনি? ভুলে যাও ছোট ছোট স্বার্থের কথা, নিজেদের গণ্ডির কথা। তার বাইরেও একটা বিরাট জগৎ আছে, তার প্রযোজনে তুমি সাড়া দেবে না?

ভেবে-চিন্তে উত্তর দিও। আমি তোমায় কিছু জোর করছি না। এখানকার স্কুলের ড্রিল মাস্টারীর পদ খালি আছে। তোমাকে পেলে আমরা ধন্য মনে করব। ভালবাসা নিও।

ইতি গুণমুগ্ধ ব্রজদুলাল।"

কেষ্ট বার বার চিঠিখানা পড়ে, দেখে, ব্রজদুলালের সঙ্গে তার চিন্তার অনেক মিল আছে। দুজনেই একই কথা ভাবে কিন্তু পদ্ধতি আলাদা। কেষ্ট চায় ভাঙ্গনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে। ব্রজদুলাল ভাঙ্গনের প্রতিরোধ করে রুখে দাঁড়াতে চায়। কেষ্টর মতো তার মনে নৈরাশ্যবাদের ছায়াটুকু নেই। সে কর্মে বিশ্বাসী, বিশ্বাস করে পাঁকে ফুল ফোটানো যায়। নকল সভ্যতার পচধরা শিকড় উপড়ে ফেলে নতুন বীজ সে পুঁততে পারবে। তাই তো কেষ্টকে সে সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

সারা দিন ভেবেও কোন রকম সিদ্ধান্তে কেষ্ট পৌঁছতে পারে না। পাগলের মত এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়। পকেট থেকে চিঠিটা বার করে পড়ে, আবার রেখে দেয়। সত্যিই তো, যে ভাবে সে গৌরী আর শ্যামলকে গড়ে তুলতে চেয়েছিল তারা তো সে পথের ইঙ্গিত বুঝতে পারেনি? কেষ্ট তো কোন দিন বিবেককে বিসর্জন দিতে বলেনি, কিন্তু এরা তো প্রথমেই বিবেকই বলি দিল! তাদের শিখিয়েছিল, যারা অন্যায় করে তাদের ঠকালে কোন দোষ হয় না। কিন্তু এরা যে ন্যায়-অন্যায়ের কোন ধারই ধারল না।

শ্যামল এখন কি করছে কে জানে! বিবেককে বলি দিলে মানুষ তো সব কিছুই করতে পারে। আর গৌরী? ভাবতেই কেষ্টর মাথা ঝিম-ঝিম করে ওঠে, সে এখন দেহটাকে মূলধন করেছে। নারীত্বের অবমাননা এর চেয়েও আর কি হতে পারে? কেষ্ট সিদ্ধান্ত করে, সে কিশোরপুর চলে যাবে। চিঠির উত্তর দেবার কথা ভাবতেই চিন্ময় কথা মনে পড়ল। বেহালায় গেলে সে এখুনি খুশি হয়ে লিখে দেবে।

বেহালার বাড়িতে পৌঁছতেই বাইরের বারান্দায় চিন্ময়র সঙ্গে দেখা। কেষ্টকে দেখে তার সারা মুখ হাসিতে ভরে যায়। বলে, কেষ্টদা, কত দিন বাদে এলেন?

—ব্যস্ত ছিলাম, বড় ব্যস্ত।

—চলুন, আমার ঘরে বসবেন চলুন।

—তোমার ঘরে? কেষ্ট ইতস্তত করে।

—তাতে কি হয়েছে, আপনার ঘর যে নোংরায় ভর্তি।

—পিনাকী বাড়ি নেই?

—না। ব'লে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে কেষ্টকে নিয়ে চিনু নিজের ঘরে ঢুকে যায়।

কেষ্ট এই প্রথম চিনুর ঘরে এল। ঘরটি আয়তনে ওরই ঘরের মতো কিন্তু সুসজ্জিত। চিনুর রুচির প্রশংসা না করে পারা যায় না। ছোট দু'খানা চেয়ার, একটা টেবিল, সবুজ রঙের টেবিলঢাকা, বিছানা, আলনা, সব কিছুই পরিপাটি করে রাখা। অগোছাল মোটেই নেই। কেষ্ট চেয়ারে বসে ব্রজদুলালের চিঠিটা চিনুর দিকে এগিয়ে দেয়। সমস্ত চিঠিটা পড়ে চিনু বুকভরা নিশ্বাস নিয়ে বলে, কি সুন্দর! যেমনি ভাষা তেমনি ভাব!

কেষ্ট মৃদুস্বরে বলে, হাজার হোক ইস্কুল-মাস্টার, ভালো তো লিখবেই।

—আপনি কি ঠিক করলেন?

—ভাবছি চলে যাবো।

—সত্যি?

কেষ্ট চিনুর মুখের দিকে তাকায়, কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না?

—কি জানি, চিনু দীর্ঘশ্বাস ফেলে, বসুন, আমি চায়ের জল চড়িয়ে দিই।

চিনুর ব্যবহারে কেষ্ট বিস্মিত হয়। ফিরে এলে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি চাও না আমি যাই?

চিনু নিচের দিকে তাকিয়ে বলে, আমার চাওয়া না চাওয়ায় কি এসে-যায়?

কেষ্ট লক্ষ্য করে চিনুর গলায় আজ অন্য কণ্ঠস্বর—একথা বলছো কেন ?

—আপনাকে আমি কি বোঝাব ? একজনের উপর রাগ হ'ল তো দেশ ছেড়ে চললেন। যেখানে যান তাতে আমার আপত্তি নেই, তবে দুঃখ হয় এই ভেবে যে, ভালো মনে আপনি যাচ্ছেন না, যাচ্ছেন বুক-ভরা অভিমান নিয়ে—

—তুমি আমার জন্যে এত কথা ভাবো ?

চিনু ম্লান হাসে, ভাবি শুধু আজ থেকে নয়, যেদিন থেকে আপনাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে সেদিন থেকে। আশ্চর্য লাগত এই দেখে, আপনি গৌরীকে কতখানি ভালোবাসতেন অথচ সে তার কিছুই বুঝত না !

কেষ্টর কৌতূহল জাগে, তুমিই বা কি করে বুঝলে ?

—আমি যে ঘর-পোড়া গরু।

—তার মানে ?

—গৌরী আপনাকে আমার কথা বলেনি ?

—না।

—আমার ইতিহাস অনেকটা আপনার মতোই। বাবা, মা মারা যান আমার দশ বছর বয়েসে। ছিলাম দাদাদের সংসারে। চার দাদা, তিন দিদি, সাতটা সংসার। এক একজনের বাড়ি পালা করে থাকতাম। কোথাও সাত দিন, কোথাও এক মাস। কথায় বলে, ভাগের মা গঙ্গা পায় না, আমি বলি ভাগের বোন বাঁচতে পারে না। মনে হত সকলেই আমাকে যেন অনুগ্রহ করছে। এই দুঃসময়ের মধ্যে পিনাকীর সঙ্গে আলাপ। আমার সেজদার বন্ধু, ভাল ফোটোগ্রাফার।

—তখন তোমার বয়স কত ?

—পনের-ষোল বছর। পিনাকী আমার ছবি তুলে পত্রিকায় ছাপাত। ছ'বছর অনাদর অবহেলায় মানুষ হয়ে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে হত। পিনাকীকে ভালো লাগত। বাড়িতে এ নিয়ে কথা উঠল। মার পর্যন্ত

খেলাম। পিনাকী লোভ দেখালে বিয়ে করবে, সংসার পাতবে। বিয়ের চেয়ে নিজের সংসার হবে এর প্রলোভন ছিল আমার কাছে বিরাট। একদিন ওর কথায় বেরিয়ে এলাম। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে চিরকালের মতো বিচ্ছেদ হয়ে গেল। পিনাকী আমায় এনে তুলল এইখানে। ছ'বছর এখানে রয়েছি।

—পিনাকী বিয়ে করবে না?

—না। গোড়ায় বলত করবে, এখন জানিয়েছে সম্ভব হবে না।

—স্কাউণ্ড্রেল, তবে তোমায় বার করে এনেছিল কেন?

—বিনা পয়সায় ছবি তোলার মডেল পাবে বলে। কত ছবি তুলেছে, রোজগার করেছে, এখন আর-একজনের পেছনে ঘোরে—

—মানে?

—চিত্রা। আমার চেয়েও ছোট, তার ছবি বেশি দামে বিক্রি হয়।

কেষ্ট থমথমে মুখে বলে, আমি পিনাকীর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—সে তো আর এখানে আসে না।

—সে কি?

—অনেক দিন হল। আপনি কিশোরপুর যাবার আগে থেকে।

—তুমি একলা থাকো, একথা তো আমায় বলনি?

—কি প্রয়োজন—

চিনু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বলে, পিনাকী আমার সর্বনাশ করেছে। শুধু এক ব্যাপারে আমি কিছুতেই তাকে প্রশ্রয় দিইনি। যাতে না আমাদের কোন অবৈধ সন্তান হয় তার জন্যে প্রাণপণ যুদ্ধ করেছি। আমার জীবন তো গেছেই, কোন নিষ্পাপ শিশুকে এ দুর্ভোগের মধ্যে টেনে আনতে চাইনি।

কেষ্ট মাথা নেড়ে বলে, অথচ তুমি তো সংসার ভালোবাস চিনু!

চিনুর গলা কান্নায় ভরে আসে, প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি কেষ্টদা।

তারই আশায় একদিন বাড়ি থেকে ছুটে পালিয়ে এসেছি অথচ সব যেন কি রকম হয়ে গেল!

চিনু সামলাতে পারে না, মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে উঠে যায়। কেষ্ট একলা বসে ভাবে, চিনু আজ তার সামনে নতুন সমস্যা নিয়ে এসে দাঁড়াল। এতদিনের মধ্যে তার কথা চিন্তা করার কোন প্রয়োজন কেষ্ট দেখেনি, কিন্তু আজ মনে হল, চিনুও তো একা, নির্ভর করার মতো কেউ তো তার নেই?

প্রভাতের বিয়ে নিয়ে সকলেই মেতে উঠেছে। অরুণার বাবার শরীর খারাপ হলেও মনের জোরে দাঁড়িয়ে উঠেছেন! একমাত্র মেয়ের বিয়ে, তিনি ঘটা করবেনই, কারুর নিষেধ শুনবেন না। বার বার প্রভাতকে বলছেন, খুব খেয়াল রেখো। সকলের যেন খাতির-যত্ন ঠিক মতো হয়। কেউ কোন কষ্ট না পায়।

রমেশবাবুর বন্ধুভাগ্য সত্যিই ভালো। একজন তাঁর বাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন, সেখান থেকে অরুণার বিয়ে হবে। আত্মীয়-স্বজন অনেকে এসেছে। সকলের চেয়ে বড় কথা, রমেশবাবুর সবিশেষ অনুরোধে প্রভাতের বাবা-মা দুজনেই কাশী থেকে ক'দিনের জন্য কলকাতায় এসেছেন। হৈ-হৈ আনন্দে পরিপূর্ণ।

প্রভাতের বন্ধুদেরও ব্যস্ততার শেষ নেই। অনন্ত-কেবিনের আশুদা থেকে শুরু করে বেয়ারা পর্যন্ত সকলের বাঁধা হাজিরা। ভোতন, বিশু, মানিক যারা সব সময়েই অনন্ত-কেবিনে চায়ের পেয়ালা নিয়ে সময় কাটায়, তারা এখন প্রভাতের বাড়িতেই আড্ডা গেড়ে বসেছে। ভোতন জিজ্ঞেস করে, কি ব্যাপার বলতো মাইরী, কেষ্টদার পাত্তা নেই!

বিশু বলে, সত্যি আশ্চর্য! প্রভাতদা তো ওরই বন্ধু, আমরা সেই সুবাদে ঘর জাঁকিয়ে বসে আছি।

—কেষ্টর কি যেন হয়েছে! বেশি কথাবার্তাও বলে না, দেখা হলে একটু হাসে।

ক'দিন থেকেই অরুণাদের বাড়িতে সানাই বাজছে। এ রমেশ-বাবুরই ব্যবস্থা। ওঁদের বিয়ের সময়ও নাকি এই রকম একটানা সানাই বেজেছিল। একদিন মদনও এসেছিল। একান্তে বসে আশুদার সঙ্গে আলাপ করে, সানাই শুনলে আমার বড় মন খারাপ হয়ে যায় আশুদা—

—কেন?

—নন্দিতার কথা মনে পড়ে যায়।

—আহা বেচারী, আশুদা সমবেদনা প্রকাশ করেন, বাবা-মা বোধ হয় খুব শোক পেয়েছেন?

—ওঁদের অনেকগুলি ছেলেমেয়ে, হয়ত সামলে উঠবেন। কিন্তু মন্টুদার জন্যে বেশি দুঃখ হয়, ও লোকটা বোধ হয় পাগল হয়ে যাবে।

—তোমরা কিছু করতে পারলে না?

—আমরা আর কি করব? তার জন্যে নন্দিতা মারা গেছে, এ কথা সে কি করে ভুলবে? গান অত ভালোবাসত, মুখে এখন একটি সুর নেই, চাকরী ছেড়ে দিয়েছে, কি যে করবে বুঝতে পারছি না।

আশুদা সত্যি মনে কষ্ট পান।

এর মধ্যে বেলারাণী একদিন এসেছিল অরুণার কাছে, সুন্দর দামী একছড়া সোনার হার নিয়ে। অরুণা আপত্তি করে বলে, এ কি বেলাদি, এত খরচা করে মিছিমিছি?

বেলারাণী থামিয়ে দেয়, তোমাকে আর গিন্নীর মতো কথা বলতে হবে না। এসো, পরিয়ে দিই।

বেলারাণী অরুণার গলায় এক রকম জোর করেই হারছড়া পরিয়ে দেয়। অরুণা ছুটে গিয়ে সবাইকে দেখিয়ে আসে।

সবার আগে প্রভাত এল কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে, এ ভারী অন্যায় আপনার, আমার সঙ্গেও যদি লৌকিকতা করেন—

—আপনাকে তো কিছু দিইনি।

অরুণা খিল-খিল করে হেসে ওঠে, সত্যি বেলাদি, আপনার সঙ্গে কেউ কথায় পারবে না, ও তো ছেলেমানুষ।

অনেকক্ষণ ধরে তাদের হাসিঠাট্টা চলে। ওঠবার সময় বেলারাণী বলে, অরুণাকে নিয়ে দু'একদিন মার্কেটে যাব কিন্তু—

অরুণা সোৎসাহে বলে, খুব ভালো হবে বেলাদি, আপনি আমায় দু'একখানা শাড়ী বেছে দেবেন।

গাড়ীতে উঠতে উঠতে বেলারাণী প্রভাতকে জিজ্ঞেস করে, বিনোদ এসেছিল নাকি ?

—না।

—গৌরীকে নিয়েই বোধ হয় খুব ব্যস্ত ? আমার বাড়িতেও অনেক দিন আসেনি।

—গৌরী কি রকম করছে ?

—শুনছি আরও দুটো বই-এ কন্‌ট্রাক্ট পেয়েছে।

—তবে তো ভালোই বলতে হবে।

—মেয়েটার চেষ্টা আছে, তার ওপর বিনোদের টাকা, আর কি চাই। আজ চলি, পরশু অরুণাকে নিয়ে যাবো।

কেষ্টকে সকলে গরুখোঁজা করে না পেলেও সে দু'দিন প্রভাতের বিয়েবাড়ির সামনে থেকে ঘুরে গেছে। ভিড় দেখলেই এখন তার ভয় করে, কথা বলাটাই যেন সবচেয়ে বেশি জ্বালা। দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখেছে বিয়েবাড়ির আলো, শুনেছে লোকজনের কোলাহল। সুমধুর সানাই-এর সুর। অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে নিঃশব্দে ফিরে গেছে।

ব্রজদুলালকে আজও চিঠির জবাব দেওয়া হয়নি। 'কিন্তু সে দেবে। প্রথম সুযোগেই লিখে জানাবে কলকাতার মোহ তার মন থেকে অনেকখানি কেটে গেছে। গৌরী, শ্যামল, সবাইকে ভুলে যেতে চেয়েছে। কিছুদিন আগেও গৌরীর কথা মনে হলেই যে অস্বস্তি বোধ করত, এখন তা অনেকখানি কমে গেছে। কারণ, তার সম্বন্ধে আর কৌতূহলও নেই। শ্যামলের কথাও বড় একটা ভাবে না। ব্রজদুলালের ডাক তার কাছে অনেক বড়। অন্তত সে একবার চেষ্টা করবে তার সঙ্গে কাজ করতে। কিন্তু একজন, যার কথা সে এখন না ভেবে পারে না, সে হোল সহায়-সম্বলহীনা চিনু। কেষ্ট ভাবে, সেদিন যদি ও ভাবে চিনু তার অতীত জীবনের ইতিহাস কেষ্টর সামনে অকপটে খুলে না ধরতো তাহলে হয় তো কেষ্টর এখান থেকে চলে যাওয়া অনেকখানি সহজ হ'ত। আজ যেতে হলে তাকে পালিয়ে যেতে হবে। নয় তো চিনুর কোন রকম ব্যবস্থা করে তবে সে ছুটি পাবে। তাই সাহস সঞ্চয় করে সে আবার এলো চিনুর সঙ্গে কথা বলতে।

চিনু বাড়ি ছিল না। কেষ্ট দরজা খুলে নিজের ঘরে বসে। ঝাড়া-পোঁছার অভাবে ঘরটা নোংরা হয়েছে, তবে জিনিসপত্রগুলো এক ঠাঁই করে গোছান। নিশ্চয় চিনুর কীর্তি।

কেষ্টর মনে পড়ল, বাড়িভাড়াটা চুকিয়ে দেওয়া দরকার। উপরে গিয়ে বাড়িওয়ালাকে ডেকে শেষ মাসের ভাড়া দিয়ে দেয়। বাড়িওয়ালা ধন্যবাদ জানিয়ে বলে, আপনাদের নিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে ছিলাম। এখন কে আবার আসবে! আপনি কাউকে পেলেন নাকি?

কেষ্ট বলে, কই আর?

—একসঙ্গে দুখানা ঘরই খালি হয়ে গেল।

—আবার কোনটা?

—চিনুও তো নোটিশ দিয়েছে।

—তাই নাকি! কেষ্ট বিস্মিত হয়।

—ওর পক্ষে একটু বেশি ভাড়াই, তেমন তো রোজগার নেই। পিনাকীবাবু থাকতে উনিই দিতেন, এখন তো চিনুকেই সব চালাতে হয়। তিরিশ টাকা মাসে মাসে দেওয়া সোজা কথা নয়, কি বলেন?

কেষ্ট এই প্রথম জানল, পিনাকী চলে যাওয়ার পর থেকে এই কমাস চিনু বহু কষ্টে টাকা রোজগার করে নিজের সংসার চালাচ্ছে। আশ্চর্য মেয়ে! একদিনও তো এ-সব কথা বলেনি। কত দিন তাকে রান্না করে খাইয়েছে, প্রয়োজনীয় ছোটখাট জিনিস হাতের কাছে এনে দিয়েছে। কেষ্ট যদি জানত, চিনু নিজেই এ-সব জোগাচ্ছে, তাহলে কিছুতেই তাকে করতে দিত না! চিনুর প্রতি সহানুভূতিতে তার মন ভরে যায়! বাড়িওয়ালার সঙ্গে বেশি কথা না বলে নিজের ঘরে গিয়ে চুপ করে বসে থাকে!

চিনু ফিরল বেশ সন্ধ্যে করে। কেষ্টর ঘরে ঢুকে হাসিমুখে জিজ্ঞেস করে, কখন এলেন কেষ্টদা?

—এই তো একটু আগে।

—আমার ফিরতে বড্ড দেরি হয়ে গেল, না? আমার ঘরে চলুন, নোংরার মধ্যে বসে থাকতে হবে না।

কেষ্ট কোন আপত্তি না করে চিনুর পেছন পেছন ওর ঘরে এসে ঢোকে। চিনু চেয়ার ঝেড়ে বসতে দেয়। জুতো-জোড়া খুলে ফেলে নিজেও আর একটি চেয়ারে আরাম করে বসে। বলে, উঃ, বাঁচলাম। সেই কখন বেরিয়েছি!

কেষ্ট আজ তাকিয়ে তাকিয়ে চিনুকে দেখে, পরনে তার ছাপা শাড়ী, সেই রঙের ব্লাউজ, চোখে-মুখে ক্লান্তি আর অবসাদের ছাপ সুস্পষ্ট। কিছুদিন থেকেই কেষ্ট লক্ষ্য করেছিল বটে, চিনুর চোখের তলায় কালি পড়েছে, কিন্তু তা যে ক্রমে এত গভীর হয়ে উঠেছে, সে খেয়াল করেনি। সহানুভূতিমাখা গলায় জিজ্ঞেস করে, বড় খাটনি পড়েছে, না?

কেষ্টর কাছ থেকে এতখানি মোলায়েম গলা চিনু আশা করেনি, মুখ তুলে ম্লান হেসে বলে, কি আর উপায় বলুন ?

—তুমি যে এত দিন নিজে রোজগার করে সংসার চালাচ্ছো, তা আমায় বলনি কেন ?

—দুঃখের কথা বেশি শুনিয়ে লাভ কি ?

কেষ্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আমারই ভুল হয়েছে চিনু, নিজের দিকটাই এত বড় করে দেখেছিলাম। তোমার কথা ভাবার সময় পাই নি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে কেষ্টই জিজ্ঞেস করে, আজকাল কি করো ?

—বাঁধা-ধরা কাজ কিছু নেই, যখন যেটা পাই। কোন মাসে থিয়েটারে চান্স পাই, সে মাসটা ঐতেই চলে যায়। বাড়ি বসে থাকলে সেলাই-এর কাজ করে কিছু বিক্রি করি। দু'এক ঘর চেনা লোক আছে, যারা দয়া করে মোটা সেলাই-এর কাজ আমাদের দেন। তাছাড়া দুটি ছোট ছেলে-মেয়েকে পড়াই।

—কত দিন এ রকম করছ ?

—বেশ কিছু দিন। শেষের দিকে পিনাকী এখানে থাকলেও টাকা দিত না।

—এ ঘর ছেড়ে দেবে শুনছি ?

—আপনাকে কে বললে ?

—বাড়িওয়ালা !

—হ্যাঁ, ভাবছি কম ভাড়ার কোন ঘরে চলে যাবো।

—ঘর পেয়েছ ?

—হ্যাঁ, টালিগঞ্জের কাছে। সতেরো টাকা ভাড়া।

—টালিগঞ্জের ঘরের সন্ধান আগে পাওনি বুঝি ?

—মাস দুই হ'ল পেয়েছি।

—আগে যাওনি কেন ?

চিনু চট করে উত্তর দিতে পারে না, মাথা নিচু করে মৃদুস্বরে বলে, তাহলে তো আপনার সঙ্গে দেখা হ'ত না কেষ্টদা ?

এ কণ্ঠস্বর কেষ্টর অতি পরিচিত, এর মধ্যে উচ্ছ্বাস নেই, ব্যাকুলতা নেই, নির্ভীক স্বীকারোক্তি, যা মেয়েরা কোন দিন প্রকাশ করতে পারে না অন্য কারুর কাছে, যাকে তারা প্রাণ দিয়ে ভালো না বাসে। কেষ্ট একদৃষ্টে চিনুর দিকে তাকিয়ে থেকে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে প্রকাশ করে—তুমি কি এত দিন আমার জন্যেই এখানে ছিলে ?

চিনুর সেই নির্ভীক উত্তর, আমার তো আর কেউ নেই কেষ্টদা !

এ কথা যে সত্য, কতখানি সত্য, তা কেষ্টর চেয়ে বেশি আর কে জানে! এক সময় বলে, এর পরের কথা কিছু ভেবেছো চিনু, কি করবে, কি ভাবে চালাবে, একটা বাঁধা রোজগার চাই তো।

—নিজের কথা আর ভাবতে পারি না কেষ্টদা, অনেক ভেবেছি। ভেবে ভেবে পাগল হয়ে গেছি, কিন্তু কি ফল হল ? ঘর বাঁধার স্বপ্নে ঘর ভেঙ্গে বেরিয়ে এলাম, কিন্তু স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল। নতুন করে আঘাত পাবার জন্যে আবার কি ভাববো বলুন ?

সান্ত্বনা দেবার কোন ভাষাই কেষ্ট খুঁজে পায় না।

চিনুই বলে, গৌরী আপনাকে ফেলে চলে গিয়ে যে অন্যায় করেছে তারই প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে এত দিন এখানে ছিলাম। যখন দেখলাম, কিশোরপুর যাওয়াই আপনি ঠিক করেছেন, বুঝলাম আমার কাজও ফুরিয়েছে। এখানকার তল্পিতল্পা ওঠাই।

—না চিনু, তোমার কোন ব্যবস্থা করতে না পারলে আমার কিশোরপুর যাওয়া হবে না!

চিনু ব্যস্ত হয়ে বলে, না না, তা কেন হবে ? আপনি চলে যান। ওরাই ওখানে আপনার অপেক্ষায় বসে আছেন। আমি ঠিক চালিয়ে নিতে পারবো।

—কি করে পারবে ?

চিনু ম্লান হাসে, আপনাকে না বললে তো আজও জানতে পারতেন না।

—যখন জানতে পেরেছি, আমার কর্তব্য করে যাবো, কেষ্ট উঠে পড়ে, এখন আমি চলি।

চিনু দরজা পর্যন্ত এগিয়ে বলে, কিছু খেয়ে যাবেন না ?

—আজ থাক।

—কাল তো প্রভাতবাবুর বিয়ে, আপনি যাবেন না ?

—বলতে পারছি না।

—আমাকে অনেক করে যেতে বলেছেন।

—যদি যাই তোমায় নিয়ে যাবো।

কেষ্ট বেহালা থেকে সোজা বাড়িতে ফিরে আসে। অন্ধকার ছাদে বসে চিনুর কথাগুলো ভাবতে থাকে। বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে জীবন কাটিয়ে চিনু তারই মত দুঃখ পেয়েছে। পিনাকী তার সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে বলেই কেষ্টর প্রতি গৌরীর এই ব্যবহারে সে এতখানি দুঃখ পেয়েছে। কেষ্ট মনে মনে গৌরীর সঙ্গে চিনুর তুলনা করে। চিনু সংসার-অভিজ্ঞা, গৌরীর কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। চিনু চায় সংসার, ছেলে-মেয়ে, গৌরী সে জায়গায় চায় যশ, প্রতিষ্ঠা। চিনু আনন্দ পায় স্বার্থত্যাগের মধ্যে। গৌরীর আতন্দ স্বার্থসিদ্ধিতে। চিনুর মধ্যে এমন কিছু আকর্ষণ আছে যা গৌরীর মধ্যে ছিল না, তা হোল নারীর স্বভাবসুলভ সহানুভূতি, স্নেহমমতা। মায়ের আসনে চিনুকে কল্পনা করা যায়, কিন্তু গৌরীকে করা যায় না। বন্ধু হিসেবে, সঙ্গী হিসেবে গৌরী হয়ত চিনুর চেয়ে ভাল, স্ত্রী হিসেবে নয়। চিন্তার খেই হারিয়ে ফেলে কেষ্ট ঘুমিয়ে পড়ে।

পরদিন সকালে কেষ্ট এল অনন্ত-কেবিনে ; ভেবেছিল, এতদিন বাদে

আসায় সকলে তাকে নিয়ে খুব হৈ-চৈ করবে। কিন্তু পৌঁছে দেখে, সকলে ব্যস্ত। আশুদা, ভোতন, বিশু সবাই কাগজ নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। কেষ্ট আজ সকাল থেকে এখনও কাগজ দেখেনি। কি এমন উত্তেজনাপূর্ণ খবর বেরিয়েছে জানবার তার কৌতূহল হয়। আশুদার কাছে আসতেই তিনি কেষ্টর পিঠের ওপর জোর চাপড় মেরে বলেন, দেখেছো কাণ্ডটা, সবাই একসঙ্গে ধরা পড়েছে!

—কারা?

—দেবেন ঘোষ, তার দলবল সুদ্ধ্।

—কে দেবেন ঘোষ, পলিটিক্যাল লীডার?

ভোতন চেঁচিয়ে বলে, পলিটিক্যাল লীডার না ঘণ্টা, ডাকাত। গয়নার দোকান লুঠ করতে গিয়ে ধরা পড়েছে।

—কই, দেখি কাগজ।

কেষ্টর হাতে কাগজ না দিয়ে ভোতন চিৎকার করে পড়তে শুরু করে, যার মারমর্ম এই দাঁড়ায়: দেবেন ঘোষ ও তার দলের তিরিশ জনকে পুলিস কাল গ্রেপ্তার করে, কোন এক গয়নার দোকান লুঠ করার সময়। এই বিরাট শহরের বুকে এদের জাল পাতা ছিল। যা দিয়ে অনেক রকম কারবার চালাত। গাড়ী চুরি করা, ব্যাঙ্ক ভাঙ্গা-প্রভৃতি এদের বহু কীর্তি। পুলিস প্রায় ছ'মাস এদের পেছনে থেকে কাল গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

বিশু চট করে বলে, এখন তাহলে একটা গাড়ী কেনা যাক। আর চুরি যাওয়ার ভয় নেই। ওর মন্তব্য শুনে অনেকেই হেসে ওঠে। কেষ্ট কিন্তু আর সেখানে বেশিক্ষণ বসে না। দেবেন ও কালীর নাম পড়েই তার শ্যামলের কথা মনে হয়েছিল। তাই ভাবে, মদনের সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার।

আড্ডা-সঙ্ঘেও ওই একই বিষয় আলোচনা হচ্ছে। মদন ও চুনীলাল

দুজনের সঙ্গেই কেষ্টর দেখা হয়ে যায়। কেষ্টকে দেখে তারা এগিয়ে এসে বলে, সর্বনাশ হয়েছে কেষ্টদা, শ্যামল ধরা পড়েছে।

হতবুদ্ধি কেষ্ট ধীর গলায় জিজ্ঞেস করে, কি করে জানলে?

চুনীলাল উত্তর দেয়, আমি খবর পেয়েছি।

—কাগজে একটা মেয়ের নাম দিয়েছে, সে কে?

—আজকাল দেবেনদার সঙ্গে ঘুরত। ঐ সব ব্যাপারেই বোধ হয়। চুনীলাল নিজে থেকেই বলে, কালীর পাল্লায় পড়ে কি দুরবস্থাই হ'ল দেবেনদার। দেশের লোক এখন থু থু করছে! অথচ মানুষটা কতখানি খাঁটি, আমি তো জানি।

কেষ্টর এ সব কথা শোনার আর ধৈর্য ছিল না। একলা চলতে শুরু করে। শ্যামল আজ জেলে, যে শ্যামল ক'দিন আগেও তার কাছে ছিল। যাকে সে নিজের মতো করে মানুষ করতে চেয়েছিল। কি ভয়ঙ্কর পরিণতি! যে সিনেমার সামনে প্রথম দিন শ্যামলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, অন্যমনস্ক ভাবে কেষ্ট সেখানেই এসে দাঁড়ায়। কত কথা আজ মনে পড়ে। চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেষ্ট দেখে, কত লোক এসে টিকিট নিয়ে যাচ্ছে। বারান্দায় উঠে ছবি দেখছে। বাইরের দেয়ালে কোন একটি অভিনেত্রীর যৌন আবেদনপূর্ণ আকৃতি আঁকা রয়েছে। কোন পথচারী পানের পিক লাগিয়ে দিয়েছে মুখে। কেষ্টর গা ঘিনঘিন করে উঠল। এমনি করেই একদিন হয়ত গৌরীর ছবি আঁকা থাকবে সিনেমা হাউসের দেয়ালে। বিরক্ত হয়ে কেষ্ট হন হন করে হাঁটতে শুরু করে।

কেষ্ট যখন বেহালার বাড়িতে এসে পৌঁছল তখন বেলা দুপুর। চিনুর ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। কেষ্ট টোকা মেরে কোন সাড়া পায় না। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ে। চিনু খাটের ওপর ঘুমিয়ে আছে। কেষ্ট

একবার ভাবে এ সময় ঘরে ঢোকা উচিত হবে কি না। পরক্ষণেই স্থির করে, এখুনি চিনুকে তুলে তার মনের কথা ব্যক্ত করবে। শব্দ না করে কেষ্ট খাটের কাছে এগিয়ে যায়। ঘুমিয়ে পড়ায় চিনুর মুখের সেই ক্লান্তি অবসাদ অনেকখানি যেন কমে গেছে। স্নান করে খোলাচুল বালিশের ওপর ছড়িয়ে পরম শান্তিতে সে ঘুমিয়ে আছে। বড় স্নিগ্ধ, বড় পবিত্র সে মুখ। কেষ্টর মন মমতায় ভরে যায়। কপালে হাত দিয়ে ডাকে, চিনু?

চিনু চমকে ধড়মড় করে উঠে বসে। কেষ্টর দিকে বড় বড় চোখে তাকায়। অপ্রস্তুত কেষ্ট হাসবার চেষ্টা করে, কি হয়েছে, অত চমকে উঠলে কেন?

চিনু পা'টা গুটিয়ে তেমনি বিস্ময়-ভরা চোখে বলে, আমি একটা স্বপ্ন দেখছিলাম, তাই চমকে উঠেছি।

—কি স্বপ্ন?

—কোথায় যেন বেড়াতে গেছি। পাড়া গাঁ। ট্রেনে করে, বাসে করে যেতে হল। মাটির বাড়ি, সব অচেনা লোক। কা'কে যেন খুঁজছি, হঠাৎ আপনার সঙ্গে দেখা হ'ল।

চিনু তখনও যেন স্বপ্ন দেখছে, অধীর আগ্রহে কেষ্টর কথা শোনার জন্যে তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

কেষ্ট ধীরস্বরে বলে, তুমি যে জায়গাটা স্বপ্নে দেখেছো, আমি জানি।

—কোথায়?

—কিশোরপুর।

—কিশোরপুর! কি অদ্ভুত, আমিতো সেখানে কখনও যাইনি?

—যাওনি, যাবে।

চিনু কেষ্টর কথা বুঝতে পারে না, মুখ তুলে তাকায়।

—ব্রজদুলালকে একটা চিঠি লিখবো, কাগজ-কলম নিয়ে এসো।

চিনু কথামতো কাগজ-কলম সংগ্রহ করে এনে দেখে কেষ্ট তার

খাটের ওপর চোখে হাত দিয়ে শুয়ে আছে। জিজ্ঞেস করে, লিখবেন না ?

—আমি বলে যাচ্ছি, তুমি লিখে নাও।

"প্রিয় ব্রজদুলাল,

তোমার দীর্ঘ চিঠি আমার জীবনের অনেকখানি বদলে দিয়েছে। আমি স্থির করেছি তোমাদের স্কুলেই কাজ করবো। যদি তোমার কোন কাজে লাগতে পারি, তাহলেই সুখী হব। তবে এবার আমি একলা যাচ্ছি না, শ্যামাকে বোল, তার খুড়ীমাও আমার সঙ্গে যাবে।"

চিনু এই পর্যন্ত লিখেই কেষ্টর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চায়।

কেষ্ট কিন্তু চোখ বুজেই বলে যায়, "কয়েক দিন আমাদের সময় লাগবে। বিয়ে-থা, এধারকার বিলি-ব্যবস্থা সব কিছু সেরে পোঁছতে এ মাসটা লেগে যাবে। সামনের মাসের পয়লা থেকে কাজে যোগ দিতে পারবো। ছোটদের আমার আশীর্বাদ জানিও। তুমি আমার ভালোবাসা নিও। ইতি—কেষ্ট।"

চিঠি লেখা শেষ করে চিনু চুপ করে বসে থাকে। কেষ্ট তখনও চোখ বন্ধ করেই শুয়ে আছে। এক সময় গাঢ়স্বরে জিজ্ঞেস করে, তোমার কোন আপত্তি নেই তো চিনু ?

চিনু উত্তর দিতে পারে না, চোখে জল ভরে আসে। কেষ্ট বলে যায়, নতুন জীবন। পাড়া গাঁ, কিন্তু সেখানে আন্তরিকতা আছে চিনু! ক'দিন থেকেই বুঝেছি সেখানে থাকলে শান্তি পাবো, তুমি আমি দু'জনেই। ব্রজদুলাল বড় খাঁটি লোক। আর শ্যামাকে তুমি চেনো, সে আমাকে যেমনি ভালোবাসে তোমাকেও সে তেমনি ভাবেই কাছে টেনে নেবে।

চিনুর কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে কেষ্ট চোখ খুলে তাকায়, চিনু চোখের জল মোছার কোন চেষ্টা করে না ; অবিরল ধারায় তার বুক

ভেসে যাচ্ছে। কোন রকমে গলা পরিষ্কার করে চিনু বলে, তুমি সুখী হবে তো কেষ্টদা?

কেষ্ট সস্নেহে চিনুকে কাছে টেনে নেয়। বলে, তোমাকে আমি চিনতে পেরেছি চিনু, আমার মনে আর কোন সংশয় নেই। কিন্তু তুমি তো আমার সব কথা জান না, সেগুলো পরিষ্কার করে বলে নিতে চাই। একবার না বলে ভুল করেছি।

চিনু বাধা দিয়ে বলে, আমি সব জানি কেষ্টদা, গৌরী রাগের মাথায় আমায় একদিন বলেছিল।

কেষ্ট বিস্ময়ের সুরে বলে, সব জেনেও তুমি আমায় ভালোবেসেছ। কেষ্ট চিনুকে আদর করে কোমল স্বরে বলে, তোমার স্পর্শে এসে আমার জীবন বদলে গেল। এখন বুঝেছি, অন্যায়ের প্রতিকার অন্যায় দিয়ে হয় না। ব্রজদুলালের কথাই সত্যি, আমাদের সবাইকে মানুষ তৈরি করতে হবে, সত্যিকারের মানুষ।

কতক্ষণ এ ভাবে কেটে গেছে, দু'জনেরই খেয়াল ছিল না। চিনু হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, প্রভাতবাবুর বিয়ে আজ, যাবে না?

কেষ্ট উঠে বসে, যেতেই হবে। চটপট তৈরি হয়ে নাও চিনু!

দু'জনে কাপড় বদলে আধ ঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে পড়ে।

অরুণাদের বাড়ি আজ লোকে লোকারণ্য। আলোয়, বাজনায় সাজসজ্জায় ঝলমল করছে। প্রভাতের দিকের সকলে, বিশেষ করে বন্ধু-বান্ধবরা বরযাত্রী হয়ে এসেও বাড়ির ছেলের মত কাজ করছে। অতিথিসৎকারে সকলেই ব্যস্ত। গেটের মুখে আশুদা, গলায় চাদর দিয়ে সকলকে অভ্যর্থনা করছেন। রমেশবাবু ভিতরের দালানে চেয়ার পেতে বসে হাসিমুখে অপরিচিতদের সঙ্গে আলাপ করছেন! প্রভাতকে কিন্তু বরের আসনে কেউ বসিয়ে রাখতে পারছে না। পাঁচ দশ মিনিট বাদে বাদেই একবার করে পাক দিয়ে আসছে। দেখছে কোথাও কোন

অসুবিধে হচ্ছে কি না। আশুদা ভরসা দিয়ে বলেন, তুমি কেন ব্যস্ত হচ্ছো প্রভাত, আমরা তো সকলেই আছি।

—তবু না দেখলে চলে না। অরুণাদের দিকে কেউ দেখবার নেই, ওদের আত্মীয়দের আপনি তো চেনেন না ?

—তোমার শ্বশুর খুব ভালো ব্যবস্থা করেছেন মানতেই হবে। ওঁনার বন্ধু-বান্ধবদের এতগুলো গাড়ী খাটছে, লোক আনছে, পৌঁছে দিয়ে আসছে। এ কি কম কথা ?

—সেই জন্যেই তো ব্যস্ত হয়ে আছি, বড অভিমানী লোক, অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি হলে দুঃখ পাবেন।

প্রভাত চলে গেলে, আশুদা অন্যদের বলেন, এ রকম জামাই পাওয়া ভাগ্যের কথা।

বেলারাণী অনেকক্ষণ এসেছে, বলেই রেখেছিল কনে সাজানো হয়ে গেলে বাকি যেটুকু করবার নিজে হাতে করে দেবে। তাই আত্মীয় স্বজনের সাজানো হয়ে গেলে অরুণাকে নিযে বেলাবাণী পাশের ঘরে যায। বিশেষ কিছু নয়, সামান্য একটু অদল-বদলেব মধ্যে যে কতখানি পার্থক্য তা না দেখলে বোঝা যায না। মাথার মুকুটটা ঠিক মতো পরিযে তার সঙ্গে নিজের পছন্দ করা হাল্কা গোলাপী রঙের ওড়না লাগিয়ে দেয। অরুণার গাল টিপে দিয়ে বেলারাণী হেসে বলে, আযনায দেখো তো এবার কেমন দেখাচ্ছে ?

অরুণাব মুখে হাসি ধরে না। সোল্লাসে বলে, আপনি কি সুন্দর সাজাতে পারেন বেলাদি। মাসীমা আমায পাগল করে মারছিলো, সাত বার চুলটা খুলেছেন আর বেঁধেছেন।

অরুণার মা উপহারের জিনিসপত্র কোথায় রাখা হবে, সম্প্রদানের সামগ্রী কি ভাবে সাজালে ভালো হবে, বাসরঘরে কোথায় কোথায় ফুল দেওয়া হবে, সব ব্যাপারেই বেলারাণীর পরামর্শ নিয়ে যাচ্ছেন। ক'দিনের মধ্যে মেয়েটি তাঁদের অত্যন্ত আপনার হয়ে উঠেছে।

কেষ্ট চিনুকে নিয়ে বিয়েবাড়িতে ঢুকেই দেখে, সামনেই আশুদা দাঁড়িয়ে। খুশি হয়ে চিনুকে বলে, আশুদাকে প্রণাম করো, এই আমার সত্যিকারের দাদা।

চিনু কথামতো প্রণাম করতেই আশুদা ব্যস্ত হয়ে পড়েন, থাক মা, থাক! তোমার কথা কত শুনেছি, চোখের দেখাই বাকি ছিল—

কেষ্ট বুঝতে পারে আশুদা চিনুকে গৌরী বলে ভুল করছেন। তাই পরিচয় করিয়ে বলে, এর নাম চিন্ময়ী, ডাকনাম চিনু।

—তুমি ভেতরে যাও মা, মেয়েরা আছেন।

চিনু অন্দরমহলে চলে যায়। আশুদা জিজ্ঞেস করেন, মেয়েটি কে?

—শীগগিরি আমাদের বিয়ে হবে। তারপর চলে যাব কিশোরপুর, ওখানে একটা চাকরী নিয়েছি।

—কিসের চাকরী?

—ব্রজদুলালের স্কুলে।

আশুদা অভিমান-ভরা গলায় বলেন, এত দিন আমায় বলনি কেন?

—আগে যে ঠিক ছিল না। এত দিন বড় অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কেটেছে। আজ আর মনের মধ্যে কোন সংশয় নেই আশুদা—

আর কোন কথা হয় না। ভোতনের দল কেষ্টকে দেখে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে যায়। সাঙ্গোপাঙ্গদের ডেকে বলে, কেষ্টদা এসে গেছে, মাংসের বালতিটা ধরিয়ে দে।

কেষ্ট সোৎসাহে জামা খুলে, কাপড়ের ওপর গামছা জড়িয়ে পরিবেশন করতে লেগে যায়। কয়েক মিনিটের মধ্যে হৈ-হৈ আনন্দের মধ্যে মিশে গিয়ে কেষ্ট ভুলে যায় আজ এই প্রথম সে প্রভাতের বিয়েবাড়িতে এলো। নিমন্ত্রিতদের যত্ন করে সে খাওয়ায়। চিৎকার, চেঁচামেচিতে বাড়ি ভরিয়ে দেয়।

আশুদা এক অবসরে প্রভাতকে কেষ্টর খবর দিয়ে আসেন। কেষ্ট এসেছে শুনেই প্রভাত ছুটে ভেতরে চলে যায়। পরিবেশনরত কেষ্টকে ধমক দিয়ে বলে, এতক্ষণে আসার সময় হল, আমি ভাবলাম তুই আর আসবি না।

প্রাণখোলা হাসি হেসে কেষ্ট রসিকতা করে, বরকে এখন এখানে আসতে নেই, তার ওপর ঝগড়া তো করতেই নেই। এই যে, হাতে মাংসের বালতি দেখছিস? কেষ্ট বালতিটা প্রভাতের দিকে ছোঁড়ার ভঙ্গী করে। সকলেই হো-হো করে হাসে। প্রভাত কেষ্টকে একান্তে ডেকে নিয়ে যায়। বলে, আশুদার কাছে সব শুনলাম। কি যে খুশি হয়েছি, তোকে কি করে বোঝাব!

—চিনুকে তো তুই জানিস?

—অনেক দিন থেকে। সত্যি বড় ভালো মেয়ে। চিরকাল দুঃখই পেয়েছে, তোর সঙ্গে ওর মিল হবে খুব ভালো। শুনলাম, তোরা কলকাতা ছেড়ে চলে যাবি?

—এ শহর আর ভালো লাগছে না প্রভাত, দেখি না ওখানে কিছু দিন থেকে! যদি একঘেয়ে লাগে, ফিরে আসবো।

নির্বিঘ্নে বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হয়। রমেশবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলেন, এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলাম। কোন রকম ত্রুটি হয়নি, তোমার বন্ধুরা খুব ভালো ম্যানেজ করেছে।

বাসরঘরে যাবার আগে প্রভাত বেলারাণীর সঙ্গে কেষ্টর আলাপ করিয়ে দেয়। চিনুর কথা বলতেও ভোলে না।

বেলারাণী বলে, আচ্ছা মেয়ে তো! এতক্ষণ আমার সঙ্গে রইল, একটা কথাও তো বলেনি!

প্রভাত ও আশুদার কৃপায় পরিচিত মহলে কেষ্ট ও চিনুর বিষয় জানতে কারুর বাকী থাকে না। সকলে এসে কেষ্টকে অভিনন্দন জানিয়ে যায়।

এক সময় কেষ্ট প্রভাতকে জিজ্ঞেস করে, বিনোদদের নেমন্তন্ন করিস্ নি?

—করেছিলাম, ওরা আসেনি। সকালে বেয়ারা দিয়ে চিঠি লিখে একটা উপহার পাঠিয়ে দিয়েছে।

কেষ্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে, আজ দেখা হলে ভালো হত।

—যাবি ওদের ওখানে?

—না, থাক। আমার সঙ্গে আর হয়তো দেখা হবে না! দেখা হলে তুই গৌরীকে বলিস, ওর ওপর আর আমার কোন অভিমান নেই। ও বড় হোক, ভাল হোক, এই আমি চাই।

প্রভাত এ বিষয়ে কেষ্টকে আর কথা বলতে দেয় না। বলে, বেশ রাত হ'ল, এখন চিনুকে নিয়ে বাড়ি যা।

বিয়েবাড়ির গাড়ী করে কেষ্টরা বেহালায় ফেরে। ঘরে এসে চিনু প্রথম কথা বলে, আজ বড় অদ্ভুত লাগছিল। সারাক্ষণ অরুণার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, কি মিষ্টি দেখতে মেয়েটা!

—খুব ভালো মেয়ে। তোমার তো চেনা বিশেষ কেউ ছিল না?

—না। তাই বসে বসে কত কথা ভাবছিলাম। নিজের বাড়ির কথা, দাদা-দিদিদের কথা। এমনি করে বাড়িতেও বিয়ে হত। বাবা তখন বেঁচে। বলতেন, চিনুর বেলা সবচেয়ে ধুমধাম হবে—

কেষ্ট থামিয়ে দেয়। বলে, থাক ও সব পুরনো কথা। আজ আমি অনেক দিন বাদে আগের মতো হৈ-হৈ করতে পেরেছি! মনের মধ্যে আর কোন ময়লা নেই, পরিষ্কার হয়ে গেছে। অমি কি ভাবছিলাম জানো?

—কি?

—তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেছে। একটু চুপ করে থেকে

বলে, আগে ভাবতাম, বিয়ের অনুষ্ঠান বড় করে না হলে মনে তৃপ্তি পাবো না। কিন্তু আজ বুঝেছি সে সব মিথ্যে। মনের মধ্যে তোমাকে আমি পেয়েছি।

চিনু কোন উত্তর দিতে পারে না। কেষ্টর কাঁধের ওপর আলতো করে হাত রাখে। কেষ্ট চিনুকে কাছে টেনে নেয়। জানলা দিয়ে দুরে তাকিয়ে দেখে, ফ্রেমে-বাঁধা এক টুকরো আকাশ। নির্মল পবিত্র এক মুঠো আকাশ।

দু'জনে সেই দিকে চেয়ে থাকে।